PART- 17

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী
রহ.

আল হাশর

৫৯

নামকরণ

সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতের أَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ অংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে 'আল হাশর' শব্দের উল্লেখ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে সা'ঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে সূরা হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ সূরা আনফাল যেমন বদর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল তেমনি সূরা হাশর বনী নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হযরত সা'ঈদ ইবনে যুবাইরের দ্বিতীয় বর্ণনায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য এরূপ قُلْ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ অর্থাৎ এরূপ বলো যে, এটা সূরা নাযীর। মুজাহিদ, কাতাদা, যুহরী, ইবনে যায়েদ, ইয়াযীদ ইবনে রূমান, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক এবং অন্যদের থেকেও একথাটিই বর্ণিত হয়েছে। তাদের সবার ঐকমত্যভিত্তিক বর্ণনা হলো, এ সূরাতে যেসব আহলে কিতাবের বহিষ্কারের উল্লেখ আছে তারা বনী নাযীর গোত্রেরই লোক। ইয়াযীদ ইবনে রূমান, মুজাহিদ এবং মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বক্তব্য হলো, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা সূরাটিই বনী নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, এ যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছিল ? এ সম্পর্কে ইমাম যুহরী উরওয়া ইবনে যুবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, এ যুদ্ধ বদর যুদ্ধের ছয় মাস পরে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম এবং বালাযুরী একে হিজরী চতুর্থ সনের রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই সঠিক মত। কারণ সমস্ত বর্ণনা এ বিষয়ে একমত যে, এ যুদ্ধ 'বি'রে মা'উনা'র দুঃখজনক ঘটনার পরে সংঘটিত হয়েছিল। এ বিষয়টিও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, 'বি'রে মা'উনা'র মর্মান্তিক ঘটনা ওহুদ যুদ্ধের পরে ঘটেছিল—আগে নয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরার বিষয়বস্তু ভালভাবে বুঝতে হলে মদীনা ও হিজাযের ইহুদীদের ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। তা নাহলে নবী (সা) তাদের বিভিন্ন গোত্রের সাথে যে আচরণ করেছিলেন তার প্রকৃত কারণসমূহ কি ছিল কেউ তা সঠিকভাবে জানতে পারবে না।

আরবের ইহুদীদের নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাস দুনিয়ায় নেই। তারা নিজেরাও পুস্তক বা শিলালিপি আকারে এমন কোন লিখিত বিষয় রেখে যায়নি যা তাদের অতীত ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করতে পারে। তাছাড়া আরবের বাইরের ইহুদী ঐতিহাসিক কিংবা লেখকগণও তাদের কোন উল্লেখ করেননি। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, আরব উপদ্বীপে এসে তারা তাদের স্বজাতির অন্য সব জাতি-গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই দুনিয়ার ইহুদীরা তাদেরকে স্বজাতীয় লোক বলে মনেই করতো না। কারণ তারা ইহুদী সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভাষা এমনকি নাম পর্যন্ত পরিত্যাগ করে আরবী ভাবধারা গ্রহণ করেছিল। হিজাযের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির মধ্যে যেসব শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে তাতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে ইহুদীদের কোন নাম নিশানা বা উল্লেখ পাওয়া যায় না। এতে শুধুমাত্র কয়েকজন ইহুদীর নাম পাওয়া যায়। এ কারণে আরব ইহুদীদের ইতিহাসের বেশীর ভাগ আরবদের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক বর্ণনার ওপরে নির্ভরশীল। এরও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইহুদীদের নিজেদেরই প্রচারিত।

হিজাযের ইহুদীরা দাবী করতো যে, তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জীবনকালের শেষদিকে সর্বপ্রথম এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। এই কাহিনী বর্ণনা করে তারা বলতো, হযরত মূসা (আ) আমালেকাদের বহিষ্কারের উদ্দেশ্যে তাঁর একটি সেনাদলকে ইয়াসরিব অঞ্চল দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ঐ জাতির কোন ব্যক্তিকেই যেন জীবিত রাখা না হয়। বনী ইসরাঈলদের এই সেনাদল নবীর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করল। তবে, আমালেকাদের বাদশার একটি সুদর্শন যুবক ছেলে ছিল। তারা তাকে হত্যা করল না। বরং সাথে নিয়ে ফিলিস্তিনে ফিরে গেল। এর পূর্বেই হযরত মূসা (আ) ইনতিকাল করেছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ এতে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তারা বললেন ঃ একজন আমালেকীকেও জীবিত রাখা নবীর নির্দেশ এবং মূসার শরীয়াতের বিধি-বিধানের স্পষ্ট লংঘন। তাই তারা উক্ত সেনাদলকে তাঁদের জামায়াত থেকে বহিষ্কার করে। বাধ্য হয়ে দলটিকে ইয়াসরিবে ফিরে এসে এখানেই বসবাস করতে হয়। (কিতাবুল আগানী, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৪) এভাবে ইহুদীরা যেন দাবী করছিল যে, খৃষ্টপূর্ব ১২শ' বছর পূর্বে থেকেই তারা এখানে বসবাস করে আসছে। কিন্তু বাস্তবে এর পেছনে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। সম্ভবত এ কাহিনী তারা এ জন্য গড়ে নিয়েছিল যাতে আরবের অধিবাসীদের কাছে তারা নিজেদের সুপ্রাচীন ও অভিজাত হওয়া প্রমাণ করতে পারে।

ইহুদীদের নিজেদের বর্ণনা অনুসারে খৃষ্টপূর্ব ৫৮৭ সনে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে আরেকবার এদেশে তাদের আগমন ঘটেছিল। এই সময় বাবেলের বাদশাহ 'বখতে নাস্সার' বায়তুল মাকদাস ধ্বংস করে ইহুদীদেরকে সারা পৃথিবীতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। আরবের ইহুদীরা বলতো, সেই সময় আমাদের কিছু সংখ্যক গোত্র এসে ওয়াদিউল কুরা, তায়মা এবং ইয়াস্রিবে বসতি স্থাপন করেছিল। (ফুতূহুল বুলদান, আল বালাযুরী) কিন্তু এর পেছনেও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। অসম্ভব নয় যে, এর মাধ্যমেও তারা তাদের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে চায়।

প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি প্রমাণিত তা হলো, ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমানরা যখন ফিলিস্তিনে ইহুদীদের ওপর গণহত্যা চালায় এবং ১৩২ খৃষ্টাব্দে এই ভূখণ্ড থেকে তাদের

সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কার করে সেই সময় বহু সংখ্যক ইহুদী গোত্র পালিয়ে হিজাযে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। কেননা, এই এলাকা ছিল ফিলিস্তিনের দক্ষিণাঞ্চল সংলগ্ন। এখানে এসে তারা যেখানেই ঝর্ণা ও শ্যামল উর্বর স্থান পেয়েছে সেখানেই বসতি গড়ে তুলেছে এবং পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে ষড়যন্ত্র ও সুদী কারবারের মাধ্যমে সেসব এলাকা কুক্ষিগত করে ফেলেছে। আয়লা, সাকনা, তাবুক, তায়মা, ওয়াদিউল কুরা, ফাদাক এবং খায়বরের ওপরে এই সময়েই তাদের আধিপত্য কায়েম হয়েছিলো। বনী কুরাইযা, বনী নাযীর, বনী বাহদাল এবং বনী কায়নুকাও এ সময়ই আসে এবং ইয়াসরিবের ওপর আধিপত্য কায়েম করে।

ইয়াসরিবে বসতি স্থাপনকারী ইহুদী গোত্রসমূহের মধ্যে বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তারা ইহুদী পুরোহিত (Cohens বা Priests) শ্রেণীর অন্তরভুক্ত ছিল। ইহুদীদের মধ্যে তাদের অভিজাত বলে মান্য করা হতো এবং স্বজাতির মধ্যে তারা ধর্মীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল। এরা যে সময় মদীনায় এসে বসতি স্থাপন করে তখন কিছু সংখ্যক আরব গোত্রও এখানে বসবাস করতো। ইহুদীরা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং কার্যত শস্য–শ্যামল উর্বর এই ভূখণ্ডের মালিক মোখতার হয়ে বসে। এর প্রায় তিন শ' বছর পরে ৪৫০ অথবা ৪৫১ খৃষ্টাব্দে ইয়ামানে সেই মহাপ্লাবন আসে সূরা সাবার দ্বিতীয় রুকূ'তে যার আলোচনা করা হয়েছে। এই প্লাবনের কারণে সাবা কওমের বিভিন্ন গোত্র ইয়ামান ছেড়ে আরবের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। এদের মধ্য থেকে গাস্সানীরা সিরিয়ায়, লাখামীরা হীরায় (ইরাক), বনী খুযা'আ জিদ্দা ও মক্কার মধ্যবর্তী এলাকায় এবং আওস ও খাযরাজ ইয়াসরিবে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। ইহুদীরা যেহেতু আগে থেকেই ইয়াসরিবের ওপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। তাই প্রথম প্রথম তারা আওস ও খাযরাজ গোত্রকে কর্তৃত্ব চালানোর কোন সুযোগ দেয়নি। তাই এ দু'টি আরব গোত্র অনুর্বর এলাকায় বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয় যেখানে জীবন ধারণের ন্যূনতম উপকরণও তারা খুব কষ্টে সংগ্রহ করতে পারতো। অবশেষে তাদের একজন নেতা তাদের স্বগোত্রীয় গাসসানী ভাইদের সাহায্য প্রার্থনা করতে সিরিয়া গমন করে এবং সেখান থেকে একটি সেনাদল এনে ইহুদীদের শক্তি চূর্ণ করে দেয়। এভাবে আওস ও খাযরাজ ইয়াসরিবের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও আধিপত্য লাভ করে এবং ইহুদীদের দু'টি বড় গোত্র বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা শহরের বাইরে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়। তৃতীয় আরেকটি ইহুদী গোত্র বনী কায়নুকার যেহেতু বনু কুরাইযা ও বনু নাজীর গোত্রের সাথে তিক্ত সম্পর্ক ছিল তাই তারা শহরের ভেতরেই থেকে যায়। তবে এখানে থাকার জন্য তাদেরকে খাযরাজ গোত্রের নিরাপত্তামূলক ছত্রছায়া গ্রহণ করতে হয়। এর বিরুদ্ধে বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা গোত্রকে আওস গোত্রের নিরাপত্তামূলক আশ্রয় নিতে হয় যাতে তারা নিরাপদে ইয়াসরিবের আশেপাশে বসবাস করতে পারে। নীচের মানচিত্র দেখলে স্পষ্ট বুঝা যাবে, এই নতুন ব্যবস্থা অনুসারে ইয়াসরিব এবং তার আশেপাশে কোথায় কোথায় ইহুদী বসতি ছিল।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের পূর্বে হিজরাতের সূচনাকাল পর্যন্ত সাধারণভাবে গোটা হিজাযের এবং বিশেষভাবে ইয়াসরিবে ইহুদীদের অবস্থা ও পরিচয় মোটামুটি এরূপ ছিল ঃ

হিজরতের পর মদীনায় ইয়াহুদী অবস্থানসমূহ

উত্তর
বুহাইরা
মাজমাউল আসইয়াল
রুমা কূপ
ওহোদ পর্বতমালা
আল-কানাত উপত্যকা
বাগ বাগিচা
বনু হারেসা গোত্রের বসবাস স্থান
সালয়া পর্বত
আবদুল আশহাল গোত্রের বসবাস স্থান
ইয়াসরিব নগর
মসজিদে নববী
আল বকী
ইয়াসরিব নগর
বনু জফর গোত্রের আবাস
মাহজুর উপত্যকা
বাগ বাগিচাসমূহ
আল-আওয়ালী বাগানসমূহ
কুবা
যুলহুলাইফা
বনু নজীর গোত্রের আবাস
আইর পাহাড়
কায়াব ইবনে আশরাফের দুর্গ

ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, তাহযীব, তামাদ্দুন সবদিক দিয়ে তারা আরবী ভাবধারা গ্রহণ করে নিয়েছিল। এমনকি তাদের অধিকাংশের নামও হয়ে গিয়েছিল আরবী। হিজাযে বসতি স্থাপনকারী ইহুদী গোত্র ছিল বারটি। তাদের মধ্যে একমাত্র বনী যা'যুরা ছাড়া আর কোন গোত্রেরই হিব্রু নাম ছিল না। হাতেগোণা কয়েকজন ধর্মীয় পণ্ডিত ছাড়া তাদের কেউ-ই হিব্রু ভাষা জানত না। জাহেলী যুগের ইহুদী কবিদের যে কাব্যগাঁথা আমরা দেখতে পাই তার ভাষা, ধ্যান-ধারণা ও বিষয়বস্তুতে আরব কবিদের থেকে স্বতন্ত্র এমন কিছুই পাওয়া যায় না যা তাদেরকে আলাদাভাবে বৈশিষ্টমণ্ডিত করে। তাদের ও আরবদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত স্থাপিত হয়েছিল। মোটকথা, তাদের ও সাধারণ আরবদের মধ্যে ধর্ম ছাড়া আর কোন পার্থক্যই অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তারা আরবদের মধ্যে একেবারে বিলীনও হয়ে যায়নি। তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিজেদের ইহুদী জাত্যাভিমান ও পরিচয় টিকিয়ে রেখেছিল। তারা বাহ্যত আরবী ভাবধারা গ্রহণ করেছিল শুধু এ জন্য যে, তাছাড়া তাদের পক্ষে আরবে টিকে থাকা অসম্ভব ছিল। আরবী ভাবধারা গ্রহণ করার কারণে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা তাদের ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে নিয়েছে যে, তারা মূলত বনী ইসরাঈল নয়, বরং ইহুদী ধর্ম গ্রহণকারী আরব কিংবা তাদের অধিকাংশ অন্তত আরব ইহুদী। ইহুদীরা হিজাযে কখনো ধর্ম প্রচারের কাজ করেছিল অথবা তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ খৃস্টান পাদ্রী এবং মিশনারীদের মত আরববাসীদের ইহুদী ধর্মের প্রতি আহবান জানাতো এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের মধ্যে ইসরাঈলিয়াত বা ইহুদীবাদের চরম গোঁড়ামি এবং বংশীয় আভিজাত্যের গর্ব ও অহংকার ছিল। আরবের অধিবাসীদের তারা 'উম্মী' (Gentiles) বলে আখ্যায়িত করত যার অর্থ শুধু নিরক্ষরই নয়, বরং অসভ্য এবং মূর্খও। তারা বিশ্বাস করত, ইসরাঈলীরা যে মানবাধিকার ভোগ করে এরা সে অধিকার লাভেরও উপযুক্ত নয়। বৈধ ও অবৈধ সব রকম পন্থায় তাদের অর্থ-সম্পদ মেরে খাওয়া ইসরাঈলীদের জন্য হালাল ও পবিত্র। নেতৃ পর্যায়ের লোক ছাড়া সাধারণ আরবদের তারা ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করে সমান মর্যাদা দেয়ার উপযুক্তই মনে করত না। কোন আরব গোত্র বা বড় কোন আরব পরিবার ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। আরব লোকগাথায় তার কোন হদিসও মেলে না। এমনিতেও ইহুদীদের ধর্মপ্রচারের চেয়ে নিজেদের আর্থিক কায়-কারবারের প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ ছিল অধিক। তাই একটি ধর্ম হিসেবে হিজাযে ইহুদীবাদের বিস্তার ঘটেনি। বরং তা হয়েছিল কয়েকটি ইহুদী গোত্রের গর্ব ও অহংকারের পুঁজি। তবে ইহুদী ধর্মীয় পণ্ডিতরা তাবীজ-কবচ, ভাল-মন্দ লক্ষণ নির্ণয় এবং যাদুবিদ্যার রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। আর এ কারণে আরব সমাজে তাদের 'ইলম' ও 'আমলে'র খ্যাতি ও প্রতাপ বিদ্যমান ছিল।

আরব গোত্রসমূহের তুলনায় তাদের আর্থিক অবস্থা ও অবস্থান ছিল অধিক মজবুত। তারা যেহেতু ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার অধিক সুসভ্য অঞ্চল থেকে এসেছিল তাই এমন অনেক শিল্প ও কারিগরী তারা জানতো যা আরবের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। তাছাড়া বাইরের জগতের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্কও ছিল। এসব কারণে ইয়াসরিব এবং হিজাযের উত্তরাঞ্চলে খাদ্যশস্যের আমদানী আর এখান থেকে খেজুর রপ্তানীর কারবার তাদের হাতে চলে এসেছিল। হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্য শিকারেরও বেশীর ভাগ তাদেরই করায়ত্ত ছিল। বস্ত্র উৎপাদনের কাজও তারাই করত। তারাই আবার জায়গায়

জায়গায় পানশালা নির্মাণ করে রেখেছিল। এসব জায়গা থেকে মদ এনে বিক্রি করা হতো। বনু কায়নুকা গোত্রের অধিকাংশ লোক স্বর্ণকার, কর্মকার ও তৈজসপত্র নির্মাণ পেশায় নিয়োজিত ছিল। এসব কায়কারবারে ইহুদীরা অস্বাভাবিক মুনাফা লুটতো। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় কারবার ছিল সুদী কারবার। আশেপাশের সমস্ত আরবদের তারা এই সুদী কারবারের ফাঁদে আটকে ফেলেছিল। বিশেষ করে আরব গোত্রসমূহের নেতা ও সরদাররা বেশী করে এই জালে জড়িয়ে পড়েছিল। কারণ ঋণগ্রহণ করে জাঁকজমকে চলা এবং গর্বিত ভঙ্গিতে জীবনযাপন করার রোগ সবসময়ই তাদের ছিল। এরা অত্যন্ত চড়া হারের সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিতো এবং তা চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়াতে থাকত। কেউ একবার এই জালে জড়িয়ে পড়লে তা থেকে মুক্তি পাওয়া তার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত। এভাবে তারা আর্থিক দিক দিয়ে আরবদেরকে অন্তসারশূন্য করে ফেলেছিল। তবে তার স্বাভাবিক ফলাফলও দাঁড়িয়েছিল এই যে, তাদের বিরুদ্ধে আরবদের মধ্যে ব্যাপক ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছিল।

—আরবদের মধ্যে কারো বন্ধু হয়ে অন্য কারো সাথে শত্রুতা সৃষ্টি না করা এবং পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশগ্রহণ না করাই ছিল তাদের ব্যবসায়িক ও আর্থিক স্বার্থের অনুকূলে। কিন্তু অন্যদিকে আবার আরবদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হতে না দেয়া এবং তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত রাখাই ছিল তাদের স্বার্থের অনুকূলে। কারণ, তারা জানতো, আরব গোত্রসমূহ যখনই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে তখন আর তারা সেই সব সহায়-সম্পত্তি, বাগান এবং শস্য-শ্যামল ফসলের মাঠ তাদের অধিকারে থাকতে দেবে না, যা তারা সুদী কারবার ও মুনাফাখোরীর মাধ্যমে লাভ করেছে। তাছাড়া নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাদের প্রতিটি গোত্রকে কোন না কোন শক্তিশালী আরব গোত্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হতো যাতে অন্য কোন শক্তিশালী গোত্র তাদের গায়ে হাত তুলতে না পারে। এ কারণে আরব গোত্রসমূহের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে তাদেরকে বারবার শুধু জড়িয়ে পড়তেই হতো না, বরং অনেক সময় একটি ইহুদী গোত্রকে তার মিত্র আরব গোত্রের সাথে মিলে অপর কোন ইহুদী গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হতো, বিরোধী আরব গোত্রের সাথে যাদের থাকতো মিত্রতার সম্পর্ক। ইয়াসরিবে বনী কুরায়যা ও বনী নাযীর ছিল আওস গোত্রের এবং বনী কায়নুকা ছিল খাযরাজ গোত্রের মিত্র। হিজরাতের কিছুকাল পূর্বে 'বু'আস' নামক স্থানে আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল তাতে এই ইহুদী গোত্রগুলোও নিজ নিজ বন্ধু গোত্রের পক্ষ নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে মদীনায় ইসলাম পৌঁছে এবং শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহর (সা) আগমনের পর সেখানে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার সাথে সাথে তিনি প্রথম যে কাজগুলো করলেন তার মধ্যে একটি হলো আওস, খাযরাজ এবং মুহাজিরদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃবন্ধন সৃষ্টি করা। দ্বিতীয় কাজটি হলো, এই মুসলিম সমাজ এবং ইহুদীদের মধ্যে স্পষ্ট শর্তাবলীর ভিত্তিতে একটি চুক্তি সম্পাদন করা। এ চুক্তিতে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল যে, একে অপরের অধিকারসমূহে হস্তক্ষেপ করবে না এবং বাইরের শত্রুর মোকাবিলায় সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

ইহুদী এবং মুসলমানরা পরস্পরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় মেনে চলবে এই চুক্তি থেকে তা স্পষ্টভাবে জানা যায়। চুক্তির কতকগুলো বিষয় নিম্নরূপ ঃ

ان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم – وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة – وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الا ثم – وانه لم يئثم امر ؤبحليفه ، وان النصر للمظلوم ، وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربيي ، وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة .... وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله عزوجل والى محمد رسول الله .... وانه لاتجار قريش ولا من نصرها ، وان بينهم والنصر على من دهم يثرب – على كل اناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم –

(ابن هشام – ج ٢ – ص ١٤٧ – ١٥٠)

ইয়াহুদীরা নিজেদের ব্যয় বহন করবে এবং মুসলমানরাও নিজেদের ব্যয় বহন করবে।

এই চুক্তির পক্ষসমূহের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করলে তারা পরস্পরকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে। নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে তারা একে অপরের কল্যাণ কামনা করবে। তাদের পরস্পরের সম্পর্ক হবে কল্যাণ করা ও অধিকার পৌঁছিয়ে দেয়ার সম্পর্কে গোনাহ ও সীমালংঘনের সম্পর্ক নয়।

কেউ তার মিত্রশক্তির সাথে কোনপ্রকার খারাপ আচরণ করবে না।

মজলুম ও নির্যাতিতদের সাহায্য করা হবে।

যতদিন যুদ্ধ চলবে ইহুদীরা ততদিন পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে মিলিতভাবে তার ব্যয় বহন করবে।

এই চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী পক্ষগুলোর জন্য ইয়াসরিবের অভ্যন্তরে কোনপ্রকার ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

এই চুক্তির শরীক পক্ষগুলোর মধ্যে যদি এমন কোন ঝগড়া–বিবাদ ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় যার কারণে বিপর্যয় সৃষ্টির আশংকা দেখা দিতে পারে তাহলে আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর বিধান অনুসারে তার মীমাংসা করবেন। ....

কুরাইশ এবং তাদের মিত্র ও সাহায্যকারীদের আশ্রয় দেয়া হবে না।

কেউ ইয়াসরিবের ওপর আক্রমণ করলে চুক্তির শরীকগণ তার বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করবে। প্রত্যেকপক্ষ নিজ নিজ এলাকার প্রতিরক্ষার দায়-দায়িত্ব বহন করবে। (ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৪৭ থেকে ১৫০ পর্যন্ত)

এটা ছিল একটা সুস্পষ্ট ও অলংঘনীয় চূড়ান্ত চুক্তি। ইহুদীরা নিজেরাই এর শর্তাবলী গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণ করতে শুরু করল। তাদের এই শত্রুতা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। এর বড় বড় কারণ ছিল তিনটি ঃ

এক ঃ তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাতির একজন নেতা হিসেবে দেখতে আগ্রহী ছিল যিনি তাদের সাথে শুধু একটি রাজনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ থাকবেন এবং নিজের দলের পার্থিব স্বার্থের সাথে কেবল তার সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু তারা দেখলো, তিনি আল্লাহ, আখেরাত, রিসালাত এবং কিতাবের প্রতিও ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছেন (যার মধ্যে তাদের নিজেদের রসূল ও কিতাবের প্রতি ঈমান আনাও অন্তরভুক্ত) এবং গোনাহর কাজ পরিত্যাগ করে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ এবং নৈতিক সীমা ও বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে আহবান জানাচ্ছেন, খোদ তাদের নবী-রসূলগণ দুনিয়ার মানুষকে যে আহবান জানাতেন। এসব ছিল তাদের কাছে অপছন্দনীয়। তারা আশংকাবোধ করলো, যদি এই বিশ্বজনীন আদর্শিক আন্দোলন চলতেই থাকে তাহলে তার সয়লাবের মুখে তাদের স্থুল ও অচল ধর্ম ও ধর্মীয় দর্শন এবং বংশ ও গোষ্ঠীগত জাতীয়তা খড়কুটোর মত ভেসে যাবে।

দুই ঃ আওস, খাযরাজ এবং মুহাজিরদেরকে পরস্পর ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখে এবং আশেপাশের আরব গোত্রসমূহের যারাই ইসলামের এই আহবানে সাড়া দিচ্ছে তারাই মদীনার এই ইসলামী ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে যাচ্ছে দেখে তারা এই ভেবে শংকিত হয়ে উঠলো যে, নিজেদের নিরাপত্তা ও স্বার্থের খাতিরে আরব গোত্রসমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে স্বার্থোদ্ধার করার যে নীতি তারা শত শত বছর ধরে অনুসরণ করে আসছে নতুন এই ব্যবস্থাধীনে তা আর চলবে না, বরং এখন তাদেরকে আরবের একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তির মোকাবিলা করতে হবে। যেখানে এই অপকৌশল আর সফল হবে না।

তিন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজ ও সভ্যতার যে সংস্কার করছিলেন তাতে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে সব রকম অবৈধ পথ ও পন্থা নিষিদ্ধ ঘোষণা করাও অন্তরভুক্ত ছিল। সর্বাপেক্ষা বড় ব্যাপার হলো, সুদভিত্তিক কারবারকেও তিনি নাপাক উপার্জন এবং হারাম খাওয়া' বলে ঘোষণা করছিলেন। এ কারণে তারা আশংকা করছিল যে, আরব জনগণের ওপর যদি তাঁর শাসন কর্তৃত্ব কায়েম হয় তাহলে তিনি আইনগতভাবে সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেবেন। একে তারা নিজেদের মৃত্যুর শামিল বলে মনে করছিল।

এসব কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করা তারা নিজেদের জাতীয় লক্ষ হিসেবে স্থির করে নিয়েছিল। তাঁকে আঘাত দেয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত করার কোন অপকৌশল, ষড়যন্ত্র ও উপায় অবলম্বন করতে তারা মোটেই কুণ্ঠিত হতো না। সাধারণ

মানুষ যাতে তাঁর প্রতি সন্দিহান হয়ে ওঠে সে জন্য তারা তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম মিথ্যা প্রচারণা চালাতো। ইসলাম গ্রহণকারীদের মনে সব রকমের সন্দেহ–সংশয় ও দ্বিধা–দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতো। যাতে তারা এ দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাম ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যত বেশী পারা যায় ভুল ধারণা সৃষ্টি করার জন্য নিজেরাও মিথ্যামিথ্যি ইসলাম গ্রহণ করতো এবং তারপর আবার মুরতাদ বা ইসলাম ত্যাগী হয়ে যেতো। অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য মুনাফিকদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধতো। ইসলামের শত্রু প্রতিটি ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং গোত্রের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতো। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে এবং তাদেরকে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত করানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতো। তাদের বিশেষ লক্ষ ছিল আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকজন। দীর্ঘদিন যাবত এ দু'টি গোত্রের সাথে তাদের সুসম্পর্ক ছিল। অপ্রাসঙ্গিকভাবে বারবার 'বু'আস' যুদ্ধের আলোচনা তুলে তাদেরকে পূর্ব শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতো। যাতে আরেকবার তাদের মধ্যে তরবারির ঝনঝনানি শুরু হয়ে যায় এবং ইসলাম তাদেরকে যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলো তা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মুসলমানদের আর্থিক দিক থেকে বিব্রত ও বিপদগ্রস্ত করার জন্যও তারা নানারূপ জালিয়াতি করতো। যাদের সাথে আগে থেকেই তাদের লেনদেন ছিল তাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করতো তারা তার ক্ষতিসাধন করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যেতো। তার কাছে যদি কিছু পাওনা থাকতো তাহলে তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে তাকে উত্যক্ত ও বিব্রত করে তুলতো। তবে তার যদি কিছু পাওনা থাকতো তাহলে তা আত্মসাৎ করতো। তারা প্রকাশ্যে বলতো ঃ আমরা তোমার সাথে যখন লেনদেন ও কারবার করেছিলাম তখন তোমার ধর্ম ছিল অন্যকিছু। এখন যেহেতু তুমি তোমার ধর্মই পরিবর্তন করে ফেলেছো তাই আমাদের কাছে তোমার কোন অধিকারই আর অবশিষ্ট নেই। তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে নায়শাবুরী. তাফসীরে তাবরাসী এবং তাফসীরে রূহুল মায়ানীতে সূরা আলে ইমরানের ৭৫নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এর বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

চুক্তির বিরুদ্ধে খোলাখুলি এই শত্রুতামূলক আচরণ তারা বদর যুদ্ধের আগে থেকেই করতে শুধু করেছিলো। কিন্তু বদর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানগণ কুরাইশদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করলে তারা অস্থির হয়ে ওঠে এবং তাদের হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন আরো অধিক প্রজ্জ্বলিত হয়। তারা আশা করেছিলো, এই যুদ্ধে কুরাইশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে যাবে। ইসলামের এই বিজয়ের খবর পৌঁছার পূর্বেই তারা মদীনায় গুজব ছড়াতে শুরু করেছিল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়ে গিয়েছেন, মুসলমানদের চরম পরাজয় ঘটেছে এবং আবু জেহেলের নেতৃত্বে কুরাইশ বাহিনী মদীনার দিকে ধেয়ে আসছে। কিন্তু ফলাফল তাদের আশা আকাংখার সম্পূর্ণ বিপরীত হলে তারা রাগে ও দুঃখে ফেটে পড়ার উপক্রম হলো। বনী নাযীর গোত্রের নেতা কা'ব ইবনে আশরাফ চিৎকার করে বলতে শুরু করলোঃ খোদার শপথ, মুহাম্মাদ যদি আরবের এসব সম্মানিত নেতাদের হত্যা করে থাকে তাহলে পৃথিবীর উপরিভাগের চেয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগই আমাদের জন্য অধিক উত্তম। এরপর সে মক্কায় গিয়ে হাজির হলো এবং বদর যুদ্ধে যেসব কুরাইশ নেতা নিহত হয়েছিলো তাদের নামে অত্যন্ত উত্তেজনাকর শোকগাঁথা শুনিয়ে শুনিয়ে মক্কাবাসীদের

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত করতে থাকলো। এরপর সে মদীনায় ফিরে আসলো এবং নিজের মনের ঝাল মিটানোর জন্য এমন সব কবিতা ও গান গেয়ে শুনাতে শুরু করলো যাতে সম্মানিত মুসলমানদের স্ত্রী–কন্যাদের সাথে প্রেম নিবেদন করা এবং প্রেম সম্পর্কের কথা উল্লেখ থাকতো। তার এই ঔদ্ধত্য ও বখাটেপনায় অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত নবী (সা) তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা আনসারীকে পাঠিয়ে তাকে হত্যা করাতে বাধ্য হলেন। (ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম, তারীখে তাবারী)।

বদর যুদ্ধের পর ইহুদীদের যে গোত্রটি সমষ্টিগতভাবে সর্বপ্রথম খোলাখুলি চুক্তিভংগ করেছিল সেটি ছিল বনু কায়নুকা গোত্র। এরা মদীনার শহরাভ্যন্তরে একটি মহল্লায় বাস করতো। যেহেতু তারা স্বর্ণকার, কর্মকার ও তৈজসপত্র প্রস্তুতকারী ছিল, তাই মদীনাবাসীদের তাদের বাজারে বেশী বেশী যাতায়াত করতে হতো। নিজেদের বীরত্ব ও সাহসিকতা নিয়ে তারা গর্ববোধ করতো। কর্মকার হওয়ার কারণে তাদের প্রতিটি বাচ্চা পর্যন্ত অস্ত্র সজ্জিত ছিল। তাদের মধ্যে ছিল সাত শত যুদ্ধোপযোগী পুরুষ। খাযরাজ গোত্রের সাথে তাদের পুরনো মিত্রতা সম্পর্ক ছিল। আর খাযরাজ গোত্রের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে 'উবাই ছিল তাদের পৃষ্ঠপোষক। এ কারণেও তাদের অহমিকা ছিল। বদর যুদ্ধের ঘটনায় তারা এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, তারা তাদের বাজারে যাতায়াতকারী মুসলমানদের বিব্রত করা ও কষ্ট দেয়া এবং বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদের উত্যক্ত করতে শুরু করেছিলো। আস্তে আস্তে পরিস্থিতি এতদূর গড়ায় যে, তাদের বাজারে একদিন একজন মুসলমান মহিলাকে সবার সামনে উলঙ্গ করে ফেলা হলে তা নিয়ে মারাত্মক ঝগড়া–বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং হাংগামায় একজন মুসলমান এবং একজন ইহুদী নিহত হয়। পরিস্থিতি এতদূর গড়ালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মহল্লায় গেলেন এবং তাদের সবাইকে ডেকে একত্রিত করে ন্যায় ও সততার পথ অনুসরণ করার উপদেশ দিলেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে তারা বললো ঃ "মুহাম্মাদ, সম্ভবত তুমি আমাদেরকেও কুরাইশ মনে করেছো? যুদ্ধবিদ্যায় তারা ছিল অনভিজ্ঞ। তাই তুমি তাদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছো। কিন্তু আমাদের সাথে পালা পড়লে জানতে পারবে পুরুষলোক কাকে বলে।" এটা ছিল স্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। অবশেষে নবী (সা) দুই হিজরীর শাওয়াল (অপর এক বর্ণনা অনুসারে যিলকা'দা) মাসের শেষ দিকে তাদের মহল্লা অবরোধ করলেন। মাত্র পনের দিন অবরোধ চলার পরই তারা আত্মসমর্পণ করলো এবং তাদের যুদ্ধক্ষম সমস্ত ব্যক্তিকে বন্দী করা হলো। এই সময় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের সাহায্য সমর্থনে এগিয়ে আসলো। নবী (সা) যেন তাদের ক্ষমা করে দেন এ জন্য সে বারবার অনুরোধ উপরোধ করতে থাকলো। নবী (সা) তার আবেদনে সাড়া দিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন যে, বনু কায়নুকা তাদের অর্থ–সম্পদ, অস্ত্র–শস্ত্র এবং শিল্প–সরঞ্জাম রেখে মদীনা ছেড়ে চলে যাবে। (ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম, তারীখে তাবারী)।

এ দু'টি চরম পদক্ষেপ (অর্থাৎ বনী কায়নুকার বহিষ্কার এবং কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যা) গ্রহণ করার ফলে কিছুকাল পর্যন্ত ইহুদীরা এতটা ভীত সন্ত্রস্ত রইলো যে, আর কোন দুষ্কর্ম করার সাহস তাদের হলো না। কিন্তু হিজরী ৩য় সনের শাওয়াল মাসে কুরাইশরা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে আসলে ইহুদীরা দেখলো, কুরাইশদের তিন হাজার সৈন্যের মোকাবিলায় মাত্র এক হাজার

লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধাভিযানে বেরিয়েছে এবং তাদের মধ্যে থেকেও তিন শত মুনাফিক দলত্যাগ করে ফিরে এসেছে। তখন তারা প্রথমবারের মত স্পষ্টভাবে চুক্তিলংঘন করে বসলো। অর্থাৎ মদীনার প্রতিরক্ষায় তারা নবীর (সা) সাথে শরীক হলো না। অথচ চুক্তি অনুসারে তারা তা করতে বাধ্য ছিল। এরপর উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলে তাদের সাহস আরো বেড়ে গেল। এমন কি রসূলুল্লাহকে (সা) হত্যা করার জন্য বনী নাযীর গোত্র একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করে বসলো। কিন্তু ঠিক বাস্তবায়নের মুখে তা বানচাল হয়ে গেল। ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ হলো, বিরে মা'য়ুনা'র মর্মান্তিক ঘটনার (৪র্থ হিজরীর সফর মাস) পর আমর ইবনে উমাইয়া দামরী প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভুলক্রমে বনী আমের গোত্রের দু'জন লোককে হত্যা করে ফেলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলো চুক্তিবদ্ধ গোত্রের লোক। 'আমর তাদেরকে শত্রু গোত্রের লোক মনে করেছিল। এ ভুলের কারণে মুসলমানদের জন্য তাদের রক্তপণ আদায় করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর বনী আমের গোত্রের সাথে চুক্তিতে যেহেতু বনী নাযীর গোত্রও শরীক ছিল, তাই রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদেরকে শরীক হওয়ার আহবান জানাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে নিজে তাদের এলাকায় গেলেন। সেখানে তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু খোশগল্পে ব্যস্ত রেখে ষড়যন্ত্র আঁটলো যে, তিনি যে ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসেছিলেন এক ব্যক্তি তার ছাদ থেকে তাঁর ওপর একখানা ভারী পাথর গড়িয়ে দেবে। কিন্তু তারা এই ষড়যন্ত্র কার্যকরী করার আগেই আল্লাহ তা'আলা যথা সময়ে তাঁকে সাবধান করে দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে মদীনায় ফিরে গেলেন।

এরপর তাদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবিলম্বে তাদেরকে চরমপত্র দিলেন যে, তোমরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিলে তা আমি জানতে পেরেছি। অতএব দশ দিনের মধ্যে মদীনা ছেড়ে চলে যাও। এ সময়ের পরেও যদি তোমরা এখানে অবস্থান করো তাহলে তোমাদের জনপদে যাকে পাওয়া যাবে তাকেই হত্যা করা হবে। অন্যদিকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে খবর পাঠালো যে, আমি দুই হাজার লোক দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবো। তাছাড়া বনী কুরায়যা এবং বনী গাতফানও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। তাই তোমরা রুখে দাঁড়াও, নিজেদের জায়গা পরিত্যাগ করো না। এ মিথ্যা আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরমপত্রের জবাবে তারা জানিয়ে দিল যে, আমরা এখান থেকে চলে যাব না। আপনার কিছু করার থাকলে করে দেখতে পারেন। এতে ৪র্থ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অবরোধ করলেন। অবরোধের মাত্র ক'দিন পরই (কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী মাত্র ছয় দিন এবং কোন কোন বর্ণনা অনুসারে পনর দিন) তারা এই শর্তে মদীনা ছেড়ে চলে যেতে রাজি হলো যে, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অন্য সব জিনিস নিজেদের উটের পিঠে চাপিয়ে যতটা সম্ভব নিয়ে যাবে। এভাবে ইহুদীদের দ্বিতীয় এই পাপী গোত্র থেকে মদীনাকে মুক্ত করা হলো। তাদের মধ্য থেকে মাত্র দু'জন লোক মুসলমান হয়ে মদীনায় থেকে গেল এবং অন্যরা সবাই সিরিয়া ও খায়বার এলাকার দিকে চলে গেল।

এ ঘটনা সম্পর্কেই এ সূরাটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বনী নাযীর যুদ্ধের পর্যালোচনাই এ সূরার বিষয়বস্তু। এতে মোটামুটি চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

(১) প্রথম চারটি আয়াতে গোটা দুনিয়াবাসীকে সেই পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে বনী নাযীর গোত্র সবেমাত্র যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। একটি বৃহত গোত্র যার জনসংখ্যা সে সময় মুসলমানদের জনসংখ্যার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। অর্থ–সম্পদে যারা মুসলমানদের চেয়ে অগ্রসর ছিল, যাদের কাছে যুদ্ধের সাজ–সরঞ্জামেরও অভাব ছিল না এবং যাদের দুর্গসমূহও ছিল অত্যন্ত মজবুত, মাত্র কয়েকদিনের অবরোধের মুখে তারা টিকে থাকতে পারলো না এবং কোন একজন মানুষ নিহত হওয়ার মত পরিস্থিতিরও উদ্ভব হলো না। তারা শত শত বছর ধরে গড়ে ওঠা তাদের আপন জনপদ ছেড়ে দেশান্তরিত হতে রাজি হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এটা মুসলমানদের শক্তির দাপটে হয়নি। বরং তারা যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলো। এটা ছিল তার প্রত্যক্ষ ফল। আর যারা আল্লাহর শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার দুঃসাহস দেখায় তারা এ ধরনের পরিণতির সম্মুখীন হয়।

(২) ৫নং আয়াতে যুদ্ধের একটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। নীতিটি হলো, শত্রুদের এলাকার অভ্যন্তরে সামরিক প্রয়োজনে যে ধংসাত্মক কাজকর্ম করতে হয় তা ফাসাদ ফিল আরদ অর্থাৎ পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির সমার্থক নয়।

(৩) যুদ্ধ বা সন্ধির ফলে যেসব ভূমি ও সম্পদ ইসলামী সরকারের হস্তগত হয় তার বন্দোবস্ত কিভাবে করতে হবে ৬ থেকে ১০নং আয়াতে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেহেতু এ সময়ই প্রথমবারের মত একটি বিজিত অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে এসেছিলো, সে জন্য এখানে তার আইন–বিধান বলে দেয়া হয়েছে।

(৪) বনী নাযীর যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা যে আচরণ ও নীতিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল ১১ থেকে ১৭ আয়াতে তার পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের এই আচরণ ও নীতিভঙ্গির মূলে যেসব কারণ কার্যকর ছিল তাও দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

(৫) শেষ রুকূ'র পুরোটাই উপদেশবাণী। ঈমানের দাবী করে মুসলমানদের দলে শামিল হলেও যাদের মধ্যে ঈমানের প্রাণসত্তা নেই তাদের লক্ষ করেই এই উপদেশবাণী। এতে তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে, ঈমানের মূল দাবী কি, তাকওয়া ও পাপাচারের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কি, যে কুরআনকে মানার দাবী তারা করছে তার গুরুত্ব কতটুকু এবং যে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার স্বীকৃতি তারা দিচ্ছে সেই আল্লাহ কি কি গুণাবলীর অধিকারী?

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①
هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۗ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۖ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۖ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ②

আল্লাহরই তাসবীহ করেছে আসমান ও যমীনের প্রতিটি জিনিস। তিনিই বিজয়ী এবং মহাজ্ঞানী।[১]

তিনিই আহলেকিতাব কাফেরদেরকে প্রথম আক্রমণেই[২] *তাদের ঘরবাড়ী থেকে বের করে দিয়েছেন।*[৩] *তোমরা কখনো ধারণাও কর নাই যে, তারা বের হয়ে যাবে। তারাও মনে করে বসেছিলো যে, তাদের দুর্গসমূহ তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে।*[৪] *কিন্তু আল্লাহ এমন এক দিক থেকে তাদের ওপর চড়াও হয়েছেন, যে দিকের ধারণাও তারা করতে পারেনি।*[৫] *তিনি তাদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। ফল হয়েছে এই যে, তারা নিজ হাতেও নিজেদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করছিলো এবং মু'মিনদের হাত দিয়েও ধ্বংস করছিলো।*[৬] *অতএব, হে দৃষ্টিশক্তির অধিকারীরা,*[৭] *শিক্ষাগ্রহণ করো।*

১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন সূরা হাদীদের তাফসীরের ১ ও ২নং টীকা। বনী নাযীরের বহিষ্কার সম্পর্কে বিশ্লেষণ শুরু করার আগে এই প্রারম্ভিক কথাটি বলার উদ্দেশ্য হলো মন-মগজকে এ সত্য উপলব্ধি করতে প্রস্তুত করা যে, এই শক্তিশালী

ইহুদী গোত্রের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তা মুসলমানদের শক্তির কারণে নয়, বরং আল্লাহর অসীম শক্তির বিস্ময়কর কীর্তি মাত্র।

২. মূল শব্দ হলো لِأَوَّلِ الْحَشْرِ । হাশর (حشر) শব্দের অর্থ বিক্ষিপ্ত জনতাকে একত্র করা অথবা ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্যক্তিদের একত্রিত করে বের হওয়া। আর لِأَوَّلِ الْحَشْرِ –এর অর্থ হলো, প্রথমবার একত্রিত হওয়ার সাথে অথবা প্রথমবার একত্রিত হওয়ার সময়ে। এখন প্রশ্ন হলো, এখানে প্রথম হাশর বলতে কি বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। একদলের মতে এর অর্থ মদীনা থেকে বনী নাযীরের বহিষ্কার। একে প্রথম হাশর এই অর্থে বলা হয়েছে যে, তাদের দ্বিতীয় হাশর হয়েছিলো হযরত 'উমরের (রা) সময়ে। এই সময় ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আর তাদের শেষ হাশর হবে কিয়ামতের দিন। দ্বিতীয় দলের মতে এর অর্থ হলো মুসলমানদের সৈন্য সমাবেশের ঘটনা যা বনী নাযীর গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য করা হয়েছিল সুতরাং لِأَوَّلِ الْحَشْرِ –এর অর্থ হলো, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মুসলমানরা সবেমাত্র একত্রিত হয়েছিলো। লড়াই ও রক্তপাতের কোন অবকাশই সৃষ্টি হয়নি। ইতিমধ্যেই আল্লাহ তা'আলার কুদরাতে তারা দেশান্তরিত হতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। অন্য কথায় এখানে এ বাক্যাংশটি আক্রমণের "প্রথম চোটে" বা "প্রথম আঘাতে" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী এর অনুবাদ করেছেন ঃ در اول جمع کردن لشکر । শাহ আবদুল কাদের সাহেবের অনুবাদ হলো ঃ پہلے ہی بھیر ہوتے আমাদের মতে এই দ্বিতীয় অর্থটিই এ আয়াতাংশের সঠিক ও বোধগম্য অর্থ।

৩. এখানে প্রথমেই একটি বিষয় বুঝে নেয়া উচিত, যাতে বনী নাযীরের বহিষ্কারের ব্যাপারে কোন মানসিক দ্বিধা–দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বনী নাযীর গোত্রের যথারীতি একটি লিখিত চুক্তি ছিল। এ চুক্তিকে তারা বাতিলও করেছিলো না যে, তার কোন অস্তিত্ব নেই মনে করা চলে। তবে যে কারণে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল তা হলো, এই চুক্তি লংঘনের অনেকগুলো ছোট বড় কাজ করার পর তারা এমন একটি কাজ করে বসেছিল যা সুস্পষ্টভাবে চুক্তিভংগেরই নামান্তর। অর্থাৎ তারা চুক্তির অপর পক্ষ মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আর তাও এমনভাবে প্রকাশ হয়ে পড়লো যে, সে জন্য তাদেরকে চুক্তিভংগের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলে তারা তা অস্বীকার করতে পারেনি। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দশদিন সময় দিয়ে এই মর্মে চরমপত্র দিলেন যে, এই সময়ের মধ্যেই তোমরা মদীনা ছেড়ে চলে যাও। অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। এই চরমপত্র ছিল সম্পূর্ণরূপে কুরআন মজীদের নির্দেশ অনুসারে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ "যদি তোমরা কোন কওমের পক্ষ থেকে বিশ্বাসভংগের (চুক্তিলংঘনের) আশংকা কর তাহলে সেই চুক্তি প্রকাশ্যে তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও।" (সূরা আল আনফাল—৫৮) এ কারণে তাদের বহিষ্কারকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের কাজ বলে ঘোষণা করছেন। কারণ, তা ছিল আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক। যেন তাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানগণ বহিষ্কার করেননি, বরং আল্লাহ তা'আলা নিজে বহিষ্কার করেছেন। দ্বিতীয় যে কারণটির জন্য তাদের বহিষ্কারকে আল্লাহ তা'আলা নিজের কাজ বলে ঘোষণা করেছেন তা পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে।

৪. একথাটি বুঝার জন্য মনে রাখা দরকার যে, বনী নাযীর শত শত বছর ধরে এখানে প্রভাব প্রতিপত্তির সাথে বসবাস করে আসছিল। মদীনার বাইরে তাদের গোটা জনবসতি একই সাথে ছিল। নিজের গোত্রের লোকজন ছাড়া আর কোন গোত্রের লোকজন তাদের মধ্যে ছিল না। গোটা বসতি এলাকাকে তারা একটি দুর্গে রূপান্তরিত করেছিল। সাধারণত বিশৃংখলাপূর্ণ ও নিরাপত্তাহীন উপজাতীয় এ এলাকায় ঘর–বাড়ী যেভাবে নির্মাণ করা হয়ে থাকে তাদের ঘর–বাড়ীও ঠিক তেমনিভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। এগুলো ছিল ছোট ছোট দুর্গের মত। তাছাড়া তাদের সংখ্যাও সেই সময়ের মুসলমানদের সংখ্যার চেয়ে কম ছিল না। এমনকি মদীনার অভ্যন্তরেও বহু সংখ্যক মুনাফিক তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো। তাই মুসলমানরাও কখনো এ আশা করেনি যে, লড়াই ছাড়া শুধু অবরোধের কারণেই দিশেহারা হয়ে তারা নিজেদের বসতভিটা ছেড়ে চলে যাবে। বনু নাযীর গোত্রের লোকজন নিজেরাও একথা কল্পনা করেনি যে, কোন শক্তি মাত্র ছয় দিনের মধ্যেই তাদের হাত থেকে এ জায়গা ছিনিয়ে নেবে। তাদের পূর্বে যদিও বনী কায়নুকা গোত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো এবং নিজেদের বীরত্বের অহংকার তাদের কোন কাজেই আসেনি। কিন্তু তারা ছিল মদীনার অভ্যন্তরে এক মহল্লার অধিবাসী। তাদের নিজেদের স্বতন্ত্র কোন দুর্গ–প্রাকার বেষ্টিত জনপদ ছিল না। তাই বনী নাযীর গোত্র মনে করতো যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের টিকে থাকতে না পারা অযৌক্তিক বা অসম্ভব কিছু ছিল না। পক্ষান্তরে তারা নিজেদের সুরক্ষিত জনপদ এবং মজবুত দুর্গসমূহ দেখে ধারণাও করতে পারতো না যে, এখান থেকে কেউ তাদের বহিষ্কার করতে পারে। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দশ দিনের মধ্যে মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার চরমপত্র দিলে তারা অত্যন্ত ধৃষ্টতার সাথে খোলাখুলি জবাব দিল, আমরা এখান থেকে চলে যাব না। আপনার কিছু করার থাকলে করে দেখতে পারেন।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রশ্নটি হলো, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে একথা বললেন যে, তারা মনে করে নিয়েছিলো তাদের ছোট ছোট দুর্গের মত বাড়ীঘর তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করবে? বনী নাযীর কি সত্যি সত্যিই জানতো যে, তাদের মোকাবিলা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে নয়, বরং খোদ আল্লাহর সাথে? আর এটা জানার পরেও কি তারা একথা বিশ্বাস করেছিল যে, তাদের দুর্গসমূহ আল্লাহর হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারবে? যারা ইহুদী জাতির মানসিকতা এবং তাদের শত শত বছরের ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত নয় এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির মনে এ প্রশ্ন দ্বিধা ও সংশয়ের সৃষ্টি করবে। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে কেউ ধারণাও করতে পারে না যে, আল্লাহর সাথে মোকাবিলা হচ্ছে সচেতনভাবে একথা জেনে শুনেও তারা এ ধরনের খোশ খেয়ালে মত্ত থাকবে এবং ভাববে যে, তাদের দুর্গ এবং অস্ত্রশস্ত্র তাদেরকে আল্লাহর থেকে রক্ষা করবে। এ কারণে একজন অনভিজ্ঞ লোক এখানে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অর্থ করবেন এই যে, বনী নাযীর বাহ্যত নিজেদের সুদৃঢ় দুর্গসমূহ দেখে ভুল ধারণা করে বসেছিল যে, তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে তাদের মোকাবিলা ছিল আল্লাহর সাথে। এ আক্রমণ থেকে তাদের দুর্গসমূহ তাদের রক্ষা করতে সক্ষম ছিল না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, এই পৃথিবীতে ইহুদীরা একটি অদ্ভুত জাতি যারা জেনে বুঝেও আল্লাহর মোকাবিলা করে আসছে। তারা আল্লাহর রসূলদেরকে আল্লাহর রসূল জেনেও হত্যা করেছে এবং

অহংকারে বুক ঠুকে বলেছে, আমরা আল্লাহর রসূলকে হত্যা করেছি। এ জাতির লোকগাঁথায় রয়েছে যে, "তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়া'কূবের (আ) সাথে আল্লাহ তা'আলার সারা রাত ধরে কুস্তি হয়েছে এবং ভোর পর্যন্ত লড়াই করেও আল্লাহ তা'আলা তাকে পরাস্ত করতে পারেননি। অতপর ভোর হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তাকে বললেন ঃ এখন আমাকে যেতে দাও। এতে ইয়া'কূব (আ) বললেন ঃ যতক্ষণ না তুমি আমাকে বরকত দেবে ততক্ষণ আমি তোমাকে যেতে দেব না। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার নাম কি? তিনি বললেন ঃ ইয়া'কূব। আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ ভবিষ্যতে তোমার নাম ইয়া'কূব হবে না, বরং 'ইসরাঈল' হবে। কেননা, তুমি খোদা ও মানুষের সাথে শক্তি পরীক্ষা করে বিজয়ী হয়েছো।" দেখুন ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থের (The Holy Scriptures) আধুনিকতম অনুবাদ, প্রকাশক, জুয়িশ পাবলিকেশন সোসাইটি অব আমেরিকা, ১৯৫৪, আদিপুস্তক, অধ্যায় ৩২, শ্লোক ২৫ থেকে ২৯। খৃষ্টানদের অনূদিত বাইবেলেও এ বিষয়টি একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইহুদীদের অনুবাদের ফুটনোটে 'ইসরাঈল' শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে ঃ He who Striveth with God অর্থাৎ যিনি খোদার সাথে শক্তি পরীক্ষা করেন। ইনসাইক্লোপেডিয়া অব বাইবেলিকাল লিটারেচারে খৃষ্টান পুরোহিতগণ ইসরাঈল শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ Wreslter with God "খোদার সাথে কুস্তি লড়নেওয়ালা।" হোশেয় পুস্তকে হযরত ইয়াকূবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "তিনি তাঁর যৌবনে খোদার সাথে কুস্তি লড়েছেন। তিনি ফেরেশতার সাথে কুস্তি করে বিজয়ী হয়েছেন।" (অধ্যায় ১২, শ্লোক ৪) অতএব একথা স্পষ্ট যে, বনী ইসরাঈলরা মহান সেই ইসরাঈলেরই বংশধর যার সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস হলো, তিনি খোদার সাথে শক্তি পরীক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর সাথে কুস্তি লড়েছিলেন। তাই খোদার সাথে মোকাবিলা একথা জেনে বুঝেও খোদার বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত হওয়া তাদের জন্য এমন কি আর কঠিন কাজ? এ কারণে তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি অনুসারে তারা আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছে এবং একই কারণে তাদের নিজেদের ধারণা অনুসারে তারা হযরত ঈসাকে শূলে চড়িয়েছে এবং বুক ঠুকে বলেছে ঃ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ (আমরা আল্লাহর রসূল মাসীহ 'ঈসা ইবনে মারয়ামকে হত্যা করেছি)। তাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল একথা জেনে বুঝেও তারা যদি তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে থাকে তাহলে তা তাদের ঐতিহ্য বিরোধী কোন কাজ নয়। তাদের জনসাধারণ না জানলেও পণ্ডিত-পুরোহিত ও আলেম সমাজ ভাল করেই জানতো যে, তিনি আল্লাহর রসূল। এ বিষয়ের কয়েকটি প্রমাণ কুরআন মজীদেই বর্তমান। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, টীকা ৭৯—৯৫ ; সাফ্‌ফাত, টীকা ৭০—৭৩।

৫. আল্লাহ তা'আলার তাদের ওপর চড়াও হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তিনি অন্য কোন স্থানে ছিলেন সেখান থেকে তাদের ওপর চড়াও হয়েছেন। বরং এটি একটি রূপক বাক্য। এরূপ ধারণা দেয়াই মূলত উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে মোকাবিলার সময় তাদের ধারণা ছিল, শুধু একটি পন্থায় আল্লাহ তাদের ওপর বিপদ আনতে পারেন। তাহলো সামনাসামনি কোন সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসা। আর তারা মনে করতো যে, দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়ে তারা সে বিপদ ঠেকাতে পারবে। কিন্তু এমন একটি পথে তিনি তাদের ওপর হামলা করেছেন, যে দিক থেকে কোন বিপদ আসার আদৌ কোন আশংকা তারা করতো

না। সে পথটি ছিল এই যে, ভিতর থেকেই তিনি তাদের মনোবল ও মোকাবিলার ক্ষমতা নিঃশেষ ও অন্তসারশূন্য করে দিলেন। এরপর তাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং দুর্গ কোন কাজেই আসেনি।

৬. অর্থাৎ ধ্বংসসাধিত হয়েছে দু'ভাবে। যে দুর্গের মধ্যে তারা আশ্রয় নিয়েছিল মুসলমানরা বাইরে থেকে অবরোধ করে তা ভেঙ্গে ফেলতে শুরু করলো। আর ভেতর থেকে তারা নিজেরা প্রথমত মুসলমানদের প্রতিহত করার জন্য স্থানে স্থানে কাঠ ও পাথরের প্রতিবন্ধক বসালো এবং সে জন্য নিজেদের ঘর দরজা ভেঙ্গে ভেঙ্গে আবর্জনা জমা করলো। এরপর যখন তারা নিশ্চিত বুঝতে পারলো যে, এ জায়গা ছেড়ে তাদেরকে চলে যেতেই হবে তখন তারা নিজেদের হাতে নিজেদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করতে শুরু করলো যাতে তা মুসলমানদের কোন কাজে না আসে। অথচ এক সময় বড় শখ করে তারা এসব বাড়ীঘর নির্মাণ করে সাজিয়ে গুছিয়েছিল। এরপর তারা যখন এই শর্তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সন্ধি করলো যে, তাদের প্রাণে বধ করা হবে না এবং অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া আর যাই তারা নিয়ে যেতে সক্ষম হবে নিয়ে যেতে পারবে তখন যাওয়ার বেলায় তারা ঘরের দরজা, জানালা এবং খুঁটি পর্যন্ত উপড়িয়ে নিয়ে গেল। এমনকি অনেকে ঘরের কড়িকাঠ এবং কাঠের চাল পর্যন্ত উটের পিঠে তুলে দিল।

৭. এই ঘটনার মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের কয়েকটি দিক আছে। সংক্ষিপ্ত ও জ্ঞানগর্ভ এই আয়াতাংশে সে দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। এই ইহুদীরা মূলত অতীত নবীদেরই উম্মাত ছিল। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করতো, কিতাব বিশ্বাস করতো, পূর্ববর্তী নবীদের বিশ্বাস করতো এবং আখেরাতেও বিশ্বাস করতো। এ সব বিচারে তারা ছিল মূলত সাবেক মুসলমান। কিন্তু তারা যখন দীন ও আখলাককে উপেক্ষা করে শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির লালসা এবং পার্থিব উদ্দেশ্য ও স্বার্থ উদ্ধারের জন্য স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে ন্যায় ও সত্যের প্রতি শত্রুতা পোষণের নীতি অবলম্বন করলো এবং নিজেদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির কোন তোয়াক্কাই করলো না তখন আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ-দৃষ্টিও আর তাদের প্রতি রইলো না। তা না হলে একথা সবারই জানা যে, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। তাই এই পরিণাম দেখিয়ে সর্বপ্রথম মুসলমানদের উপদেশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে, যেন ইহুদীদের মত তারাও নিজেদেরকে খোদার প্রিয়পাত্র ও আদরের সন্তান মনে করে না বসে এবং এই খামখেয়ালীতে মগ্ন না হয় যে, আল্লাহর শেষ নবীর উম্মাত হওয়াটাই তাদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভের গ্যারান্টি। এর বাইরে দীন ও আখলাকের কোন দাবী পূরণ তাদের জন্য জরুরী নয়। সাথে সাথে গোটা দুনিয়ার সেই সব লোককেও এ ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে যারা জেনে বুঝে সত্যের বিরোধিতা করে এবং নিজেদের সম্পদ ও শক্তি এবং উপায়-উপকরণের ওপর এতটা নির্ভর করে যে, মনে করে তা তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। মদীনার ইহুদীদের একথা অজানা ছিল না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কওম বা গোত্রের মান মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছেন না। বরং তিনি একটি আদর্শিক দাওয়াত পেশ করছেন। এ দাওয়াতের লক্ষ গোটা দুনিয়ার সব মানুষ। এ দাওয়াত গ্রহণ করে যে কোন জাতি, গোষ্ঠী ও দেশের মানুষ কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়াই তাঁর উম্মাত হিসেবে গণ্য হতে পারে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

وَلَوْلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى
ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿٣﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۖ وَمَن يُشَآقِّ
ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٤﴾ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً
عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٥﴾

আল্লাহ যদি তাদের জন্য দেশান্তর হওয়া নির্দিষ্ট না করতেন তাহলে তিনি দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি দিতেন।[৮] *আর আখেরাতে তো তাদের জন্য দোযখের শাস্তি রয়েছেই। এ হওয়ার কারণ হলো, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের চরম বিরোধিতা করেছে। যে ব্যক্তিই আল্লাহর বিরোধিতা করে, তাকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর।*

খেজুরের যেসব গাছ তোমরা কেটেছো কিংবা যেসব গাছকে তার মূলের ওপর আগের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো তা সবই ছিল আল্লাহর অনুমতিক্রমে।[৯] *(আল্লাহ এ অনুমতি দিয়েছিলেন এ জন্য) যাতে তিনি ফাসেকদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন।*[১০]

সাল্লামের নিজ খান্দানের লোকজনের মুসলিম সমাজে যে মর্যাদা ছিল হাবশার বেলাল (রা), রোমের সুহাইব (রা) এবং পারস্যের সালমানের (রা)ও সেই একই মর্যাদা ছিল, এটা তারা নিজ চোখে দেখছিল। তাই কুরাইশ, খাযরাজ ও আওস গোত্রের লোকেরা তাদের ওপর আধিপত্য কায়েম করবে এ আশংকা তাদের সামনে ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আদর্শিক দাওয়াত পেশ করছিলেন তা যে অবিকল সেই দাওয়াত যা তাদের নবী-রসূলগণ পেশ করে এসেছেন, এ বিষয়টিও তাদের অজানা ছিল না। এ দাবীও তো তিনি করেননি যে, তিনি নতুন একটি দীন নিয়ে এসেছেন যা ইতিপূর্বে আর কেউ আনেনি। এখন তোমরা নিজেদের দীন বা জীবন ব্যবস্থা ছেড়ে আমার এই দীন বা আদর্শ গ্রহণ করো। বরং তাঁর দাবী ছিল, এটা সেই একই দীন, সৃষ্টির শুরু থেকে আল্লাহর নবী-রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন। প্রকৃতই এটা যে সেই দীন তার সত্যতা তারা তাওরাত থেকে প্রমাণ করতে পারতো। এর মৌল নীতিমালার সাথে নবী-রসূলদের দীনের মৌল নীতিমালার কোন পার্থক্য নেই। এ কারণেই কুরআন মজীদে তাদেরকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে ঃ وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ (তোমরা ঈমান আনো আমার নাযিলকৃত সেই শিক্ষার ওপরে যা তোমাদের কাছে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান শিক্ষার সত্যায়নকারী। সবার আগে তোমরাই তার অস্বীকারকারী হয়ো না) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন চরিত্র ও আখলাকের লোক। তাঁর দাওয়াত কবুল করে মানুষের জীবনে কেমন সর্বাত্মক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। তা তারা

চাক্ষুষ দেখছিল। আনসারগণ দীর্ঘদিন থেকে তাদের নিকট প্রতিবেশী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাদের অবস্থা যা ছিল তাও তারা দেখেছে। আর এখন ইসলাম গ্রহণের পর তাদের যে অবস্থা হয়েছে তাও তাদের সামনে বর্তমান। এভাবে দাওয়াত, দাওয়াতদাতা ও দাওয়াত গ্রহণকারীদের পরিণাম ও ফলাফল সবই তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল। এসব দেখে এবং জেনে বুঝেও তারা শুধু নিজেদের বংশগত গোঁড়ামি এবং পার্থিব স্বার্থের খাতিরে এমন একটি জিনিসের বিরোধিতায় সমস্ত শক্তি নিয়ে উঠে পড়ে লাগলো যার ন্যায় ও সত্য হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ করার কোন অবকাশ অন্তত তাদের জন্য ছিল না। এই সজ্ঞান শত্রুতার পরেও তারা আশা করতো, তাদের দুর্গ তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। অথচ গোটা মানব ইতিহাস একথার সাক্ষী যে, আল্লাহর শক্তি যার বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয় কোন অস্ত্রই তাকে রক্ষা করতে পারে না।

৮. দুনিয়ার আযাবের অর্থ তাদের নামনিশানা মুছে দেয়া। সন্ধি করে নিজেদের জীবন রক্ষা না করে যদি তারা লড়াই করতো তাহলে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। তাদের পুরুষরা নিহত হতো এবং নারী ও শিশুদের দাস-দাসী বানানো হতো। মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের উদ্ধার করারও কেউ থাকতো না।

৯. এখানে একটি বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। মুসলমানরা অবরোধ শুরু করার পর তা সহজসাধ্য করার জন্য বনী নাযীরের বসতির চারদিকে যে খেজুর বাগান ছিল তার অনেক গাছ কেটে ফেলে কিংবা জ্বালিয়ে দেয়। আর যেসব গাছ সামরিক বাহিনীর চলাচলে প্রতিবন্ধক ছিল না সেগুলোকে যথাস্থানে অক্ষত রাখে। এতে মদীনার মুনাফিকরা ও বনী কুরায়যা এমনকি বনী নাযীর গোত্রের লোকও হৈ চৈ করতে শুরু করলো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "ফাসাদ ফিল আরদ্" বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন; কিন্তু দেখো, তরুতাজা শ্যামল ফলবান গাছ কাটা হচ্ছে। এটা কি "ফাসাদ ফিল আরদ" নয়? এই সময় আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশ নাযিল করলেন ঃ "তোমরা যেসব গাছ কেটেছো এবং যা না কেটে অক্ষত রেখেছো এর কোন একটি কাজও নাজায়েয নয়। বরং এ উভয় কাজেই আল্লাহর সম্মতি রয়েছে।" এ থেকে শরীয়াতের এ বিধানটি পাওয়া যায় যে, সামরিক প্রয়োজনে যেসব ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর তৎপরতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে তা "ফাসাদ ফিল আরদ" বা পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টির সংজ্ঞায় পড়ে না। "ফাসাদ ফিল আরদ" হলো কোন সেনাবাহিনীর মাথায় যদি যুদ্ধের ভূত চেপে বসে এবং তারা শত্রুর দেশে প্রবেশ করে শস্যক্ষেত, গবাদি পশু, বাগান, দালানকোঠা, প্রতিটি জিনিসই নির্বিচারে ধ্বংস ও বরবাদ করতে থাকে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক সিরিয়ায় সেনাবাহিনী পাঠানোর সময় যে নির্দেশ দিয়েছিলেন যুদ্ধের ব্যাপারে সেটিই সাধারণ বিধান। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ ফলবান বৃক্ষ কাটবে না, ফসল ধ্বংস করবে না এবং জনবসতি বিরাণ করবে না। কুরআন মজীদে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী মানুষদের নিন্দা ও সমালোচনা করতে গিয়ে এ কাজের জন্য তাদের তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করে বলা হয়েছে ঃ "যখন তারা ক্ষমতাসীন হয় তখন শস্যক্ষেত ও মানব বংশ ধ্বংস করে চলে।" (বাকারাহ, ২০৫) হযরত আবু বকরের (রা) এ নীতি ছিল কুরআনের এ শিক্ষারই হুবহু অনুসরণ। তবে সামরিক প্রয়োজন দেখা দিলে বিশেষ নির্দেশ হলো, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য কোন ধ্বংসাত্মক কাজ অপরিহার্য হয়ে পড়লে তা করা যেতে পারে। তাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে স্পষ্ট করে বলেছেন

যে, قطعو منها ما كان موضعًا للقتال "মুসলমানগণ বনী নাযীরের গাছপালার মধ্যে কেবল সেই সব গাছপালাই কেটেছিলেন যা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থিত ছিল।" (তাফসীরে নায়শাপুরী) ফকীহদের কেউ কেউ ব্যাপারটির এ দিকটার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে মত পেশ করেছেন যে, বনী নাযীরের বৃক্ষ কাটার বৈধতা শুধু এ ঘটনার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। এ থেকে এরূপ সাধারণ বৈধতা পাওয়া যায় না যে, সামরিক প্রয়োজন দেখা দিলেই শত্রুর গাছপালা কেটে ফেলা এবং জ্বালিয়ে দেয়া যাবে। ইমাম আওযায়ী, লাইস ও আবু সাওর এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। তবে অধিকাংশ ফকীহর মত হলো, গুরুত্বপূর্ণ সামরিক প্রয়োজন দেখা দিলে এরূপ করা জায়েয। তবে শুধু ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য এরূপ করা জায়েয নয়।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, কুরআন মজীদের এ আয়াত মুসলমানদের হয়তো সন্তুষ্ট করে থাকতে পারে কিন্তু যারা কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে স্বীকার করতো না নিজেদের প্রশ্নের এ জবাব শুনে তারা কি সান্ত্বনা লাভ করবে যে, এ দু'টি কাজই আল্লাহর অনুমতির ভিত্তিতে বৈধ? এর জবাব হলো শুধু মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্যই কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়েছে। কাফেরদের সন্তুষ্ট করা এর আদৌ কোন উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু ইহুদী ও মুনাফিকদের প্রশ্ন সৃষ্টির কারণে কিংবা মুসলমানদের মনে স্বতস্ফূর্তভাবে সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল, আমরা "ফাসাদ ফিল আরদে" লিপ্ত হয়ে পড়ি নাই তো? তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন যে, অবরোধের প্রয়োজনে কিছুসংখ্যক গাছপালা কেটে ফেলা এবং অবরোধের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না এমন সব গাছপালা না কাটা এ দু'টি কাজই আল্লাহর বিধান অনুসারে বৈধ ছিল।

এ সব গাছ কেটে ফেলা বা জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই দিয়েছিলেন না মুসলমানরা নিজেরাই এ কাজ করে পরে এর শরয়ী বিধান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন সে বিষয়ে মুহাদ্দিসদের বর্ণিত হাদীসসমূহে মতানৈক্য দেখা যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'উমরের বর্ণনা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এর নির্দেশ দিয়েছিলেন (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে জারীর)। ইয়াযীদ ইবনে রূমানের বর্ণনাও তাই। (ইবনে জারীর) অন্যদিকে মুজাহিদ ও কাতাদার বর্ণনা হলো, এসব গাছপালা মুসলমানরা নিজেদের সিদ্ধান্তেই কেটেছিলেন। তারপর এ বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় যে, কাজটি করা তাদের উচিত হয়েছে কিনা? কেউ কেউ তা বৈধ বলে মত প্রকাশ করলেন। আবার কেউ কেউ এরূপ করতে নিষেধ করলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে উভয় দলের কাজই সঠিক বলে ঘোষণা করলেন। (ইবনে জারীর) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ রেওয়ায়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ এ বিষয়ে মুসলমানদের মনে সংশয় সৃষ্টি হয় যে, আমাদের মধ্যে থেকে অনেকে গাছপালা কেটেছে আবার অনেকে কাটেনি। অতএব এখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা উচিত, আমাদের কার কাজ পুরস্কার লাভের যোগ্য আর কার কাজ পাকড়াও হওয়ার যোগ্য? (নাসায়ী) ফকীহদের মধ্যে যারা প্রথম রেওয়ায়াতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তারা এ রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণ করেন যে, এটি ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইজতিহাদ। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট অহী দ্বারা তা সমর্থন ও সত্যায়ন করেছেন। এটা এ বিষয়ের একটা প্রমাণ যে, যেসব ব্যাপারে

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ⑥
مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ
وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ
ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ
فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ⑦

আল্লাহ তা'আলা যেসব সম্পদ তাদের দখলমুক্ত করে তাঁর রসূলের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন[১১] তা এমন সম্পদ নয়, যার জন্য তোমাদের ঘোড়া বা উট পরিচালনা করতে হয়েছে। বরং আল্লাহ তা'আলা যার ওপরে চান তাঁর রসূলদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য দান করেন। আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম।[১২] এসব জনপদের দখলমুক্ত করে যে জিনিসই আল্লাহ তাঁর রসূলকে ফিরিয়ে দেন তা আল্লাহ, রসূল, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য।[১৩] যাতে তা তোমাদের সম্পদশালীদের মধ্যেই কেবল আবর্তিত হতে না থাকে।[১৪] রসূল যা কিছু তোমাদের দেন তা গ্রহণ করো এবং যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদের বিরত রাখেন তা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।[১৫]

আল্লাহর কোন নির্দেশ বর্তমান থাকতো না সে সব ব্যাপারে নবী (সা) ইজতিহাদ করে কাজ করতেন। অপরপক্ষে যেসব ফকীহ দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তারা এ থেকে প্রমাণ পেশ করেন যে, মুসলমানদের দু'টি দল ইজতিহাদের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন দু'টি মত গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা দু'টি মতই সমর্থন করেছেন। অতএব জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ যদি সৎনিয়তে ইজতিহাদ করে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন তবে তাদের মতসমূহ পরস্পর ভিন্ন হবে। কিন্তু আল্লাহর শরীয়াতে তারা সবাই হকের অনুসারী বলে গণ্য হবেন।

১০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল এসব গাছ কাটার দ্বারাও তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হোক এবং না কাটা দ্বারাও অপমানিত ও লাঞ্ছিত হোক। কাটার মধ্যে তাদের অপমান ও লাঞ্ছনার দিকটি ছিল এই যে, যে বাগান তারা নিজ হাতে তৈরী করেছিল এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তারা যে বাগানের মালিক ছিল সেই সব বাগানের গাছপালা তাদের চোখের

সামনেই কেটে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু তারা কোনভাবে কর্তনকারীদের বাধা দিতে পারছে না। একজন সাধারণ কৃষক বা মালিও তার ফসল বা বাগানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বরদাশত করতে পারে না। কেউ যদি তার সামনে তার ফসল বা বাগান ধ্বংস করতে থাকে তাহলে সে তার বিরুদ্ধে প্রাণপাত করবে। সে যদি নিজের সম্পদে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে না পারে তবে তা হবে তার চরম অপমান ও দুর্বলতার প্রমাণ। কিন্তু এখানে পুরা একটি গোত্র যারা শত শত বছর ধরে এ স্থানে বসবাস করে আসছিলো অসহায় হয়ে দেখছিলো যে, তাদের প্রতিবেশী তাদের বাগানের ওপর চড়াও হয়ে এর গাছপালা ধ্বংস করছে। কিন্তু তারা তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেনি। এ ঘটনার পর তারা মদীনায় থেকে গেলেও তাদের কোন মান–মর্যাদা অবশিষ্ট থাকতো না। এখন থাকলো গাছপালা না কাটার মধ্যে অপমান ও লাঞ্ছনার বিষয়টি। সেটি হলো, যখন তারা মদীনা ছেড়ে চলে চাচ্ছিলো তখন নিজ চোখে দেখছিল যে, শ্যামল–সবুজ যেসব বাগান কাল পর্যন্তও তাদের মালিকানায় ছিল আজ তা মুসলমানদের দখলে চলে যাচ্ছে। ক্ষমতায় কুলালে তারা ওগুলো পুরাপুরি ধ্বংস করে যেতো এবং অবিকৃত একটি গাছও মুসলমানদের দখলে যেতে দিতো না। কিন্তু তারা নিরুপায়ভাবে সবকিছু যেমন ছিল তেমন রেখে হতাশা ও দুঃখ ভরা মনে বেরিয়ে গেল।

১১. যেসব বিষয় সম্পত্তি বনী নাযীরের মালিকানায় ছিল এবং তাদের বহিষ্কারের পর তা ইসলামী সরকারের হস্তগত হয়েছিলো এখানে সেই সব বিষয় সম্পত্তির কথা বলা হচ্ছে। এসব সম্পদের ব্যবস্থাপনা কিভাবে করা যাবে এখান থেকে শুরু করে ১০নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সেই সব কথাই বলেছেন। কোন এলাকা বিজিত হয়ে ইসলামী সরকারের দখলভুক্ত হওয়ার ঘটনা যেহেতু এটাই প্রথম এবং পরে আরো এলাকা বিজিত হতে যাচ্ছিলো তাই এ জন্য বিজয়ের শুরুতেই বিজিত ভূমি সম্পর্কে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ভেবে দেখার মত বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলা مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ (যেসব সম্পদ তাদের দখলমুক্ত করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন) বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। এ বাক্য থেকে স্বতঃই এ অর্থ প্রকাশ পায় যে, এই পৃথিবী এবং যেসব জিনিস এখানে পাওয়া যায় তাতে সেই সব লোকদের মূলত কোন অধিকার নেই যারা মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। তারা যদি এর ওপরে দখলকারী ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেও থাকে তাহলেও তার অবস্থা হলো বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য কর্তৃক মনিবের বিষয়–সম্পদ কুক্ষিগত করার মত। প্রকৃতপক্ষে এসব সম্পদের হক হলো তা তার আসল মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মর্জি অনুসারে তাঁর আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করা। আর এভাবে ব্যবহার কেবল নেককার ঈমানদার বান্দারাই করতে পারে। তাই বৈধ ও ন্যায়সংগত যুদ্ধের পরিণতিতে যেসব সম্পদ কাফেরদের দখলমুক্ত হয়ে ঈমানদারদের করায়ত্ত হবে তার মর্যাদা হলো তার মালিক এ সম্পদ নিজের বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যদের দখল থেকে উদ্ধার করে তাঁর অনুগত ভৃত্যদের দখলে দিয়েছেন। তাই ইসলামী আইনের পরিভাষায় এসব বিষয় সম্পদকে 'ফাই' (প্রত্যাবর্তিত বা ফিরিয়ে আনা সম্পদ) বলা হয়েছে।

১২. অর্থাৎ এসব সম্পদের অবস্থা ও প্রকৃতি এমন নয় যে, সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে লড়াই করে তা অর্জন করেছে। তাই এতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এ সম্পদ তাদের মধ্যেই বন্টন করে দিতে হবে। বরং তার প্রকৃত

অবস্থা হলো, আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে তাঁর রসূলদের এবং যে আদর্শের প্রতিনিধিত্ব এ রসূল করছেন সেই আদর্শকে তাদের ওপর বিজয় দান করেছেন। অন্য কথায়, এসব সম্পদ মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হওয়া সরাসরি সেনাবাহিনীর শক্তি প্রয়োগের ফল নয়। বরং এটা সেই সামগ্রিক শক্তির ফল যা আল্লাহ তাঁর রসূল, রসূলের উম্মাত এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শকে দান করেছেন। তাই এসব সম্পদ গনীমাতের সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মর্যাদা সম্পন্ন। এতে যুদ্ধরত সৈনিকদের এমন কোন অধিকার বর্তায় না যে, তা তাদের মধ্যে গনীমাতের মত বন্টন করে দিতে হবে।

এভাবে শরীয়াতে 'গনীমাত' ও 'ফাই'–এর আলাদা আলাদা বিধান দেয়া হয়েছে। সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে গনীমাতের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। বিধানটি হলো, গনীমাতের সম্পদ পাঁচটি অংশে ভাগ করা হবে। এর চারটি অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে এবং একটি অংশ বায়তুলমালে জমা দিয়ে উক্ত আয়াতে বর্ণিত খাতসমূহে খরচ করতে হবে। ফাইয়ের বিধান হলো, তা সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। বরং এর সবটাই পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত খাতসমূহের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে। এই দুই ধরনের সম্পদের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ করা হয়েছেঃ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ (তোমরা তার বিরুদ্ধে নিজেদের ঘোড়া বা উট পরিচালনা কর নাই।) কথাটি দ্বারা ঘোড়া বা উট পরিচালনা করার অর্থ সামরিক তৎপরতা চালানো (Warlike Operations)। সুতরাং সরাসরি এ ধরনের তৎপরতার ফলে যেসব সম্পদ হস্তগত হয়ে থাকে তা গনীমাতের সম্পদ। আর যেসব সম্পদ লাভের পেছনে এ ধরনের তৎপরতা নেই তা সবই 'ফাই' হিসেবে গণ্য।

'গনীমাত' ও 'ফাই'–এর মোটামুটি যে অর্থ এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে ইসলামের ফকীহগণ তা আরো স্পষ্ট করে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ গনীমাত হলো সেই সব অস্থাবর সম্পদ যা সামরিক তৎপরতা চালানোর সময় শত্রু সেনাদের নিকট থেকে লাভ করা গিয়েছে। এসব ছাড়া শত্রু এলাকার ভূমি, ঘরবাড়ী এবং অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ গনীমাতের সংজ্ঞায় পড়ে না। এ ব্যাখ্যার উৎস হলো হযরত উমরের (রা) সেই পত্র যা তিনি ইরাক বিজয়ের পর হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ

فَانْظُرْ مَا اَجْلَبُوْا بِهِ عَلَيْكَ فِى الْعَسْكَرِ مِنْ كُرَاعٍ اَوْمَالٍ فَاقْسِمْهُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاتْرُكِ الْاَرْضِيْنَ وَالْاَنْهَارَ لِعُمَّالِهَا لِيَكُوْنَ ذٰلِكَ فِىْ اَعْطِيَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ –

"সেনাবাহিনীর লোকজন যেসব ধন–সম্পদ তোমাদের কাছে কুড়িয়ে আনবে তা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দাও। আর ভূমি ও সেচ খালে যেসব লোক কাজ করে ভূমি ও সেচ খাল তাদের জন্য রেখে দাও যাতে তার আয় মুসলমানদের বেতন ভাতা ও বৃত্তি দেয়ার কাজে লাগে।" (কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ২৪; কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়েদ, পৃষ্ঠা ৫৭; কিতাবুল খারাজ, ইয়াহইয়া ইবনে আদম, পৃষ্ঠা ২৭, ২৮, ৪৮)

এ কারণে হাসান বসরী বলেন ঃ শত্রুর শিবির থেকে যা হস্তগত হবে তা সেই সব সৈনিকদের হক যারা তা দখল করেছে। কিন্তু ভূমি সব মুসলমানের জন্য। (ইয়াহইয়া ইবনে আদম ২৭) ইমাম আবু ইউসুফ বলেন ঃ "শত্রুসেনাদের কাছ থেকে যেসব জিনিস মুসলমানদের হস্তগত হবে এবং যেসব দ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র ও জীবজন্তু তারা কুড়িয়ে ক্যাম্পে আনবে তাহলো গনীমাত। এর মধ্য থেকে এক–পঞ্চমাংশ আলাদা করে রেখে অবশিষ্ট চার অংশ সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হবে।" (কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ১৮) ইয়াহইয়া ইবনে আদমও এ মত পোষণ করেন এবং তা তিনি তাঁর গ্রন্থ কিতাবুল খারাজে বর্ণনা করেছেন। (পৃষ্ঠা ২৭) যে জিনিসটি 'গনীমাত ও ফাই'–এর পার্থক্য আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরে তা হলো, নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ শেষে গনীমাতের সম্পদ বন্টন এবং বিজিত এলাকা যথারীতি ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত হওয়ার পর সায়েব ইবনে আকরা' নামক এক ব্যক্তি দুর্গের অভ্যন্তরে দু'টি থলি ভর্তি মণি মুক্তা কুড়িয়ে পান। এতে তার মনে খটকা সৃষ্টি হয় যে, তা 'গনীমাত' না 'ফাই'? গনীমাত হলে তা সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হবে। আর 'ফাই' হলে তা বায়তুলমালে জমা হওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত তিনি মদীনায় হাজির হলেন এবং বিষয়টি হযরত উমরের (রা) সামনে পেশ করলেন। হযরত উমর (রা) ফায়সালা করলেন যে, তা বিক্রি করে অর্থ বায়তুলমালে জমা দিতে হবে। এ থেকে জানা গেল যে, শুধু এমন সব অস্থাবর সম্পদ গনীমাত হিসেবে গণ্য হবে যা যুদ্ধের সময় সৈন্যদের হস্তগত হবে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রাপ্ত অস্থাবর সম্পদ স্থাবর সম্পদের মতই 'ফাই' হিসেবে গণ্য হয়। এ ঘটনাটি উল্লেখ করে ইমাম আবু উবায়েদ লিখছেন ঃ

مَا نِيْلَ مِنْ اَهْلِ الشِّرْكِ عَنْوَةً قَسْرًا وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ فَهُوَ الْغَنِيْمَةُ – وَمَانِيْلَ مِنْهُمْ بَعْدُ مَا تَضَعُ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا وَتَصِيْرُ الدَّارُ دَارَالْاِسْلَامِ– فَهُوَ فَيْءٌ يَكُوْنُ لِلنَّاسِ عَامًّا وَلَا خُمُسَ فِيْهِ –

"যুদ্ধ চলাকালে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যেসব সম্পদ শত্রুর কাছ থেকে হস্তগত হবে তা গনীমাত। আর যুদ্ধ শেষে দেশ দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হওয়ার পর যেসব সম্পদ হস্তগত হবে তা 'ফাই' হিসেবে পরিগণিত হবে। এ সম্পদ দারুল ইসলামের অধিবাসীদের কল্যাণে কাজে লাগা উচিত। তাতে এক–পঞ্চমাংশ নির্দিষ্ট হবে না।" (কিতাবুল আমওয়াল, পৃষ্ঠা ২৫৪)

গনীমাতকে এভাবে সংজ্ঞায়িত ও নির্দিষ্ট করার পর কাফেরদের কাছ থেকে মুসলমানদের হস্তগত হওয়া যেসব সম্পদ, বিষয়–সম্পত্তি ও জায়গা–জমি অবশিষ্ট থাকে তা প্রধান দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক, লড়াই করে হস্তগত করা সম্পদ ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় যাকে শক্তি বলে দখলকৃত দেশ বা অঞ্চল বলা হয়। দুই, সন্ধির ফলে যা মুসলমানদের হস্তগত হবে। এ সন্ধি মুসলমানদের সামরিক শক্তির প্রভাব, দাপট কিংবা ভীতির কারণে হলেও। বাহুবলে হস্তগত না হয়ে অন্য কোনভাবে হস্তগত হওয়া সম্পদও এরই মধ্যে অন্তরভুক্ত। মুসলিম ফকীহদের মধ্যে যা কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তা প্রথম প্রকারের সম্পদ সম্পর্কে হয়েছে। অর্থাৎ তার সঠিক শরয়ী মর্যাদা কি? কেননা, তা فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب –এর সংজ্ঞায় পড়ে না। এরপর

থাকে দ্বিতীয় প্রকার সম্পদ। এ প্রকারের সম্পদ সম্পর্কে সর্বসম্মত মত হলো, তা 'ফাই' হিসেবে গণ্য। কারণ এর বিধান কুরআন মজীদে স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। পরে আমরা প্রথম প্রকারের সম্পদের শরয়ী মর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

১৩. এসব সম্পদ আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর মধ্যে গনীমাতের মত বন্টন না করার কারণ কি এবং তার শরয়ী বিধান গনীমাত সম্পর্কিত বিধান থেকে ভিন্ন কেন পূর্ববর্তী আয়াতে শুধু এতটুকু কথাই বলা হয়েছে। এখন এসব সম্পদের হকদার কারা এ আয়াতটিতে তা বলা হয়েছে।

এসব সম্পদের মধ্যে সর্বপ্রথম অংশ হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের। রসূলুল্লাহ (সা) এ নির্দেশ অনুসারে যেভাবে আমল করেছেন হযরত উমর (রা) থেকে মালেক ইবনে আওস ইবনুল হাদাসান তা উদ্ধৃত করেছেন। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ এ অংশ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের ও পরিবার–পরিজনের খরচ নিয়ে নিতেন আর অবশিষ্ট অর্থ জিহাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং সওয়ারী জন্তু সংগ্রহ করতে ব্যয় করতেন। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ইত্যাদি) নবীর (সা) ইন্তিকালের পর এ অংশটি মুসলমানদের বায়তুলমালে জমা দেয়া হতো যাতে আল্লাহ তাঁর রসূলকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই কাজেই তা ব্যয়িত হয়। ইমাম শাফেয়ীর (র) মত হলো, যে অংশটি বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল তা তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর খলীফাদের জন্য নির্দিষ্ট হবে। কারণ ইমামত বা নেতৃত্বের পদমর্যাদার জন্য তিনি এর হকদার ছিলেন, রিসালাতের পদমর্যাদার জন্য নয়। তবে শাফেয়ী ফিকাহবিদগণের অধিকাংশ এ ব্যাপারে অন্যান্য অধিকাংশ ফিকাহবিদগণের অনুরূপ মতামত পোষণ করেন। অর্থাৎ এ অংশটি এখন আর কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং তা মুসলমানদের দীনি ও সামাজিক কল্যাণে ব্যয়িত হবে।

দ্বিতীয় অংশটি হলো আত্মীয়–স্বজনের জন্য। এর অর্থ রসূলের আত্মীয়–স্বজনের জন্য। অর্থাৎ বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব। এ অংশটি নির্ধারিত করা হয়েছিল এ জন্য যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন নিজের এবং নিজের পরিবার–পরিজনের হক আদায় করার সাথে সাথে নিজের সেই সব আত্মীয়–স্বজনের হকও আদায় করতে পারেন যারা তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী অথবা তিনি নিজে যাদের সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর এ অংশেরও ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র মর্যাদা অবশিষ্ট নেই। বরং মুসলমানদের অন্য সব মিসকীন, ইয়াতীম এবং মুসাফিরদের মত বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবের অভাবী লোকদের অধিকারসমূহ ও বায়তুলমালের জিম্মাদারীতে চলে গিয়েছে। তবে যাকাতে তাদের অংশ না থাকার কারণে অন্যদের তুলনায় তাদের অধিকার অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমের যুগে প্রথম দু'টি অংশ বাতিল করে শুধু অবশিষ্ট তিনটি অংশের (ইয়াতীম, মিসকীন ও ইবনুস সাবীল) হকদারদের জন্য 'ফাই' নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু তাঁর যুগে এ নীতি অনুসারে আমল করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইমাম মুহাম্মাদ বাকেরের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, যদিও

হযরত আলীর (রা) আহলে বায়তের রায়ই [এ অংশ নবীর (সা) আত্মীয়–স্বজনের পাওয়া উচিত] তাঁর ব্যক্তিগত রায় ছিল। তথাপি তিনি হযরত আবু বকর ও উমরের (রা) সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ করা পছন্দ করেননি। হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া বলেন ঃ নবীর (সা) পরে ঐ দু'টি অংশ (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অংশ ও যাবিল কুরবার অংশ) সম্পর্কে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল। কিছু সংখ্যক লোকের মত ছিল, প্রথম অংশটি হুজুরের (সা) খলীফার প্রাপ্য। কিছু সংখ্যক লোকের মত ছিল, দ্বিতীয় অংশটি হুজুরের (সা) আত্মীয়–স্বজনদের পাওয়া উচিত। অপর কিছু সংখ্যক লোকের ধারণা ছিল, দ্বিতীয় অংশটি খলীফার আত্মীয়–স্বজনদের দেয়া উচিত। অবশেষে এমতে 'ইজমা' বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো যে, এ দু'টি অংশই জিহাদের প্রয়োজনে খরচ করা হবে। আতা ইবনে সায়েব বলেন ঃ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) তাঁর শাসনকালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অংশ এবং তাঁর আত্মীয়–স্বজনদের অংশ বনী হাশেমদের কাছে পাঠাতে শুরু করেছিলেন। ইমাম আবু হানীফা এবং অধিকাংশ হানাফী ফকীহদের সিদ্ধান্ত হলো, এ ক্ষেত্রে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে অনুসৃত কর্মনীতিই সঠিক ও নির্ভুল (কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ১৯ থেকে ২১)। ইমাম শাফেয়ীর (র) মত হলো, যারা হাশেম ও মুত্তালিব বংশের লোক বলে প্রমাণিত কিংবা সাধারণভাবে সবার কাছে পরিচিত তাদের সচ্ছল ও অভাবী উভয় শ্রেণীর লোককেই 'ফাই'–এর সম্পদ থেকে দেয়া যেতে পারে। (মুগনিউল মুহতাজ) হানাফীদের মতে, এ অর্থ থেকে কেবল তাদের অভাবীদের সাহায্য করা যেতে পারে। অবশ্য অন্যদের তুলনায় তাদের অধিকার অগ্রগণ্য। (রুহুল মায়ানী) ইমাম মালেকের মতে এ ব্যাপারে সরকারের ওপর কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নেই। যে খাতে ইচ্ছা সরকার তা ব্যয় করতে পারেন। তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধরদের অগ্রাধিকার দেয়া উত্তম। (হাশিয়াতুদ দুসুকী আলাশ্‌শারহিল কাবীর)

অবশিষ্ট তিনটি অংশ সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে কোন বিতর্ক নেই। তবে ইমাম শাফেয়ী এবং অন্য তিনজন ইমামের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে 'ফাই'–এর সমস্ত অর্থ–সম্পদ সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করে তার এক ভাগ উপরোক্ত খাতসমূহে এমনভাবে খরচ করা উচিত যেন তার $\frac{১}{৫}$ সাধারণভাবে মুসলমানদের কল্যাণে, $\frac{১}{৫}$ বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবের জন্য, $\frac{১}{৫}$ ইয়াতীমদের জন্য, $\frac{১}{৫}$ মিসকীনদের জন্য এবং $\frac{১}{৫}$ মুসাফিরদের জন্য ব্যয়িত হয়। অপরদিকে ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আহমাদ এভাবে বন্টনের পক্ষপাতী নন। তাঁদের মতে, 'ফাই'–এর সমস্ত অর্থ–সম্পদই সাধারণভাবে মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয়িত হবে। (মুগনিউল মুহতাজ)

১৪. এটি কুরআন মজীদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারক আয়াতসমূহের একটি। এতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পলিসির একটি মৌলিক নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গোটা সমাজে ব্যাপকভাবে সম্পদ আবর্তিত হতে থাকা উচিত। এমন যেন না হয় অর্থ–সম্পদ কেবল ধনবান ও বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকবে। কিংবা ধনী দিনে দিনে আরো ধনশালী হতে থাকবে আর গরীব দিনে দিনে আরো বেশী গরীব হতে থাকবে। কুরআন মজীদে এ নীতি শুধু বর্ণনা করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি। বরং এ উদ্দেশ্যে সুদ হারাম করা হয়েছে, যাকাত ফরয করা হয়েছে, গনীমাতের

সম্পদ থেকে এক–পঞ্চমাংশ বের করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, বিভিন্ন আয়াতে নফল সাদকা ও দান–খয়রাতের শিক্ষা দেয়া হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের কাফ্‌ফারা আদায়ের এমন সব পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে যার মাধ্যমে সম্পদের প্রবাহ সমাজের দরিদ্র মানুষদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া যেতে পারে। উত্তরাধিকারের জন্য এমন আইন রচনা করা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ যেন ব্যাপক পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে, কার্পণ্য ও বখিলীকে নৈতিক বিচারে কঠোরভাবে নিন্দনীয় এবং দানশীলতাকে সর্বোত্তম গুণ বলে প্রশংসা করা হয়েছে আর সচ্ছল শ্রেণীকে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের সম্পদে প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে যাকে খয়রাত মনে করে নয় বরং তাদের অধিকার মনে করে আদায় করা উচিত। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের একটি বড় খাত অর্থাৎ 'ফাই' সম্পর্কে এমন একটি আইন রচনা করা হয়েছে যে, এর একটি অংশ যেন অনিবার্যরূপে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীকে সহায়তা দানের জন্য ব্যয়িত হয়। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত, ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাত দু'টি একটি যাকাত এবং অন্যটি 'ফাই'। মুসলমানদের নিসাবের অতিরিক্ত পুঁজি, গবাদি পশু, ব্যবসায় পণ্য এবং কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য থেকে আদায় করা হয়, আর এর বেশীর ভাগই গরীবদের জন্য নির্দিষ্ট। আর 'ফাই'–এর মধ্যে জিযিয়া ও ভূমি রাজস্ব সহ সেই সব আয়ও অন্তরভুক্ত যা অমুসলিমদের নিকট থেকে আসে। এরও বেশীর ভাগ গরীবদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এটা এ বিষয়েরই স্পষ্ট ইংগিত যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্রকে তার আয় ও ব্যয়ের ব্যবস্থা এবং সামগ্রিকভাবে দেশের গোটা আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা এমনভাবে পরিচালনা করা উচিত যেন ধন–সম্পদের উপায়–উপকরণের ওপর বিত্তবান এবং প্রভাবশালী লোকদের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সম্পদের প্রবাহ গরীবদের দিক থেকে ধনীদের দিকে ঘুরে না যায় আর বিত্তশালীদের মধ্যেই যেন আবর্তিত হতে না থাকে।

১৫. বর্ণনার ধারাবাহিকতার দিক থেকে এ আয়াতের অর্থ হলো, বনী নাযীর গোত্র থেকে লব্ধ সম্পদের ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপভাবে পরবর্তীকালে লব্ধ 'ফাই'–এর সম্পদের বিলি–বন্টনের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা কোন প্রকার আপত্তি ও দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ছাড়াই মেনে নাও। তিনি যাকে যা দেবেন সে তা গ্রহণ করবে এবং যা কাউকে দেবেন না সে জন্য যেন সে আপত্তি বা দাবী উত্থাপন না করে। কিন্তু নির্দেশটির ভাষা যেহেতু ব্যাপকতাবোধক, তাই এ নির্দেশ শুধু 'ফাই' সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর অভিপ্রায় হলো, মুসলমান সব ব্যাপারেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করবে। এ অভিপ্রায়কে আরো স্পষ্ট করে দেয় এ বিষয়টি যে, "রসূল তোমাদের যা কিছু দেন" কথাটির বিপরীতে "যা কিছু না দেন" বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে যে, "যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদের বিরত রাখেন (নিষেধ করেন) তা থেকে বিরত থাকো।" এ নির্দেশের লক্ষ যদি শুধু 'ফাই' –এর সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে আনুগত্য করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হতো তা হলে 'যা দেন' কথাটির বিপরীতে 'যা না দেন' বলা হতো। এ ক্ষেত্রে নিষেধ করা বা বিরত রাখা কথাটির ব্যবহার দ্বারা আপনা থেকেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ নির্দেশের লক্ষ ও উদ্দেশ্য নবীর (সা) আদেশ ও নিষেধের আনুগত্য করা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ
فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الصّٰدِقُوْنَ ۚ﴿۸﴾ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ
هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ
عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ۚ﴿۹﴾

(তাছাড়াও এ সম্পদ) সেই সব গরীব মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘর–বাড়ী ও বিষয়–সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে।[১৬] এসব লোক চায় আল্লাহর মেহেরবানী এবং সন্তুষ্টি। আর প্রস্তুত থাকে আল্লাহ ও তার রসূলকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য। এরাই হলো সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ লোক। (আবার তা সেই সব লোকের জন্যও) যারা এসব মুহাজিরদের আগমনের পূর্বেই ঈমান এনে দারুল হিজরাতে বসবাস করছিলো।[১৭] তারা ভালবাসে সেই সব লোকদের যারা হিজরাত করে তাদের কাছে এসেছে। যা কিছুই তাদের দেয়া হোক না কেন এরা নিজেদের মনে তার কোন প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করে না এবং যত অভাবগ্রস্তই হোক না কেন নিজেদের চেয়ে অন্যদের অগ্রাধিকার দান করে।[১৮] মূলত যেসব লোককে তাদের মনের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম।[১৯]

নিজেও একথাটি বলেছেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ

اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَاْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ – (بخارى – مسلم)

"আমি কোন বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ দিলে তা যথাসাধ্য পালন করো। আর যে বিষয়ে বিরত থাকতে বলি তা থেকে দূরে থাকো।" (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তিনি বক্তৃতাকালে বললেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা অমুক অমুক ফ্যাশনকারীনী মহিলাকে লা'নত করেছেন।" এই বক্তৃতা শুনে এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বলল ঃ একথা আপনি কোথায়

পেয়েছেন? আল্লাহর কিতাবে তো এ বিষয়টি আমি কোথাও দেখি নাই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন ঃ তুমি আল্লাহর কিতাব পড়ে থাকলে একথা অবশ্যই পেতে। তুমি কি এ আয়াত مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا পড়েছো? সে বললো ঃ হাঁ, এ আয়াত তো আমি পড়েছি। হযরত আবদুল্লাহ বললেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, এরূপ কাজে লিপ্ত নারীদের ওপর আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন। মহিলাটি বললোঃ এখন আমি বুঝতে পারলাম। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে ইবনে আবী হাতেম।)

১৬. এ কথা দ্বারা সেই সব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা ঐ সময় মক্কা মুয়াযযামা ও আরবের অন্যান্য এলাকা থেকে ইসলাম গ্রহণের কারণে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। বনী নাযীর গোত্রের এলাকা বিজিত হওয়া পর্যন্ত এসব মুহাজিরের জীবন যাপনের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেসব অর্থ–সম্পদ এখন হস্তগত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যেসব সম্পদ 'ফাই' হিসেবে হস্তগত হবে তাতে সাধারণ মিসকীন, ইয়াতীম এবং মুসাফিরদের সাথে সাথে এসব লোকেরও অধিকার আছে। উক্ত সম্পদ থেকে এমন সব লোকদের সহযোগিতা দেয়া উচিত যারা আল্লাহ, আল্লাহর রসূল এবং তাঁর দীনের জন্য হিজরাত করতে বাধ্য হয়েছে এবং দারুল ইসলামে চলে এসেছে। এই নির্দেশের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী নাযীরের সম্পদের একটি অংশ মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং আনসারগণ যেসব খেজুর বাগান তাদের মুহাজির ভাইদের সাহায্যের জন্য দিয়ে রেখেছিলেন তা তাদের ফিরিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু এরূপ মনে করা ঠিক নয় যে, 'ফাই'–এর সম্পদে মুহাজিরদের এ অংশ কেবল সেই যুগের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, কিয়ামত পর্যন্ত যত লোকই মুসলমান হওয়ার কারণে নির্বাসিত হয়ে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে তাদের পুনর্বাসিত করা এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করে দেয়া উক্ত রাষ্ট্রের ইসলামী সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তরভুক্ত। তাই তার উচিত যাকাত ছাড়া 'ফাই'–এর সম্পদও এ খাতে খরচ করা।

১৭. এখানে আনসারদের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'ফাই' অর্থ–সম্পদে শুধু মুহাজিরদের অধিকার নেই। বরং আগে থেকেই যেসব মুসলমান দারুল ইসলামে বসবাস করে আসছে তারাও এতে অংশ লাভের অধিকারী।

১৮. এটা মদীনা তাইয়্যেবার আনসারদের পরিচয় ও প্রশংসা। মুহাজিরগণ মক্কা ও অন্যান্য স্থান থেকে হিজরত করে তাঁদের শহরে আসলে তাঁরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রস্তাব দিলেন, আমাদের বাগ–বাগিচা ও খেজুর বাগান দিয়ে দিচ্ছি। আপনি ওগুলো আমাদের এবং এসব মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন। নবী (সা) বললেন ঃ এসব লোক তো বাগানের কাজ জানে না। তারা এমন এলাকা থেকে এসেছে যেখানে বাগান নেই। এমন কি হতে পারে না, এসব বাগ–বাগিচা ও খেজুর বাগানে তোমরাই কাজ করো এবং উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ এদের দাও। তারা বললো ঃ سمعنا واطعنا আমরা মেনে নিলাম। (বুখারী, ইবনে জারীর) এতে মুহাজিরগণ বলে উঠলেন ঃ এ রকম আত্মত্যাগী মানুষ তারা আর কখনো দেখেনি। এরা নিজেরা কাজ

করবে অথচ আমাদেরকে অংশ দেবে। আমাদের তো মনে হচ্ছে, সমস্ত সওয়াব তারাই লুটে নিয়েছে। নবী (সা) বললেন ঃ তা নয়, যতক্ষণ তোমরা তাদের প্রশংসা করতে থাকবে এবং তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করবে ততক্ষণ তোমরাও সওয়াব পেতে থাকবে। (মুসনাদে আহমাদ) অতপর বনী নাযীরের এলাকা বিজিত হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এখন একটা বন্দোবস্ত হতে পারে এভাবে যে, তোমাদের বিষয়–সম্পদ এবং ইহুদীদের পরিত্যক্ত ফল–ফলাদি ও খেজুর বাগান মিলিয়ে একত্রিত করে সবটা তোমাদের ও মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া যাক । আরেকটা বন্দোবস্ত হতে পারে এভাবে যে, তোমরা তোমাদের বিষয়–সম্পদ নিজেরাই ভোগ দখল করো আর পরিত্যক্ত এসব ভূমি মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া যাক। আনসারগণ বললেন ঃ এসব বিষয়–সম্পদ আপনি তাদের মধ্যে বিলি–বন্টন করে দিন। আর আপনি চাইলে আমাদের বিষয়–সম্পদেরও যতটা ইচ্ছা তাদের দিয়ে দিতে পারেন। এতে হযরত আবু বকর চিৎকার করে উঠলেন ঃ جزاكم الله يامعشر الانصار خيرا "হে আনসারগণ, আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন।" (ইয়াহইয়া ইবনে আদম, বালাযুরী) এভাবে আনসারদের সম্মতির ভিত্তিতেই ইহুদীদের পরিত্যক্ত অর্থ–সম্পদ মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হলো। আনসারদের মধ্যে থেকে শুধু হযরত আবু দুজানা, হযরত সাহল ইবনে সা'দ এবং কারো কারো বর্ণনা অনুসারে হযরত হারেস ইবনুস্ সিমাকে অংশ দেয়া হলো। কারণ, তাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। (বালাযুরী, ইবনে হিশাম, রূহুল মায়ানী) বাহরাইন এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত হলে সে সময়ও আনসারগণ এই ত্যাগের প্রমাণ দেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ অঞ্চলের বিজিত ভূমি শুধু আনসারদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। কিন্তু আনসারগণ বললেন ঃ যতক্ষণ আমাদের সমপরিমাণ অংশ আমাদের ভাই মুহাজিরদের দেয়া না হবে ততক্ষণ আমরা এ সম্পদের কোন অংশ গ্রহণ করবো না। (ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম) আনসারদের এ সব ত্যাগের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেছেন।

১৯. 'রক্ষা পেয়েছে' না বলে বলা হয়েছে 'রক্ষা করা হয়েছে'। কেননা আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ও সাহায্য ছাড়া কেউ নিজ বাহু বলে মনের ঔদার্য ও ঐশ্বর্য লাভ করতে পারে না। এটা আল্লাহর এমন এক নিয়ামত যা আল্লাহর দয়া ও করুণায়ই কেবল কারো ভাগ্যে জুটে থাকে। شح শব্দটি আরবী ভাষায় অতি কৃপণতা ও বখিলী বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শব্দটিকে যখন نفس শব্দের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে شح النفس বলা হয় তখন তা দৃষ্টি ও মনের সংকীর্ণতা, পরশ্রীকাতরতা এবং মনের নীচতার সমার্থক হয়ে যায় যা বখিলী বা কৃপণতার চেয়েও ব্যাপক অর্থ বহন করে। বরং কৃপণতার মূল উৎস এটিই। এই বৈশিষ্টের কারণে মানুষ অন্যের অধিকার স্বীকার করা এবং তা পূরণ করা তো দূরের কথা তার গুণাবলী স্বীকার করতে পর্যন্ত কুন্ঠাবোধ করে। সে চায় দুনিয়ার সবকিছু সে–ই লাভ করুক। অন্য কেউ যেন কিছুই না পায়। নিজে অন্যদের কিছু দেয়া তো দূরের কথা, অপর কোন ব্যক্তি যদি কাউকে কিছু দেয় তাহলেও সে মনে কষ্ট পায়। তার লালসা শুধু নিজের অধিকার নিয়ে কখনো সন্তুষ্ট নয়, বরং অন্যদের অধিকারেও সে হস্তক্ষেপ করে, কিংবা অন্ততপক্ষে সে চায় তার চারদিকে ভাল বস্তু যা আছে তা সে নিজের জন্য দু'হাতে লুটে নেবে অন্য কারো জন্য কিছুই রাখবে না। এ কারণে এ জঘন্য স্বভাব থেকে রক্ষা পাওয়াকে কুরআন মজীদে সাফল্যের গ্যারান্টি বলে

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ⑩

(তা সেই সব লোকের জন্যও) যারা এসব অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে।[২০] যারা বলে : হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে মাফ করে দাও যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব, তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু।[২১]

আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এটিকে মানুষের নিকৃষ্টতম স্বভাব বলে গণ্য করেছেন যা বিপর্যয়ের উৎস। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, নবী (সা) বলেছেন :

اِتَّقُوْا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ (مسلم - مسند احمد - بيهقى - بخارى فى الادب)

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে আমরের বর্ণনার ভাষা হলো :

اَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوْا وَاَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا - وَاَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا (مسند احمد - ابو داؤد - نسائى)

অর্থাৎ شح থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কারণ এটিই তোমাদের পূর্বের লোকদের ধ্বংস করেছে। এটিই তাদেরকে পরস্পরের রক্তপাত ঘটাতে এবং অপরের মর্যাদাহানি নিজের জন্য বৈধ মনে করে নিতে মানুষকে প্ররোচিত করেছে। এটিই তাদের জুলুম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে তাই তারা জুলুম করেছে। পাপের নির্দেশ দিয়েছে তাই পাপ করেছে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে বলেছে তাই তারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন : ঈমান ও মনের সংকীর্ণতা একই সাথে কারো মনে অবস্থান করতে পারে না। (ইবনে আবি শায়বা, নাসায়ী, বায়হাকী ফী শুআবিল ঈমান, হাকেম) হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন : দুইটি স্বভাব এমন যা কোন মুসলমানের মধ্যে থাকতে পারে না। অর্থাৎ কৃপণতা ও দুশ্চরিত্রতা। (আবু দাউদ, তিরমিযী, বুখারী ফিল আদাব) কিছু সংখ্যক ব্যক্তির কথা বাদ

দিলে পৃথিবীতে জাতি হিসেবে মুসলমানরা আজও সবচেয়ে বেশী দানশীল ও উদারমনা। সংকীর্ণমন্যতা ও কৃপণতার দিক দিয়ে যেসব জাতি পৃথিবীতে নজিরবিহীন সেই সব জাতির কোটি কোটি মুসলমান তাদের স্বগোত্রীয় অমুসলিমদের পাশাপাশি বসবাস করছে। হৃদয়–মনের ঔদার্য ও সংকীর্ণতার দিক দিয়ে তাদের উভয়ের মধ্যে যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায় তা ইসলামের নৈতিক শিক্ষার অবদান। এ ছাড়া তার অন্য কোন ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। এ শিক্ষাই মুসলমানদের হৃদয়–মনকে বড় করে দিয়েছে।

২০. এ পর্যন্ত যেসব বিধি–বিধান বর্ণনা করা হয়েছে তাতে চূড়ান্তভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, 'ফাই'–এর সম্পদে আল্লাহ, রসূল, রসূলের আত্মীয়–স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, মুহাজির, আনসার এবং কিয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভকারী সমস্ত মুসলমানের অধিকার আছে। এটি কুরআন মজীদের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত সিদ্ধান্ত যার আলোকে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাক, শাম ও মিসরের বিজিত এলাকাসমূহের ভূমি ও অর্থ–সম্পদ এবং ঐ সব দেশের পূর্বতন সরকার ও তার শাসকদের বিষয়–সম্পদের নতুনভাবে বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেছিলেন। এসব অঞ্চল বিজিত হলে হযরত যুবায়ের, হযরত বেলাল, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ এবং হযরত সালমান ফারসী সহ বিশিষ্ট কিছু সংখ্যক সাহাবী অত্যন্ত জোর দিয়ে বললেন যে, যেসব সৈন্য লড়াই করে এসব এলাকা জয় করেছে এসব তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হোক। তাঁদের ধারণা ছিল এসব সম্পদ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ এর সংজ্ঞায় পড়ে না। বরং মুসলমানরা তাদের ঘোড়া এবং উট পরিচালনা করে এসব করায়ত্ত করেছে। তাই যেসব শহর ও অঞ্চল যুদ্ধ ছাড়াই বশ্যতা স্বীকার করেছে সেইগুলো ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত বিজিত অঞ্চল গনীমাতের সংজ্ঞায় পড়ে। আর তার শরয়ী বিধান হলো, ঐ সব অঞ্চলের ভূমি ও অধিবাসীদের এক–পঞ্চমাংশ বায়তুলমালের অধীনে ন্যস্ত করতে হবে এবং অবশিষ্ট চার অংশ সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। কিন্তু এই মতটি সঠিক ছিল না। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে যুদ্ধ করে যেসব এলাকা দখল করা হয়েছিলো তিনি তার কোনটিরই ভূমি ও বাসিন্দাদের থেকে গনীমাতের মত এক–পঞ্চমাংশ বের করে রেখে অবশিষ্টাংশ সেনাবাহিনীর মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন না। তাঁর যুগের দু'টি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো, মক্কা ও খায়বার বিজয়। এর মধ্যে পবিত্র মক্কাকে তিনি অবিকল তার বাসিন্দাদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর থাকলো খায়বারের বিষয়টি। এ সম্পর্কে হযরত বুশাইর ইয়াসার বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) খায়বারকে ৩৬টি অংশে ভাগ করলেন। তার মধ্য থেকে ১৮ অংশ সামষ্টিক ও সামগ্রিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখে অবশিষ্ট ১৮ অংশ সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (আবু দাউদ, বায়হাকী, কিতাবুল আমওয়াল–আবু উবায়েদ; কিতাবুল খারাজ—ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম; ফুতূহুল বুলদান—বালাযুরী; ফাতহুল কাদীর—ইবনে হুমাম) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কাজ দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়েছিলো যে, যুদ্ধ করে জয় করা হলেও বিজিত ভূমির বিধান গনীমাতের বিধানের মত নয়। তা না হলে পবিত্র মক্কাকে পুরোপুরি তার অধিবাসীদের কাছে ফেরত দেয়া এবং খায়বারের এক–পঞ্চমাংশ বের করে নেয়ার পরিবর্তে তার পুরা অর্ধেকটা অংশ সামগ্রিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বায়তুলমালে নিয়ে নেয়া কি করে সম্ভব হলো? অতএব, সুন্নাত তথা রসূলের কাজকর্ম দ্বারা যা প্রমাণিত তাহলো, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত অঞ্চলসমূহের

ব্যাপারে পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ও এখতিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানের আছে। তিনি তা বন্টনও করতে পারেন, আর পবিত্র মক্কার মত কোন অস্বাভাবিক প্রকৃতির এলাকা যদি হয় তাহলে তিনি সেখানকার অধিবাসীদের প্রতি ইহসানও করতে পারেন, নবী (সা) যেমনটি মক্কাবাসীদের প্রতি করেছিলেন।

কিন্তু নবীর (সা) যুগে যেহেতু ব্যাপক এলাকা বিজিত হয়নি এবং বিভিন্ন প্রকারের বিজিত অঞ্চলের আলাদা আলাদা বিধান সুস্পষ্টভাবে লোকের সামনে আসেনি। তাই হযরত উমরের (রা) যুগে বড় বড় দেশ ও অঞ্চল বিজিত হলে সাহাবায়ে কিরামের সামনে এ সমস্যা দেখা দিলো যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত এসব অঞ্চল গনীমাত হিসেবে গণ্য হবে না 'ফায়' হিসেবে গণ্য হবে? মিসর বিজয়ের পর হযরত যুবায়ের দাবী করলেন যে,

اَقْسِمْهَا كَمَا قَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ –

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে খায়বর এলাকা বন্টন করে দিয়েছিলেন অনুরূপ এই গোটা অঞ্চল ভাগ করে দিন।" (আবু উবায়েদ)

শাম ও ইরাকের বিজিত অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে হযরত বেলাল (রা) জোর দিয়ে বললেন যে,

اَقْسِمِ الْاَرْضِيْنَ بَيْنَ الَّذِيْنَ افْتَتَحُوْهَا كَمَا تُقَسَّمُ غَنِيْمَةُ الْعَسْكَرِ

"যেভাবে গনীমাতের সম্পদ ভাগ করা হয় ঠিক সেভাবে সমস্ত বিজিত ভূমি বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে ভাগ করে দিন।" (কিতাবুল খারাজ—আবু ইউসুফ)

অপর দিকে হযরত আলীর (রা) মত ছিল এই যে,

دَعْهُمْ يَكُوْنُوْا مَادَّةً لِلْمُسْلِمِيْنَ

"এসব ভূমি এর চাষাবাদকারীদের কাছে থাকতে দিন যেন তা মুসলমানদের আয়ের একটা উৎস হয়ে থাকে"। (আবু ইউসুফ, আবু উবায়েদ)

অনুরূপ হযরত মু'য়ায ইবনে জাবালের মত ছিল এই যে, আপনি যদি এসব বন্টন করে দেন তাহলে তার পরিণাম খুবই খারাপ হবে। এ বন্টনের ফলে বড় বড় সম্পদ ও সম্পত্তি মুষ্টিমেয় কিছু লোকের করায়ত্ত হয়ে পড়বে যারা এসব অঞ্চল জয় করেছে। পরে এসব লোক দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে আর তাদের বিষয়–সম্পদ তাদের উত্তরাধিকারীদের কাছেই থেকে যাবে। অনেক সময় হয়তো একজন মাত্র নারী বা পুরুষ হবে এই উত্তরাধিকারী। কিন্তু পরবর্তী বংশধরদের প্রয়োজন পূরণের জন্য এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্য কিছুই থাকবে না। তাই আপনি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থের সংরক্ষণ সমানভাবে হতে পারে (আবু উবায়েদ, পৃষ্ঠা—৫৯; ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা—১৩৮)। গোটা ইরাক বন্টন করে দিলে মাথাপিছু কি পরিমাণ অংশ হয় হযরত উমর (রা) তা হিসেব করে দেখলেন। তিনি জানতে পারলেন, গড়ে মাথাপিছু দুই তিন ফাল্লাহ করে পড়ে, (আবু

ইউসুফ, আবু উবায়েদ) অতপর তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, ঐ সব এলাকা বন্টিত না হওয়া উচিত। সুতরাং বন্টনের দাবীদার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে তিনি যেসব জওয়াব দিয়েছিলেন তাহলো ঃ

تُرِيْدُوْنَ اَنْ يَاْتِىَ اٰخِرُ النَّاسِ لَيْسَ لَهُمْ شَيْئٌ (ابو عبيد)

"আপনারা কি চান, পরবর্তী লোকদের জন্য কিছুই না থাক?"

فَكَيْفَ بِمَنْ يَاْتِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَجِدُوْنَ الْاَرْضَ بِعُلُوْجِهَا قَدِ اقْتُسِمَتْ وَوُرِّثَتْ عَنِ الْاٰبَاءِ وَحُيِّزَتْ ؟ مَاهٰذَا بِرَائِىْ (ابو يوسف)

"পরবর্তীকালের মুসলমানদের কি উপায় হবে? তারা এসে দেখবে ভূমি কৃষকসহ আগে থেকেই বন্টিত হয়ে আছে এবং মানুষ বাপ-দাদার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তা ভোগ দখল করছে? তা কখনো হতে পারে না।"

فَمَا لِمَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَخَافُ اِنْ قَسَّمْتُهُ اَنْ تَفَاسَدُوْا بَيْنَكُمْ فِى الْمِيَاهِ (ابو عبيد)

"তোমাদের পরে আগমনকারী মুসলমানদের জন্য কি থাকবে? তাছাড়া আমার আশংকা হয় যদি আমি এসব বন্টন করে দেই তাহলে পানি নিয়ে তোমরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে।"

لَوْلَا اٰخِرُ النَّاسِ مَافَتَحْتُ قَرْيَةً اِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ (بخارى ، مؤطا ، ابو عبيد)

"পরবর্তী লোকদের চিন্তা যদি না হতো তাহলে যে জনপদই আমি জয় করতাম তা ঠিক সেভাবে বন্টন করতাম যেভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার বন্টন করেছিলেন।"

لَا هٰذَا عَيْنُ الْمَالِ وَلٰكِنِّىْ اَحْبِسُهُ فِيْمَا يَجْرِىْ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ (ابو عبيد)

"না, এটাই তো মূল সম্পদ (Real estate) আমি তা ধরে রাখবো যাতে তা দিয়ে বিজয়ী সৈনিক ও সাধারণভাবে মুসলমানদের সবার প্রয়োজন পূরণ হতে পারে।"

কিন্তু এসব জওয়াব শুনেও লোকজন সন্তুষ্ট হলো না। তারা বলতে শুরু করলো যে, আপনি জুলুম করছেন। অবশেষে হযরত উমর (রা) মজলিসে শুরার অধিবেশন ডাকলেন এবং তাদের সামনে এ বিষয়টি পেশ করলেন। এই সময় তিনি যে ভাষণ দান করেন তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

আমি আপনাদেরকে শুধু এ জন্য কষ্ট দিয়েছি যে, আপনাদের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনার যে দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে সেই আমানত রক্ষা করার ব্যবস্থাপনায় আমার সাথে আপনারাও শরীক হবেন। আমি আপনাদেরই একজন। আর আপনারা সেই সব ব্যক্তি যারা আজ সত্যকে মেনে চলছেন। আপনাদের মধ্য থেকে যার ইচ্ছা আমার সাথে ঐকমত্য পোষণ করবেন। আর যার ইচ্ছা আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করবেন। আমি চাই না, আপনারা আমার ইচ্ছার অনুসরণ করেন। আপনাদের কাছে ন্যায় ও সত্য বিধানদাতা আল্লাহর কিতাব রয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি যদি কোন কিছু করার জন্য কোন কথা বলে থাকি তাহলে সে ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার নেই ....। আপনারা তাদের কথা শুনেছেন যাদের ধারণা হলো আমি তাদের প্রতি জুলুম করছি এবং তাদের হক নষ্ট করতে চাচ্ছি। অথচ কারো প্রতি জুলুম করা থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকি। যা তাদের জুলুম করে আমি যদি তা তাদের না দিয়ে অন্য কাউকে দেই তাহলে সত্যি সত্যিই আমি বড় হতভাগ্য। আমি দেখতে পাচ্ছি কিসরার দেশ ছাড়া বিজিত হওয়ার মত আর কোন অঞ্চল এখন নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরানীদের ধন-সম্পদ, তাদের ভূমি এবং কৃষক সবই আমাদের করায়ত্ত করে দিয়েছেন। আমাদের সৈনিকরা যেসব গনীমাত লাভ করেছিল তার এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে আমি তাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছি। আর গনীমাতের যেসব সম্পদ এখনো বন্টিত হয়নি আমি সেগুলোও বন্টন করার চিন্তা-ভাবনা করছি। তবে ভূমি সম্পর্কে আমার মত হলো, ভূমি ও এর চাষাবাদকারীদের বন্টন করবো না। বরং ভূমির ওপর খারাজ বা ভূমি-রাজস্ব এবং কৃষকদের ওপর জিযিয়া আরোপ করবো। তারা সবসময় এগুলো দিতে থাকবে। এই অর্থ বর্তমানকালের সব মুসলমান, যুদ্ধরত সৈনিক, মুসলমানদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য 'ফাই' হিসেবে গণ্য হবে। আপনারা কি দেখছেন না আমাদের সীমান্তসমূহ রক্ষার জন্য লোকের অপরিহার্য প্রয়োজন? আপনারা কি দেখছেন না, এসব বড় বড় দেশ—সিরিয়া, আলজিরিয়া, কুফা, বসরা, মিসর এসব স্থানে সেনাবাহিনী মোতায়েন থাকা দরকার এবং নিয়মিতভাবে তাদের বেতনও দেয়া দরকার? চাষাবাদকারী সহ এসব ভূমি যদি আমি বন্টন করে দেই তাহলে এসব খাতে ব্যয়ের অর্থ কোথা থেকে আসবে?

দুই তিন দিন পর্যন্ত এ বিষয়ে আলোচনা ও যুক্তি-তর্ক চলতে থাকলো। হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর এবং আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হযরত উমরের (রা) মত সমর্থন করলেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা গেল না। অবশেষে হযরত উমর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আমি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি দলীল পেয়ে গিয়েছি যা এ সমস্যার সমাধান দেবে। এরপর তিনি সূরা হাশরের এই আয়াত কয়টি অর্থাৎ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ থেকে رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ পর্যন্ত পড়লেন এবং তা থেকে এ দলীল পেশ করলেন যে, আল্লাহর দেয়া এসব সম্পদে শুধু এ যুগের লোকদেরই অংশ ও অধিকার বর্তায় না। বরং তাদের সাথে আল্লাহ পরবর্তীকালের লোকদেরও শরীক করেছেন। তাই 'ফাই'য়ের যে সম্পদ সবার জন্য; পরবর্তীকালের লোকদের জন্য তার কিছুই না রেখে সবই কেবল এসব বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে আমি বন্টন করে দেব, তা কি করে সঠিক হতে পারে? তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ "যাতে এ সব

সম্পদ শুধু তোমাদের বিত্তবানদের মধ্যে আবর্তিত হতে না থাকে।" কিন্তু আমি যদি কেবল বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যেই তা বন্টন করে দেই তাহলে তা তোমাদের বিত্তবানদের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকবে, অন্যদের জন্য কিছুই থাকবে না। এই যুক্তি ও প্রমাণ সবাইকে সন্তুষ্ট করলো, আর এ বিষয়ে 'ইজমা' বা ঐকমত্য হয়ে গেল যে, বিজিত গোটা এলাকা সকল মুসলমানের স্বার্থে 'ফাই' হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। যেসব লোক এখানে কাজ করছে তাদের হাতেই এসব ভূমি থাকতে দেয়া হবে এবং তার ওপর ভূমি রাজস্ব ও জিযিয়া আরোপ করতে হবে। (কিতাবুল খারাজ—আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ২৩ থেকে ২৭ ও ৩৫; আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস)

এ সিদ্ধান্ত অনুসারে বিজিত ভূমির প্রকৃত যে মর্যাদা স্থিরিকৃত হলো তাহচ্ছে, সমষ্টিগতভাবে গোটা মুসলিম মিল্লাত হবে এর মালিক, আগে থেকেই যারা এসব ভূমিতে কাজ করে আসছে মুসলিম মিল্লাত তার নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে চাষাবাদকারী হিসেবে বহাল রেখেছে, এসব ভূমি বাবদ তারা ইসলামী রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট একটা হারে খাজনা বা ভূমি রাজস্ব দিতে থাকবে, চাষাবাদের এই অধিকার বংশানুক্রমিকভাবে তাদের উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তরিত হতে থাকবে এবং এ অধিকার তারা বিক্রি করতেও পারবে। কিন্তু তারা ভূমির প্রকৃত মালিক হবে না, এর প্রকৃত মালিক হবে মুসলিম মিল্লাত। ইমাম আবু উবায়েদ তাঁর আল আমওয়াল গ্রন্থে আইনগত এই মর্যাদা ও অবস্থানের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

اَقَـرَّ اَهْـلَ الـسَّـوَادِ فِىْ اَرْضِيْهِمْ وَضَرَبَ عَلَى رُؤُسِهِمُ الْجِزْيَةَ وَعَلَى اَرْضِيْهِمُ الطَّسَقَ (ص - ٥٧)

"হযরত উমর (রা) ইরাকবাসীদের তাদের কৃষি ভূমিতে বহাল রাখলেন, তাদের সবার ওপর মাথা পিছু জিযিয়া আরোপ করলেন এবং ভূমির ওপর ট্যাক্স ধার্য করলেন।"

وَاِذَا اَقَرَّ الْاِمَامُ اَهْلَ الْعَنْوَةِ فِىْ اَرْضِهِمْ تَوَارَثُوْهَا وَتَبَايَعُوْهَا (ص- ٨٤)

"ইমাম (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান) বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের যদি তাদের কৃষি ভূমিতে বহাল রাখেন তাহলে তারা ঐ সব ভূমি উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তর করতে এবং বিক্রি করতে পারবে।"

উমর ইবনে আবদুল আযীযের আমলে শা'বীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, ইরাকের অধিবাসীদের সাথে কোন চুক্তি আছে কি? তিনি জবাব দিয়েছিলেন যে, চুক্তি নেই। তবে তাদের নিকট থেকে যখন ভূমি রাজস্ব গ্রহণ করা হয়েছে তখন তা চুক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে (আবু উবায়েদ, পৃষ্ঠা ৪৯; আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ২৮)।

হযরত উমরের (রা) খিলাফতকালে উৎবা ইবনে ফারকাদ ফোরাত নদীর তীরে একখণ্ড জমি কিনলেন। হযরত উমর (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এ জমি কার নিকট থেকে কিনেছো? তিনি বললেন ঃ জমির মালিকের নিকট থেকে। হযরত উমর (রা) বললেন ঃ তার মালিক তো এসব লোক (অর্থাৎ মুহাজির ও আনসার)।

رَأَى عُمَرَ اَنَّ اَصْلَ الْاَرْضِ لِلْمُسْلِمِيْنَ হযরত উমরের (রা) অভিমত ছিল এই যে, ঐ সব ভূমির প্রকৃত মালিক মুসলমানগণ— (আবু উবায়েদ, পৃষ্ঠা ৭৪)

এ সিদ্ধান্ত অনুসারে বিজিত দেশসমূহের যেসব সম্পদ মুসলমানদের সমষ্টিগত মালিকানা বলে ঘোষণা করা হয়েছিলো তা নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) কোন সন্ধিচুক্তির ফলে যেসব ভূমি ও অঞ্চল ইসলামী রাষ্ট্রের হস্তগত হবে।

(২) যুদ্ধ ছাড়াই কোন এলাকার লোক মুসলমানদের নিকট থেকে নিরাপত্তা লাভের উদ্দেশ্যে যে মুক্তিপণ (فديه), ভূমি রাজস্ব (خراج) এবং জিযিয়া প্রদান করতে সম্মত হবে।

(৩) যেসব জমি ও সম্পদের মালিক তা ফেলে পালিয়ে গিয়েছে।

(৪) যেসব সম্পদের মালিক মারা গেছে বা যেসব সম্পদের কোন মালিক নেই।

(৫) যেসব ভূমি পূর্বে কারো অধিকারে ছিল না।

(৬) যেসব ভূমি আগে থেকে মানুষের অধিকারে ছিল। কিন্তু তার সাবেক মালিকদেরকেই বহাল রেখে তাদের ওপর জিযিয়া ও ভূমির ওপর খারাজ বা ভূমিকর ধার্য করা হয়েছে।

(৭) পূর্ববর্তী শাসক পরিবারসমূহের জায়গীরসমূহ।

(৮) পূর্ববর্তী সরকারসমূহের মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তি। —বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাদায়েউস সানায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৬-১১৮; কিতাবুল খারাজ-ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম, পৃষ্ঠা ২২-৬৪, মুগনিউল মুহতাজ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৩; হাশিয়াতুদ দুসূকী আলাশ শারহিল কাবীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯০; গায়াতুল মুনতাহা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৭-৪৭১)।

এসব জিনিস যেহেতু সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে 'ফাই' বলে ঘোষিত হয়েছিলো, তাই একে 'ফাই' বলে সিদ্ধান্ত দেয়ার ব্যাপারে ও ইসলামের ফিকাহবিদদের মধ্যে নীতিগত ঐক্য বিদ্যমান। তবে কয়েকটি বিষয়ে মতানৈক্য আছে। আমরা ঐগুলো সংক্ষিপ্তাকারে নীচে বর্ণনা করলাম।

হানাফীগণ বলেন ঃ বিজিত দেশ ও অঞ্চলসমূহের ভূমির ব্যাপারে ইসলামী সরকারের (ফিকাহবিদদের পরিভাষায় ইমাম) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার আছে। তিনি ইচ্ছা করলে এর মধ্য থেকে এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে রেখে অবশিষ্ট সবটা বিজয়ী সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেবেন। কিংবা পূর্ববর্তী মালিকদের অধিকারে রেখে দেবেন, আর তার মালিকদের ওপরে জিযিয়া এবং ভূমির ওপরে খারাজ বা ভূমিকর ধার্য করবেন। এ অবস্থায় এসব সম্পদ মুসলমানদের জন্য স্থায়ী ওয়াকফ সম্পদ বলে গণ্য হবে। (বাদায়েউস সানায়ে, আহকামুল কুরআন জাস্সাস, শারহুল এনায়া আলাল হিদায়া, ফাতহুল কাদীর) ইমাম সুফিয়ান সাওরী থেকে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারাক এ মতটিই উদ্ধৃত করেছেন। (ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম; কিতাবুল আমওয়াল—আবু উবায়েদ)

মালেকীগণ বলেন ঃ মুসলমানদের শুধু দখল করে নেয়ার কারণেই এসব ভূমি আপনা-আপনি মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ হয়ে যায়। তা ওয়াকফ করার জন্য ইমামের

সিদ্ধান্ত বা মুজাহিদদের রাজি করার প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া মালেকীগণের সর্বজন পরিজ্ঞাত মত হলো, বিজিত এলাকার শুধু ভূমিই নয়, বরং ঘরবাড়ী, দালানকোঠাও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ। তবে ইসলামী রাষ্ট্র বা সরকার ঐগুলোর জন্য ভাড়া ধার্য করবে না । (হাশিয়াতুদ দুসূকী)

হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণ এতটুকু বিষয়ে হানাফীদের সাথে একমত যে, ভূমি বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করা কিংবা মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেয়া ইমামের ইখতিয়ারাধীন। তারা মালেকীদের সংগে এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, বিজিত অঞ্চলসমূহের ঘরবাড়ী ওয়াকফ হিসেবে গণ্য হলেও তার ওপর ভাড়া ধার্য করা হবে না। (গায়াতুল মুনতাহা—হাম্বলী মযহাবের যেসব মত ও সিদ্ধান্তের সমর্থনে ফতোয়া দেয়া হয়েছে এ গ্রন্থখানি তারই সমষ্টি। দশম শতাব্দী থেকে এ মযহাবের সমস্ত ফতোয়া এ গ্রন্থ অনুসারেই দেয়া হয়ে থাকে।)।

শাফেয়ী মযহাবের মত হলো ঃ বিজিত অঞ্চলের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি গনীমাত এবং সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি (ভূমি ও ঘরবাড়ী) 'ফাই' হিসেবে গণ্য করা হবে। (মুগনিউল মুহ্তাজ)

কোন কোন ফিকাহবিদ বলেন ঃ ইমাম যদি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত দেশের বা অঞ্চলের ভূমি মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করতে চান তাহলে তাঁকে অবশ্যই বিজয়ী সৈনিকদের সম্মতি নিতে হবে। এর সপক্ষে তারা এ দলীল পেশ করেন, ইরাক জয়ের পূর্বে হযরত উমর (রা) জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আলবাহালীকে এ মর্মে ওয়াদা করেছিলেন যে, বিজিত অঞ্চলের এক-চতুর্থাংশ তাঁকে দেয়া হবে। কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনীর এক-চতুর্থাংশ লোক ছিল জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আলবাহালীর গোত্রের লোক। সুতরাং ২-৩ বছর পর্যন্ত এ অংশ তাঁর কাছেই ছিল। পরে হযরত উমর (রা) তাঁকে বললেন ঃ

لَوْلَا اَنِّىْ قَاسِمٌ مَسْئُوْلٌ لَكُنْتُمْ عَلٰى مَا جُعِلَ لَكُمْ وَاَرَى النَّاسَ قَدْ كَثُرُوْا فَاَرٰى اَنْ تَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ -

"বন্টনের ব্যাপারে আমি যদি দায়িত্বশীল না হতাম এবং আমাকে জবাবদিহি করতে না হতো তাহলে তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তোমাদের কাছেই থাকতে দেয়া হতো। কিন্তু এখন আমি দেখছি লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আমার মত হলো তোমরা সাধারণ মানুষের স্বার্থে তা ফিরিয়ে দাও।"

হযরত জারীর (রা) তাঁর এ কথা মেনে নিলেন। এ কারণে হযরত উমর (রা) তাঁকে পুরস্কার হিসেবে ৮০ দিনার প্রদান করলেন। (কিতাবুল খারাজ—আবু ইউসুফ; কিতাবুল আমওয়াল—আবু উবায়েদ)। এ ঘটনা দ্বারা তারা প্রমাণ দেন যে, হযরত উমর বিজয়ী সৈন্যদের সম্মত করার পর বিজিত অঞ্চলসমূহ মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ফিকাহবিদদের অধিকাংশই এ যুক্তি মেনে নেননি। কারণ সকল বিজিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে সমস্ত বিজয়ী সৈনিকদের নিকট থেকে এ ধরনের কোন সম্মতি নেয়া হয়নি। আর কেবল হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহর সাথে এ আচরণ করা হয়েছিল

শুধু এ কারণে যে, বিজয়ের পূর্বে বিজিত ভূমি সম্পর্কে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হওয়ার পূর্বে হযরত উমর (রা) তাঁর সাথে এ মর্মে একটি অঙ্গীকার করে ফেলেছিলেন। সেই অঙ্গীকার থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যই তাঁকে তাঁর সম্মতি নিতে হয়েছিল। তাই এটাকে কোন ব্যাপকভিত্তিক আইন হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

ফিকাহবিদদের আরেকটি গোষ্ঠী বলেন ঃ ওয়াকফ ঘোষণা করার পরও বিজিত এ সব ভূমি বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে যে কোন সময় বন্টন করে দেয়ার ইখতিয়ার সরকারের থেকে যায়। এর সপক্ষে তারা যে রেওয়ায়াত থেকে দলীল পেশ করেন তাহলো, একবার হযরত আলী (রা) লোকদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন ঃ

لَوْلَا اَنْ يَّضْرِبَ بَعْضُكُمْ وُجُوهَ بَعْضٍ لَقَسَّمْتُ السَّوَادَ بَيْنَكُمْ

"যদি আমি এ আশংকা না করতাম যে, তোমরা পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হবে তাহলে এসব প্রত্যন্ত অঞ্চল আমি তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম।" (কিতাবুল খারাজ—আবু ইউসুফ; কিতাবুল আমওয়াল— আবু উবায়েদ)।

কিন্তু অধিকাংশ ফিকাহবিদ এমতটিও গ্রহণ করেননি। বরং তাদের সর্বসম্মত মত হলো, জিযিয়া ও খারাজ ধার্য করে বিজিত এলাকার ভূমি একবার যদি উক্ত এলাকার অধিবাসীদের অধিকারেই রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহলে এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা যায় না। এরপর থাকে হযরত আলীর (রা) সাথে সম্পর্কিত কথাটি। এ সম্পর্কে আবু বকর জাস্সাস আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, ঐ রেওয়ায়াত সঠিক নয়।

২১. 'ফাই'–এর সম্পদ উপস্থিত ও বর্তমান কালের বিদ্যমান মুসলমানদেরই কেবল নয়, বরং অনাগত কালের মুসলমান এবং তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও অংশ আছে। এ আয়াতের মূল বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য এ বিষয়টি তুলের ধরা হলেও একই সাথে এর মধ্যে মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শিক্ষাও দেয়া হয়েছে। তাহলো, কোন মুসলমানের মনে অপর কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে ঘৃণা–বিদ্বেষ ও শত্রুতা না থাকা উচিত। আর মুসলমানদের জন্য সঠিক জীবনাচার হলো, তারা তাদের পূর্ববর্তী মুসলমান ভাইদের লা'নত বা অভিশাপ দেবে না কিংবা তাদের সাথে সম্পর্কহীনতার কথা বলবে না। বরং তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে থাকবে। যে বন্ধন মুসলমানদের পরস্পর সম্পর্কিত করেছে তাহলো ঈমানের বন্ধন। কোন ব্যক্তির অন্তরে অন্য সব জিনিসের চেয়ে ঈমানের গুরুত্ব যদি অধিক হয় তাহলে যারা ঈমানের বন্ধনের ভিত্তিতে তার ভাই, সে অনিবার্যভাবেই তাদের কল্যাণকামী হবে। তাদের জন্য অকল্যাণ, হিংসা–বিদ্বেষ এবং ঘৃণা কেবল তখনই তার অন্তরে স্থান পেতে পারে যখন ঈমানের মূল্য ও মর্যাদা তার দৃষ্টিতে কমে যাবে এবং অন্য কোন জিনিসকে তার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে শুরু করবে। তাই ঈমানের সরাসরি দাবী, একজন মু'মিনের অন্তরে অন্য কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও হিংসা–বিদ্বেষ থাকবে না। নাসায়ী কর্তৃক হযরত আনাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে এ ক্ষেত্রে উত্তম শিক্ষা লাভ করা যায়। তিনি বর্ণনা করেছেন, এক সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে একাধারে তিন দিন একটি ঘটনা ঘটতে থাকলো। রসূলুল্লাহ (সা) বলতেন ঃ এখন তোমাদের সামনে এমন এক ব্যক্তির আগমন

হবে যে জান্নাতের অধিবাসী। আর প্রত্যেকবারই আনসারদের কোন একজন হতেন সেই আগন্তুক। এতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসের মধ্যে কৌতূহল দেখা দিল যে, তিনি এমন কি কাজ করেন যার ভিত্তিতে নবী (সা) তাঁর সম্পর্কে বারবার এই সুসংবাদ দান করলেন। সুতরাং তার ইবাদাতের অবস্থা দেখার জন্য একটা উপলক্ষ সৃষ্টি করে তিনি পরপর তিন দিন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে রাত কাটাতে থাকলেন। কিন্তু রাতের বেলা তিনি কোন প্রকার অস্বাভাবিক কাজ–কর্ম দেখতে পেলেন না। বাধ্য হয়ে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ভাই, আপনি এমন কি কাজ করেন, যে কারণে আমরা নবীর (সা) মুখে আপনার সম্পর্কে এই বিরাট সুসংবাদ শুনেছি। তিনি বললেন ঃ আমার ইবাদাত–বন্দেগীর অবস্থা তো আপনি দেখেছেন। তবে একটি বিষয় হয়তো এর কারণ হতে পারে। আর তা হলো,

لَا اَجِدُ فِىْ نَفْسِىْ غِلًّا لِاَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا اَحْسُدُهُ عَلٰى خَيْرٍ اَعْطَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِيَّاهُ –

"আমি আমার মনের মধ্যে কোন মুসলমানের জন্য বিদ্বেষ পোষণ করি না এবং মহান আল্লাহ তাকে যে কল্যাণ দান করেছেন সে জন্য তাকে হিংসাও করি না।"

তবে এর মানে এ নয় যে, কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানের কথা ও কাজে যদি কোন ত্রুটি দেখতে পান তাহলে তাকে তিনি ত্রুটি বলবেন না। কোন ঈমানদার ভুল করলেও সেটাকে ভুল না বলে শুদ্ধ বলতে হবে কিংবা তার ভ্রান্ত কথাকে ভ্রান্ত বলা যাবে না, ঈমানের দাবী কখনো তা নয়। কিন্তু কোন জিনিসকে প্রমাণের ভিত্তিতে ভুল বলা এবং ভদ্রতা রক্ষা করে তা প্রকাশ করা এক কথা আর শত্রুতা ও হিংসা–বিদ্বেষ পোষণ করা, নিন্দাবাদ ও কুৎসা রটনা করা এবং গালমন্দ করা আরেক কথা। সমসাময়িক জীবিত লোকদের বেলায়ও এরূপ আচরণ করা হলে তা একটি বড় অন্যায়। কিন্তু পূর্বের মৃত লোকদের সাথে এরূপ আচরণ করলে তা আরো বড় অন্যায়। কারণ, এরূপ মন ও মানসিকতা এমনই নোংরা যে, তা মৃতদেরও ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়। এর চেয়েও বড় অন্যায় হলো, সেই সব মহান ব্যক্তি সম্পর্কে কটূক্তি করা যারা অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সময়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বন্ধুত্ব ও সাহচর্যের হক আদায় করেছিলেন এবং নিজেদের জীবন বিপন্ন করে পৃথিবীতে ইসলামের আলোর বিস্তার ঘটিয়েছিলেন যার বদৌলতে আজ আমরা ঈমানের নিয়ামত লাভ করেছি। তাদের মাঝে যেসব মতানৈক্য হয়েছে সে ক্ষেত্রে কেউ যদি এক পক্ষকে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করে এবং অপর পক্ষের ভূমিকা তার মতে সঠিক না হয় তাহলে সে এরূপ মত পোষণ করতে পারে এবং যুক্তির সীমার মধ্যে থেকে তা প্রকাশ করতে বা বলতেও পারে। কিন্তু এক পক্ষের সমর্থনে এতটা বাড়াবাড়ি করা যে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও হিংসা–বিদ্বেষে মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং কথা ও লেখনীর মাধ্যমে গালি দিতে ও নিন্দাবাদ ছড়াতে থাকার এটা এমন একটা আচরণ যা কোন আল্লাহভীরু মানুষের দ্বারা হতে পারে না। কুরআনের স্পষ্ট শিক্ষার পরিপন্থী এ আচরণ যারা করে তারা তাদের এ আচরণের সমর্থনে যুক্তি পেশ করে যে, কুরআন মু'মিনদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করতে নিষেধ করে। কিন্তু আমরা যাদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করি তারা মু'মিন

নয়, বরং মুনাফিক। কিন্তু যে গোনাহর সপক্ষে সাফাই ও ওযর হিসেবে এ অপবাদ পেশ করা হয়ে থাকে তা ঐ গোনাহর চেয়েও জঘন্য। কুরআন মজীদের এ আয়াতগুলোই তাদের এ অপবাদ খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যানের জন্য যথেষ্ট। কারণ এ আয়াতগুলোর বর্ণনাধারার মধ্যেই আল্লাহ্‌ তা'আলা পরবর্তীকালের মুসলমানদেরকে তাদের পূর্ববর্তী ঈমানদারদের সাথে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ না রাখতে এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে শিক্ষা দিয়েছেন। এসব আয়াতে পর পর তিন শ্রেণীর লোককে 'ফাই'-এর সম্পদ লাভের অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম মুহাজির, দ্বিতীয় আনসার এবং তৃতীয় তাদের পরবর্তীকালের মুসলমান। তাদের পরবর্তী কালের মুসলমানদের বলা হয়েছে, তোমাদের পূর্বে যেসব লোক ঈমান আনার ব্যাপারে অগ্রগামী তোমরা তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো। একথা সবারই জানা যে, অগ্র-পশ্চাত বিবেচনায় ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে অগ্রগামী বলতে এখানে মুহাজির ও আনসার ছাড়া আর কেউ-ই হতে পারে না। তাছাড়া মুনাফিক কারা সে সম্পর্কে এই সূরা হাশরেরই ১১ থেকে ১৭ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে। এভাবে এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুনাফিক তারাই যারা বনী নাযীর যুদ্ধের সময় ইহুদীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে উৎসাহিত করেছিলো। আর মু'মিন তারা যারা এ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিল। যে মুসলমানের মনে এক বিন্দু আল্লাহভীতি আছে এরপরও কি সে ঐ সব ব্যক্তির ঈমানকে অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখাতে পারে, আল্লাহ নিজে যাদের ঈমানের সাক্ষ্য দিয়েছেন?

এ আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমাদ মত প্রকাশ করেছেন যে, যারা সম্মানিত সাহাবীদের গালমন্দ ও নিন্দাবাদ করে 'ফাই' সম্পদে তাদের কোন অংশ নেই। (আহকামুল কুরআন ইবনুল আরাবী, গায়াতুল মুনতাহা) কিন্তু হানাফী ও শাফেয়ীগণ এ সিদ্ধান্তের সাথে একমত নন। এর কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা তিন শ্রেণীর লোককে ফাই-এর সম্পদ লাভের অধিকারী ঘোষণা করেছেন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর একটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এসব গুণের কোনটিকেই পূর্বশর্ত হিসেবে পেশ করেননি যে, সেই শ্রেণীর মধ্যে ঐ বিশেষ শর্তটি বর্তমান থাকলেই কেবল তাদেরকে অংশ দেয়া যাবে, অন্যথায় দেয়া যাবে না। মুহাজিরদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। তার অর্থ এ নয় যে, যে মুহাজিরের মধ্যে এই গুণটি নেই সে 'ফাই'-এর অংশ লাভের অধিকারী নয়। আনসারদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ "তারা মুহাজিরদের ভালবাসে। মুহাজিরদের যাই দেয়া হোক না কেন অভাবী হয়েও তারা সে জন্য মনের মধ্যে কোন চাহিদা অনুভব করে না।" এরও অর্থ এটা নয় যে, যেসব আনসার মুহাজিরদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে না এবং মুহাজিরদের যা কিছু দেয়া হয় তারা তা পেতে আগ্রহী 'ফাই'-এর সম্পদে এমন মুহাজিরদের কোন অংশ নেই। অতএব তৃতীয় শ্রেণীর এই গুণটি অর্থাৎ তাদের পূর্বে ঈমান গ্রহণকারীদের মাগফিরাতের জন্য তারা দোয়া করে, আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যে, তাদের হৃদয়-মনে যেন কোন ঈমানদারদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ না থাকে এটাও 'ফাই'-এর হকদার হওয়ার কোন পূর্বশর্ত নয়। বরং এটা একটা ভাল গুণের বর্ণনা এবং অন্য সব ঈমানদার ও পূর্ববর্তী ঈমানদারদের সাথে তাদের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে একটি শিক্ষাদান।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٢﴾

২ রুকূ'

তোমরা[২২] কি সেই সব লোকদের দেখনি যারা মুনাফিকীর আচরণ গ্রহণ করেছে? তারা তাদের কাফের আহলে কিতাব ভাইদের বলে ঃ যদি তোমাদের বহিষ্কার করা হয় তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাবো। তোমাদের ব্যাপারে কারো কথাই আমরা শুনবো না। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাহলে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, তারা পাকা মিথ্যাবাদী। যদি তাদেরকে বহিষ্কার করা হয় তাহলে এরা তাদের সাথে কখনো বেরিয়ে যাবে না। আর যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাহলে তারা তাদেরকে সাহায্যও করবে না। আর যদি সাহায্য করেও তাহলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। অতপর কোনখান থেকে কোন সাহায্য তারা পাবে না।

২২. পুরো এই রুকূ'র আয়াতসমূহের বাচনভঙ্গি থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় বনু নাযীরকে মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য দশদিন সময় দিয়ে নোটিশ দিয়েছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অবরোধ শুরু হতে এখনো কয়েকদিন দেরী ছিল সেই সময় এ রুকূ'র আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিলো। আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু নাযীরকে এই নোটিশ দিলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং মদীনার অন্যান্য মুনাফিক নেতারা তাদের বলে পাঠালো যে, আমরা দুই হাজার লোক নিয়ে তোমাদের সাহায্য করার জন্য আসবো। আর বনী কুরায়যা এবং বনী গাতফানও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। অতএব তোমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও এবং কোন অবস্থায় তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করো না। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করলে আমরাও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। আর তোমরা এখান থেকে বহিষ্কৃত হলে আমরাও চলে যাব। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো নাযিল করেছেন। তাই নাযিল হওয়ার পরম্পরার দিক দিয়ে এ রুকূ'টা প্রথমে নাযিল হয়েছে। আর বনী নাযীরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করার পর প্রথম রুকূ'র আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। তবে কুরআন মজীদে সন্নিবেশ করার ক্ষেত্রে প্রথম রুকূ'

لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٣﴾ لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ۚ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٥﴾

তাদের মনে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশী।[২৩] কারণ, তারা এমন লোক যাদের কোন বিবেক–বুদ্ধি নেই।[২৪] এরা একত্রিত হয়ে (খোলা ময়দানে) কখনো তোমাদের মোকাবিলা করবে না। লড়াই করলেও দুর্গাভ্যন্তরে অবস্থিত জনপদে বা প্রাচীরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে করবে। তাদের আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক কোন্দল অত্যন্ত কঠিন। তুমি তাদের ঐক্যবদ্ধ মনে কর। কিন্তু তাদের মন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন।[২৫] তাদের এ অবস্থার কারণ হলো তারা জ্ঞান ও বুদ্ধিহীন। এরা তাদের কিছুকাল পূর্বের সেই সব লোকের মত যারা তাদের কৃতকর্মের পরিণাম ভোগ করেছে।[২৬] তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

আগে এবং দ্বিতীয় রুকূ' পরে রাখার কারণ হলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথম রুকূ'তে বর্ণিত হয়েছে।

২৩. অর্থাৎ তারা যে তোমাদের মোকাবেলায় প্রকাশ্যে ময়দানে নামছে না তার কারণ এ নয় যে, তারা মুসলমান, তাদের মনে আল্লাহর ভয় আছে এবং এরূপ কোন আশংকাও তাদের মনে আছে যে, ঈমানের দাবী করা সত্ত্বেও তারা যদি ঈমানদারদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করে তাহলে আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। বরং তোমাদের প্রকাশ্য মোকাবেলা করা থেকে যে জিনিস তাদের বিরত রাখে তা হলো, ইসলাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য তোমাদের ভালবাসা, প্রাণপণ সংকল্প এবং আত্মত্যাগের স্পৃহা আর তোমাদের পারস্পরিক দৃঢ় ঐক্য দেখে তারা সাহস হারিয়ে ফেলে। তারা ভাল করেই জানে যে, তোমরা নগণ্য সংখ্যক হলেও শাহাদাতের যে অদম্য আকাংখা তোমাদের প্রতিটি ব্যক্তিকে জান কবুল মুজাহিদ বানিয়ে রেখেছে এবং যে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার কারণে তোমরা একটি ইস্পাত কঠিন দল ও সংগঠনে রূপান্তরিত হয়েছো তার সাথে সংঘর্ষ বাধলে ইহুদীদের সাথে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। এখানে এ বিষয়টি মনে রাখা দরকার যে, কারো অন্তরে আল্লাহর ভয়ের চেয়ে অন্য কারো ভয় অধিক থাকলে তা মূলত আল্লাহর ভয় না থাকারই নামান্তর। একথা সবারই জানা, যে ব্যক্তি দু'টি বিপদের একটিকে লঘু এবং অপরটিকে গুরুতর মনে করে সে

প্রথমোক্ত বিপদটির পরোয়াই করে না। দ্বিতীয় বিপদটি থেকে রক্ষা পাওয়াই তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়।

২৪. ছোট এই আয়াতাংশে একটি বড় সত্য তুলে ধরা হয়েছে। বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি জানে, মানুষের শক্তি নয়, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর শক্তিই ভয় করার মত। এ কারণে যেসব কাজে আল্লাহর সামনে তার জবাবদিহির ভয় থাকবে এ ধরনের সকল কাজ থেকে সে নিজেকে রক্ষা করবে। এ ক্ষেত্রে জবাব চাওয়ার মত কোন মানবীয় শক্তি থাক বা না থাক তা দেখার প্রয়োজন সে মনে করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য তার ওপর ন্যস্ত করেছেন তা সমাধা করার জন্য সে তৎপর হয়ে উঠবে। গোটা দুনিয়ার সমস্ত শক্তি এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালেও সে তার পরোয়া করবে না। কিন্তু একজন বুদ্ধি-বিবেকহীন মানুষের কাছে যেহেতু আল্লাহর শক্তি অনুভূত হয় না কিন্তু মানুষের শক্তিসমূহ অনুভূত হয় তাই সমস্ত ব্যাপারে সে তার কর্মনীতি নির্ধারণ করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষের শক্তির প্রতি লক্ষ রেখে। কোন কিছু থেকে দূরে থাকলে এ জন্য থাকে না যে, সে জন্য আল্লাহর কাছে পাকড়াও হতে হবে। বরং এ জন্য দূরে থাকে যে, সামনেই কোন মানবীয় শক্তি তার খবর নেয়ার জন্য প্রস্তুত আছে। আর কোন কাজ যদি সে করে তবে তাও এ জন্য করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা সে জন্য সে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারের প্রত্যাশী। বরং এ জন্য করে যে, কোন মানবীয় শক্তি তা করতে নির্দেশ দিচ্ছে কিংবা পছন্দ করছে এবং সে-ই এ জন্য পুরস্কৃত করবে। বুঝা ও না বুঝার এই পার্থক্যই প্রকৃতপক্ষে একজন ঈমানদার ও ঈমানদারের জীবন ও কর্মকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেয়।

২৫. এখানে মুনাফিকদের দ্বিতীয় দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে। তাদের প্রথম দুর্বলতা হলো, তারা ছিল ভীরু—আল্লাহকে ভয় করার পরিবর্তে মানুষকে ভয় করতো। ঈমানদারদের মত তাদের সামনে এমন কোন উন্নত লক্ষ ও আদর্শ ছিল না যা অর্জনের জন্য তাদের মধ্যে প্রাণপণ সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হতো। তাদের দ্বিতীয় দুর্বলতা হলো মুনাফিকীর আচরণ ছাড়া তাদের মধ্যে আর কোন বিষয়ে মিল ছিল না যা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি মজবুত ও সুসংবদ্ধ দলে পরিণত করতে পারতো। যে বিষয়টি তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল তাহলো, নিজেদের শহরে বহিরাগত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্ব ও শাসন চলতে দেখে তাদের কলিজা দগ্ধ হচ্ছিলো আর স্বদেশবাসী আনসার কর্তৃক মুহাজিরদের সসম্মানে গ্রহণ করতে দেখে তাদের মন দুখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিলো। এই হিংসার কারণে তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং আশেপাশের ইসলাম বৈরীদের সাথে ষড়যন্ত্র ও যোগসাজশ করে এই বহিরাগত প্রভাব-প্রতিপত্তিকে খতম করে দিতে চাইতো। তাদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এই নেতিবাচক উদ্দেশ্য ছাড়া কোন গঠনমূলক জিনিস ছিল না। তাদের, প্রত্যেক নেতার আলাদা আলাদা দল ও উপদল ছিল। প্রত্যেকেই নিজের মাতবরী ফলাতে চাইতো। তারা কেউ কারো অকৃত্রিম বন্ধু ছিল না। প্রত্যেকের মনে অন্যদের জন্য এতটা হিংসা-বিদ্বেষ ছিল যে, নিজেদের সাধারণ শত্রুর মোকাবেলায়ও তারা নিজেদের পারস্পরিক শত্রুতা ভুলতে কিংবা একে অপরের মূলোৎপাটন থেকে বিরত থাকতে পারতো না।

আল্লাহ তা'আলা এভাবে বনী নাযীর যুদ্ধের পূর্বেই মুনাফিকদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যালোচনা করে মুসলমানদের জানিয়ে দিলেন যে, তাদের দিক থেকে বাস্তব কোন

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٧﴾

এদের উদাহরণ হলো শয়তান। সে প্রথমে মানুষকে বলে কুফরী কর। যখন মানুষ কুফরী করে বসে তখন সে বলে, আমি তোমার দায়িত্ব থেকে মুক্ত। আমি তো আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে ভয় পাই।[২৭] উভয়েরই পরিণাম হবে এই যে, তারা চিরদিনের জন্য জাহান্নামী হবে। জালেমদের প্রতিফল এটাই।

বিপদের আশংকা নেই। তাই বারবার এ খবর শুনে তোমাদের ঘাবড়ে যাওয়ার আদৌ কোন কারণ নেই যে, তোমরা বনী নাযীরকে অবরোধ করার জন্য যাত্রা করলেই এই মুনাফিক নেতা দুই হাজার লোকের একটি বাহিনী নিয়ে তোমাদের ওপর আক্রমণ করে বসবে এবং একই সংগে বনী কুরাইযা ও বনী গাতফান গোত্র দু'টিকেও তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণে উস্কে দেবে। এসবই লম্ফঝম্ফ মাত্র। চরম পরীক্ষা শুরু হতেই এর অন্তসারশূন্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

২৬. এখানে কুরাইশ গোত্রের কাফের এবং বনী কায়নুকার ইহুদীদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যারা নিজেদের সংখ্যাধিক্য এবং সাজ–সরঞ্জামের প্রাচুর্য সত্ত্বেও এ সব দুর্বলতার কারণে মুসলমানদের সাজ–সরঞ্জামহীন মুষ্টিমেয় লোকের একটি দলের কাছে পরাজিত হয়েছিল।

২৭. অর্থাৎ এসব মুনাফিক বনী নাযীরের সাথে সেই একই আচরণ করছে, যে আচরণ শয়তান মানুষের সাথে করে থাকে। এখন এসব মুনাফিক তাদের বলছে, তোমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও প্রয়োজনে আমরাও তোমাদের সাথে থাকবো। কিন্তু তারা যখন সত্যি সত্যি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে তখন এরা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেদের সমস্ত প্রতিশ্রুতি থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের পরিণতি কি হলো তা দেখার জন্য ফিরেও তাকাবে না। শয়তান প্রত্যেক কাফেরের সাথে এ ধরনের আচরণই করে থাকে। বদর যুদ্ধে কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের সাথেও সে এরূপ আচরণ করেছিল। সূরা আনফালের ৪৮ আয়াতে এর উল্লেখ আছে। প্রথমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সে তাদেরকে হিম্মত ও সাহস যুগিয়ে বদর প্রান্তরে এনে হাজির করেছে এবং বলেছেঃ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ (আজ কেউই তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারবে না। আর আমি তো তোমাদের পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগী হিসেবে আছিই)। কিন্তু যখন দুটো সেনাবাহিনী মুখোমুখি হয়েছে তখন সে একথা বলতে বলতে পালিয়েছে ঃ

اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ ، اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾

৩ রুকূ'

হে[২৮] ঈমানদাররা, আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেকেই যেন লক্ষ রাখে, সে আগামীকালের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।[২৯] আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তোমাদের সেই সব কাজ সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করে থাক। তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের নিজেদেরকেই ভুলিয়ে দিয়েছেন।[৩০] তারাই ফাসেক। যারা দোযখে যাবে এবং যারা জান্নাতে যাবে তারা পরস্পর সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতে যাবে তারাই সফলকাম।

(আমি তোমাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। আমি যা দেখতে পাচ্ছি তোমরা তা দেখতে পাও না। আমি তো আল্লাহকে ভয় পাই।)

২৮. কুরআন মজীদের নিয়ম হলো, যখনই মুনাফিক মুসলমানদের মুনাফিকসুলভ আচরণের সমালোচনা করা হয় তখনই তাদেরকে নসীহতও করা হয়। যাতে তাদের যার যার মধ্যে এখনো কিছুটা বিবেক অবশিষ্ট আছে সে যেন তার এই আচরণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহকে ভয় করে ধ্বংসের সেই গহবর থেকে উঠে আসার চিন্তা করে যার মধ্যে সে প্রকৃতির দাসত্বের কারণে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এ রুকূ' পুরোটাই এ ধরনের নসীহতে পরিপূর্ণ।

২৯. আগামীকাল অর্থ আখেরাত। দুনিয়ার এই গোটা জীবনকাল হলো 'আজ' এবং কিয়ামতের দিন হলো আগামীকাল যার আগমন ঘটবে আজকের এই দিনটির পরে। এ ধরনের বাচনভঙ্গির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত বিজ্ঞোচিতভাবে মানুষকে বুঝিয়েছেন যে, ক্ষণস্থায়ী আনন্দ উপভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি তার সবকিছু ব্যয় করে ফেলে এবং কাল তার কাছে ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য আর মাথা গুঁজবার ঠাই থাকবে কিনা সে কথা চিন্তা করে না সেই ব্যক্তি এ পৃথিবীতে বড় নির্বোধ। ঠিক তেমনি ঐ ব্যক্তিও নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করছে যে তার পার্থিব জীবন নির্মাণের চিন্তায় এতই বিভোর যে আখেরাত সম্পর্কে একেবারেই গাফেল হয়ে গিয়েছে। অথচ আজকের দিনটির পরে কালকের দিনটি যেমন অবশ্যই আসবে তেমনি আখেরাতও আসবে। আর দুনিয়ার বর্তমান জীবনে যদি সে সেখানকার জন্য অগ্রিম কোন ব্যবস্থা না করে তাহলে সেখানে কিছুই

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

আমি যদি এই কুরআনকে কোন পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি দেখতে পেতে তা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ছে এবং ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।[৩১] আমি মানুষের সামনে এসব উদাহরণ এ জন্য পেশ করি যাতে তারা (নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে) ভেবে দেখে।

আল্লাহই সেই[৩২] মহান সত্তা যিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই।[৩৩] অদৃশ্য ও প্রকাশ্য সবকিছুই তিনি জানেন।[৩৪] তিনিই রহমান ও রহীম।[৩৫]

পাবে না। এর সাথে দ্বিতীয় জ্ঞানগর্ভ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, এ আয়াতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের হিসাব পরীক্ষক বানানো হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির মধ্যে ভাল এবং মন্দের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আদৌ সে অনুভব করতে পারে না যে, সে যা কিছু করছে তা তার আখেরাতের জীবনকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করছে, না ধ্বংস করছে। তার মধ্যে এই অনুভূতি যখন সজাগ ও সচেতন হয়ে ওঠে তখন তার নিজেকেই হিসেব-নিকেশ করে দেখতে হবে, সে তার সময়, সম্পদ, শ্রম, যোগ্যতা এবং প্রচেষ্টা যে পথে ব্যয় করছে তা তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়টি বিবেচনা করা তার নিজের স্বার্থেই প্রয়োজন। অন্যথায় সে নিজের ভবিষ্যত নিজেই ধ্বংস করবে।

৩০. অর্থাৎ আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার অনিবার্য ফল হলো নিজেকে ভুলে যাওয়া, সে কার বান্দা সে কথা যখন কেউ ভুলে যায়, তখন অনিবার্যরূপে সে দুনিয়ায় তার একটা ভুল অবস্থান ঠিক করে নেয়। এই মৌলিক ভ্রান্তির কারণে তার গোটা জীবনই ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়। অনুরূপভাবে সে যখন একথা ভুলে যায় যে, সে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো বান্দা নয় তখন আর সে শুধু সেই এদের বন্দেগী করে না। এমতাবস্থায় সে প্রকৃতই যার বান্দা তাকে বাদ দিয়ে যাদের সে বান্দা নয় এমন অনেকের বন্দেগী করতে থাকে। এটা আর একটা মারাত্মক ও সর্বাত্মক ভুল যা তার গোটা জীবনকেই ভুলে পরিণত করে। পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান হলো সে বান্দা বা দাস, স্বাধীন বা মুক্ত নয়। সে কেবল এক আল্লাহর বান্দা, তার ছাড়া আর কোরো বান্দা সে নয়। একথাটি যে ব্যক্তি জানে না প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই নিজেকে জানে না। আর যে ব্যক্তি একথাটি জেনেও এক মুহূর্তের জন্যও তা ভুলে যায় সেই মুহূর্তে সে এমন কোন কাজ করে বসতে পারে যা কোন আল্লাহদ্রোহী বা মুশরিক অর্থাৎ আত্মবিস্মৃত মানুষই করতে পারে। সঠিক পথের ওপর মানুষের টিকে থাকা পুরোপুরি নির্ভর করে আল্লাহকে স্মরণ করার ওপর। আল্লাহ

তা'আলা সম্পর্কে গাফেল হওয়া মাত্রই সে নিজের সম্পর্কেও গাফেল হয়ে যায় আর এই গাফিলতিই তাকে ফাসেক বানিয়ে দেয়।

৩১. এই উপমার তাৎপর্য হলো, কুরআন যেভাবে আল্লাহর বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য এবং তাঁর কাছে বান্দার দায়িত্ব ও জবাবদিহির বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে পাহাড়ের মত বিশাল সৃষ্টিও যদি তার উপলব্ধি লাভ করতে পারতো এবং কেমন পরাক্রমশালী ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রভুর সামনে নিজের সব কাজকর্মের জবাবদিহি করতে হবে তা যদি জানতো তাহলে সেও ভয়ে কেঁপে উঠতো। কিন্তু যে মানুষ কুরআনকে বুঝতে পারে এবং কুরআনের সাহায্যে সবকিছুর তাৎপর্য ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে, কিন্তু এরপরও তার মনে কোন ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয় না কিংবা যে কঠিন দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়েছে সে সম্পর্কে তার আল্লাহকে কি জবাব দেবে সে বিষয়ে আদৌ কোন চিন্তা তার মনে জাগে না। বরং কুরআন পড়ার বা শোনার পরও সে এমন নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রীয় থাকে যেন একটি নিষ্প্রাণ ও অনুভূতিহীন পাথর। শোনা, দেখা ও উপলব্ধি করা আদৌ তার কাজ নয়। মানুষের এই চেতনাহীনতা ও নিরুদ্বিগ্নতা বিস্ময়কর বৈকি। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাব, টীকা ১২০)।

৩২. এ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কাছে এই কুরআন পাঠানো হয়েছে, যিনি তোমার ওপর এসব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং যাঁর কাছে অবশেষে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে সেই আল্লাহ কেমন এবং তাঁর গুণাবলী কি? উপরোল্লেখিত বিষয়টি বর্ণনার পর পরই আল্লাহর গুণাবলীর বর্ণনা আপনা থেকেই মানুষের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, তার লেনদেন ও বুঝা পড়া কোন সাধারণ সত্তার সাথে নয়, বরং এমন এক জবরদস্ত সত্তার সাথে যিনি এসব গুণাবলীর অধিকারী। এখানে এ বিষয়টি জেনে নেয়া দরকার যে, যদিও কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর গুণাবলী এমন অনুপম ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যা থেকে আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। কিন্তু দু'টি স্থান বিশেষভাবে এমন যেখানে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক বর্ণনা পাওয়া যায়। এর একটি হলো, সূরা বাকারার আয়াতুল কুরসী (২৫৫ আয়াত) অপরটি হলো সূরা হাশরের এই আয়াতগুলো।

৩৩. অর্থাৎ যিনি ছাড়া আর কারোই ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও অবস্থান এমন নয় যে, তার বন্দেগী ও আরাধনা করা যেতে পারে। যিনি ছাড়া আর কেউ আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিকই নয় যে, সে উপাস্য হওয়ার অধিকার লাভ করতে পারে।

৩৪. অর্থাৎ সৃষ্টির কাছে যা গোপন ও অজানা তিনি তাও জানেন আর যা তাদের কাছে প্রকাশ্য ও জানা তাও তিনি জানেন। এই বিশ্ব-জাহানের কোন বস্তুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। যা অতীত হয়ে গিয়েছে, যা বর্তমানে আছে এবং যা ভবিষ্যতে হবে তার সবকিছুই তিনি সরাসরি জানেন। এসব জানার জন্য তিনি কোন মাধ্যমের মুখাপেক্ষী নন।

৩৫. অর্থাৎ একমাত্র তিনিই এমন এক সত্তা যার রহমত অসীম ও অফুরন্ত। সমগ্র বিশ্ব চরাচরব্যাপী পরিব্যপ্ত এবং বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসই তাঁর বদান্যতা ও অনুগ্রহ লাভ করে থাকে। গোটা বিশ্ব-জাহানে আর একজনও এই সর্বাত্মক ও অফুরন্ত রহমতের অধিকারী নেই। আর যেসব সত্তার মধ্যে দয়ামায়ার এই গুণটি দেখা যায় তা আংশিক ও

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰىؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

আল্লাহ–ই সেই মহান সত্তা যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি বাদশাহ,[৩৬] অতীব পবিত্র,[৩৭] পূর্ণাঙ্গ শান্তি,[৩৮] নিরাপত্তাদানকারী,[৩৯] হিফাযতকারী,[৪০] সবার ওপর বিজয়ী,[৪১] শক্তি বলে নিজের নির্দেশ কার্যকরী করতে সক্ষম।[৪২] এবং সবার চেয়ে বড় হয়েই বিরাজমান থাকতে সক্ষম।[৪৩] আল্লাহ সেই সব শিরক থেকে পবিত্র যা লোকেরা করে থাকে।[৪৪] সেই পরম সত্তা তো আল্লাহ–ই যিনি সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দানকারী এবং সেই অনুপাতে রূপদানকারী।[৪৫] উত্তম নামসমূহ তাঁর–ই।[৪৬] আসমান ও যমীনের সবকিছু তাঁর তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করে চলেছে।[৪৭] তিনি পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।[৪৮]

সীমিত। তাও আবার তার নিজস্ব গুণ বা বৈশিষ্ট নয়। বরং স্রষ্টা কোন উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সামনে রেখে তা তাকে দান করেছেন তিনি কোন সৃষ্টির মধ্যে দয়ামায়ার আবেগ অনুভূতি সৃষ্টি করে থাকলে তা এ জন্য করেছেন যে, তিনি একটি সৃষ্টিকে দিয়ে আরেকটি সৃষ্টির প্রতিপালন ও সুখ–স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করতে চান। এটাও তাঁরই রহমতের প্রমাণ।

৩৬. মূল আয়াতে الملك শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ প্রকৃত বাদশাহ তিনিই। তাছাড়া শুধু الملك শব্দ ব্যবহার করায় তার অর্থ দাঁড়ায় তিনি কোন বিশেষ এলাকা বা নির্দিষ্ট কোন রাজ্যের বাদশাহ নন, বরং সমগ্র বিশ্ব–জাহানের বাদশাহ। তাঁর ক্ষমতা ও শাসন কর্তৃত্ব সমস্ত সৃষ্টিজগত জুড়ে পরিব্যাপ্ত। প্রতিটি বস্তুর তিনিই মালিক। প্রতিটি বস্তু তার ইখতিয়ার, ক্ষমতা এবং হুকুমের অধীন। তার কর্তৃত্ব তথা সার্বভৌম ক্ষমতাকে (Soverignty) সীমিত করার মত কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলার বাদশাহীর এ দিকগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ – (الروم : ٢٦)

"আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সব তাঁরই মালিকানাধীন। সবাই তাঁর নির্দেশের অনুগত।" (আর রূম–২৬)

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ – (السجدة : ٥)

"আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সব কাজের ব্যবস্থাপনা তিনিই পরিচালনা করে থাকেন।"

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ – (الحديد : ٥)

"আসমান ও যমীনের বাদশাহী তাঁরই। সব বিষয় আল্লাহর দিকেই রুজু করা হবে।"

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ – (الفرقان : ٢)

"বাদশাহী ও সার্বভৌমত্বে কেউ তাঁর অংশীদার নয়।"

بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ – (يس : ٨٢)

"সবকিছুর কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা তাঁরই হাতে।" (ইয়াসীন–৮২)

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ – (البروج : ١٦)

"যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম" (আল বুরুজ–১৬)

لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ – (الانبياء : ٢٣)

"তিনি যা করেন তার জন্য তাঁকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। তবে অন্য সবাইকে জবাবদিহি করতে হয়।"

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ – (الرعد : ٤١)

"আল্লাহ ফায়সালা করেন। তাঁর ফায়সালা পুনর্বিবেচনাকারী কেউ নেই।"

وَهُوَ يُجِيْرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ – (المؤمنون : ٨٨)

"তিনিই আশ্রয় দান করেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ আশ্রয় দিতে পারে না।

(আল মু'মিনূন, ৮৮)

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ – (ال عمران : ٢٦)

"বলো, হে আল্লাহ, বিশ্ব–জাহানের মালিক! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও। তুমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদা দান করো আবার যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত কর। সমস্ত কল্যাণ তোমার আয়ত্বে। নিসন্দেহে তুমি সব বিষয়ে শক্তিমান।" (আলে ইমরান, ২৬)

এসব স্পষ্ট ঘোষণা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলার বাদশাহী সার্বভৌমত্ব কোন সীমিত বা রূপক অর্থের বাদশাহী নয়, বরং সত্যিকার বাদশাহী যা

সার্বভৌমত্বের পূর্ণাংগ অর্থ ও পূর্ণাংগ ধারণার মূর্তপ্রতীক। সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বুঝায় তার অস্তিত্ব বাস্তবে কোথাও থাকলে কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার বাদশাহীতেই আছে। তাঁকে ছাড়া আর যেখানেই সার্বভৌম ক্ষমতা থাকার দাবী করা হয় তা কোন বাদশাহ বা ডিক্টেটরের ব্যক্তি সত্তা, কিংবা কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠী অথবা কোন বংশ বা জাতি যাই হোক না কেন প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। কেননা, যে ক্ষমতা অন্য কারো দান, যা এক সময় পাওয়া যায় এবং আবার এক সময় হাতছাড়া হয়ে যায়, অন্য কোন শক্তির পক্ষ থেকে যা বিপদের আশংকা করে, যার প্রতিষ্ঠা ও টিকে থাকা সাময়িক এবং অন্য বহু প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের গণ্ডি সীমিত করে দেয় এমন সরকার বা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে আদৌ সার্বভৌম ক্ষমতা বলা হয় না।

কিন্তু কুরআন মজীদ শুধু একথা বলেই ক্ষান্ত হয় না যে, আল্লাহ তা'আলা গোটা বিশ্ব–জাহানের বাদশাহ। এর সাথে পরবর্তী আয়াতাংশগুলোতে স্পষ্ট করে বলছে, তিনি এমন বাদশাহ যিনি 'কুদ্দুস,' 'সালাম,' 'মু'মিন', 'মুহাইমিন', 'আযীয', 'জাব্বার', 'মুতাকাব্বির,' 'খালেক', 'বারী' এবং 'মুছাওবির'।

৩৭. মূল ইবারতে قدوس শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা আধিক্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এর মূল ধাতু قدس । قدس অর্থ সবরকম মন্দ বৈশিষ্ট মুক্ত ও পবিত্র হওয়া। قدوس অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা কোন পকার দোষ–ত্রুটি অথবা অপূর্ণতা কিংবা কোন মন্দ বৈশিষ্টের অনেক উর্ধে। বরং তা এক অতি পবিত্র সত্তা যার মন্দ হওয়ার ধারণাও করা যায় না। এখানে একথাটি ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, চরম পবিত্রতা প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্বের প্রাথমিক অপরিহার্য বিষয়সমূহের অন্তরভুক্ত যে সত্তা দুষ্ট, দুশ্চরিত্র এবং বদনিয়াত পোষণকারী, যার মধ্যে মানব চরিত্রের মন্দ বৈশিষ্টসমূহ বিদ্যমান এবং যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভে অধিনস্তরা কল্যাণ লাভের প্রত্যাশী হওয়ার পরিবর্তে অকল্যাণের ভয়ে ভীত হয়ে ওঠে এমন সত্তা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে এটা মানুষের স্বাভাবিক বিবেক–বুদ্ধি ও স্বভাব–প্রকৃতি মেনে নিতে অস্বীকার করে। এ কারণে মানুষ যাকেই সার্বভৌম ক্ষমতার আধার বলে স্বীকৃতি দেয় তার মধ্যে পবিত্রতা না থাকলেও তা আছে বলে ধরে নেয়। কারণ পবিত্রতা ছাড়া নিরংকুশ ক্ষমতা অকল্পনীয়। কিন্তু এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহ ছাড়া কোন চূড়ান্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তি পবিত্র নয় এবং তা হতেও পারে না। ব্যক্তিগত বাদশাহী, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি, অন্য কোন পদ্ধতির মানবীয় সরকার যাই হোক না কেন কোন অবস্থায়ই তার সম্পর্কে চরম পবিত্রতার ধারণা করা যেতে পারে না।

৩৮. মূল আয়াতে السلام শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ শান্তি। কাউকে 'সুস্থ' ও 'নিরাপদ' না বলে 'নিরাপত্তা' বললে আপনা থেকেই তার মধ্যে আধিক্য অর্থ সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন কাউকে সুন্দর না বলে যদি সৌন্দর্য বলা হয় তাহলে তার অর্থ হবে সে আপাদমস্তক সৌন্দর্যমণ্ডিত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাকে السلام বলার অর্থ তার গোটা সত্তাই পুরাপুরি শান্তি । কোন বিপদ, কোন দুর্বলতা কিংবা অপূর্ণতা স্পর্শ করা অথবা তাঁর পূর্ণতায় কোন সময় ভাটা পড়া থেকে তিনি অনেক উর্ধে।

৩৯. মূল আয়াতে المؤمن শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটির মূল ধাতু হলো امن । امن অর্থ ভয়ভীতি থেকে নিরাপদ হওয়া। তিনিই মু'মিন ।যিনি অন্যকে নিরাপত্তা দান করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে নিরাপত্তা দান করেন তাই তাঁকে মু'মিন বলা হয়েছে। তিনি কোন সময় তাঁর সৃষ্টির ওপর জুলুম করবেন, কিংবা তার অধিকার নস্যাত করবেন কিংবা তার পুরস্কার নষ্ট করবেন অথবা তার কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন এ ভয় থেকে তার সৃষ্টি পুরোপুরি নিরাপদ। আর কর্তার কোন কর্ম অর্থাৎ তিনি কাকে নিরাপত্তা দেবেন তা যেহেতু উল্লেখিত হয়নি বরং শুধু المؤمن বা নিরাপত্তা দানকারী বলা হয়েছে তাই আপনা থেকে এর অর্থ দাঁড়ায় গোটা বিশ্ব-জাহান ও তার সমস্ত জিনিসের জন্য তাঁর নিরাপত্তা।

৪০. মূল আয়াতে اَلْمُهَيْمِنُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির তিনটি অর্থ হয়। এক, তত্ত্বাবধান ও হিফাজতকারী। দুই, পর্যবেক্ষণকারী, কে কি করছে তা যিনি দেখছেন। তিন, সৃষ্টির যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপক, যিনি মানুষের সমস্ত প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এখানেও যেহেতু শুধু المهيمن শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই কর্তার কোন কর্ম নির্দেশ করা হয়নি। অর্থাৎ তিনি কার তত্ত্বাবধানকারী ও সংরক্ষক, কার পর্যবেক্ষক এবং কার দেখা শোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা বলা হয়নি। তাই শব্দের এ ধরনের প্রয়োগ থেকে স্বতঃই যা অর্থ দাঁড়ায় তা হলো তিনি সমস্ত সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ করছেন, সবার কাজকর্ম দেখছেন এবং বিশ্ব-জাহানের সমস্ত সৃষ্টির দেখাশোনা, লালন-পালন এবং অভাব ও প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

৪১. মূল ইবারতে العزيز শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন এক পরাক্রমশালী সত্তা যার মোকাবিলায় অন্য কেউ মাথা তুলতে পারে না, যার সিদ্ধান্তসমূহের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর সাধ্য কারো নেই এবং যার মোকাবিলায় সবাই অসহায় ও শক্তিহীন।

৪২. মূল আয়াতে الجبار শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর শব্দমূল বা ধাতু হলো جبر । جبر শব্দের অর্থ কোন বস্তুকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ঠিক করা, কোন জিনিসকে শক্তি দ্বারা সংশোধন করা। যদিও আরবী ভাষায় جبر শব্দটির কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু সংশোধন অর্থে এবং কোন কোন সময় শুধু জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হলো, সংস্কার ও সংশোধনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাকে جبار (জাব্বার) বলার অর্থ হলো বল প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি সৃষ্ট বিশ্ব-জাহানের শৃংখলা রক্ষাকারী এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নকারী, যদিও তাঁর ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়াও جبار শব্দটির মধ্যে বড়ত্ব ও মহত্ববোধক অর্থও বিদ্যমান। খেজুরের যে গাছ অত্যন্ত উঁচু হওয়ার কারণে তার ফল সংগ্রহ করা কারো জন্য সহজসাধ্য নয় আরবী ভাষায় তাকে জাব্বার বলে। অনুরূপ যে কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব ও জাকজমকপূর্ণ তাকে জাব্বার বা অতি বড় কাজ বলা হয়।

৪৩. মূল আয়াতে اَلْمُتَكَبِّرُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির দু'টি অর্থ। এক, যে প্রকৃতপক্ষে বড় নয়, কিন্তু খামাখা বড়ত্ব জাহির করে। দুই, যে প্রকৃতপক্ষেই বড় এবং বড় হয়েই থাকে। মানুষ হোক, শয়তান হোক বা অন্য কোন মাখলুক হোক, যেহেতু প্রকৃতপক্ষে তার কোন বড়ত্ব মহত্ব নেই, তাই নিজেকে নিজে বড় মনে করা এবং

অন্যদের কাছে নিজের বড়ত্ব ও মহত্ব জাহির করা একটা মিথ্যা দাবী ও জঘন্য দোষ। অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতই বড়, বড়ত্ব বাস্তবে তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট এবং বিশ্ব–জাহানের সব বস্তু তাঁর সামনে ক্ষুদ্র ও নগণ্য। তাই তাঁর বড় হওয়া এবং বড় হয়ে থাকা নিছক কোন দাবী বা ভান নয়। বরং একটি বাস্তবতা। এটি কোন খারাপ বা মন্দ বৈশিষ্ট নয়, বরং একটি গুণ ও সৌন্দর্য যা তাঁর ছাড়া আর কারো মধ্যে নেই।

৪৪. অর্থাৎ যারাই তাঁর ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও গুণাবলীতে কিংবা তাঁর সত্তায় অন্য কোন সৃষ্টিকে অংশীদার বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তারা অতিবড় এক মিথ্যা বলছে। কোন অর্থেই কেউ আল্লাহ তা'আলার শরীক বা অংশীদার নয়। তিনি তা থেকে পবিত্র।

৪৫. অর্থাৎ সারা দুনিয়ার এবং দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু সৃষ্টির প্রাথমিক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তার নির্দিষ্ট আকার আকৃতিতে অস্তিত্ব লাভ করা পর্যন্ত পুরাপুরি তাঁরই তৈরী ও লালিতপালিত। কোন কিছুই আপনা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেনি কিংবা আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়ে যায়নি অথবা তার নির্মাণ ও পরিপাটি করণে অন্য কারো সামান্যতম অবদানও নেই। এখানে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকর্মকে তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায় বা স্তরে বর্ণনা করা হয়েছে যা ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রথম পর্যায়টি হলো সৃষ্টি অর্থাৎ পরিকল্পনা করা। এর উদাহরণ হলো, কোন ইঞ্জিনিয়ার কোন ইমারত নির্মাণের পূর্বে যেমন মনে মনে স্থির করে যে, অমুক বিশেষ উদ্দেশ্যে তাকে এরূপ ও এরূপ একটি ইমারত নির্মাণ করতে হবে। সে তখন মনে মনে তার নমুনা বা ডিজাইন (Design) চিন্তা করতে থকে। এ উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ইমারতের বিস্তারিত ও সামগ্রিক কাঠামো কি হবে এ পর্যায়ে সে তা ঠিক করে নেয়। দ্বিতীয় পর্যায় হলো برء । এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো পৃথক করা, চিরে ফেলা, ফেড়ে আলাদা করা। স্রষ্টার জন্য 'বারী' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে, তিনি তাঁর পরিকল্পিত কাঠামোকে বাস্তবে রূপ দেন। অর্থাৎ যে নকশা তিনি নিজে চিন্তা করে রেখেছেন তাকে কল্পনা বা অস্তিত্বহীনতার জগত থেকে এনে অস্তিত্ব দান করেন। এর উদাহরণ হলো, ইঞ্জিনিয়ার ইমারতের যে কাঠামো ও আকৃতি তাঁর চিন্তার জগতে অংকন করেছিলেন সে অনুযায়ী ঠিকমত মাপজোঁক করে মাটিতে দাগ টানেন, ভিত খনন করেন, প্রাচীর গেঁথে তোলেন এবং নির্মাণের সকল বাস্তব স্তর অতিক্রম করেন। তৃতীয় পর্যায় হলো, 'তাসবীর'–এর অর্থ রূপদান করা। এখানে এর অর্থ হলো, কোন বস্তুকে চূড়ান্ত, পূর্ণাঙ্গ আকৃতি ও রূপ দান করা। এই তিনটি পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার কাজ ও মানুষের কাজের মধ্যে আদৌ কোন মিল বা তুলনা হয় না। মানুষের কোন পরিকল্পনাই এমন নয় যা পূর্বের কোন নমুনা থেকে গৃহীত নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি পরিকল্পনা অনুপম এবং তাঁর নিজের আবিষ্কার। মানুষ যা তৈরী করে তা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট উপাদানসমূহের একটিকে আরেকটির সাথে জুড়ে করে। অস্তিত্ব নেই এমন কোন জিনিসকে সে অস্তিত্ব দান করে না, বরং যা আছে তাকেই বিভিন্ন পন্থায় জোড়া দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বস্তুকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং যে উপাদান দিয়ে তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সে উপাদানও তাঁর নিজের সৃষ্টি। অনুরূপ আকার–আকৃতি দানের ব্যাপারেও মানুষ আবিষ্কর্তা নয়, বরং আল্লাহর তৈরী আকার–আকৃতি ও চিত্রসমূহের অনুকরণকারী ও অপরিপক্ক নকলকারী। প্রকৃত আকার–আকৃতি দানকারী ও চিত্র অংকনকারী মহান আল্লাহ। তিনি প্রতিটি জাতি,

প্রজাতি এবং প্রতিটি ব্যক্তির অনুপম ও নজীরহীন আকার–আকৃতি বানিয়েছেন এবং কোন সময় একই আকার–আকৃতির পুনরাবৃত্তি ঘটাননি।

৪৬. নামসমূহ অর্থ গুণবাচক নাম। তাঁর উত্তম নাম থাকার অর্থ হলো, যেমন গুণবাচক নাম দ্বারা তার কোন প্রকার অপূর্ণতা প্রকাশ পায় যেসব গুণবাচক নাম তাঁর জন্য উপযুক্ত নয়। যেসব নাম তাঁর পূর্ণাংগ গুণ ও বৈশিষ্ট প্রকাশ করে সেই সব নামে তাঁকে স্মরণ করা উচিত। কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ আ'আলার এসব উত্তম নামের উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে তাঁর পবিত্র সত্তার ৯৯টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে তিরমিযী ও ইবনে মাজা এসব নাম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। কেউ যদি কুরআন ও হাদীস থেকে এসব নাম গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়ে তাহলে সে অতিসহজেই উপলব্ধি করতে পারবে যে, পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় যদি আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে হয় তাহলে সে জন্য কি ধরনের শব্দ উপযুক্ত হবে।

৪৭. অর্থাৎ মুখের ভাষায় ও অবস্থার ভাষায় বর্ণনা করছে যে, তার স্রষ্টা সর্বপ্রকার দোষ–ত্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা এবং ভুল–ভ্রান্তি থেকে পবিত্র।

৪৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআনের সূরা হাদীদের ২নং টীকা।

আল মুমতাহিনা

৬০

নামকরণ

যেসব স্ত্রীলোক হিজরত করে চলে আসবে এবং মুসলমান হওয়ার দাবী করবে এ সূরার ১০ আয়াতে তাদের পরীক্ষা করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। এ কারণে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে আল মুমতাহিনা। মুমতাহানা এবং মুমতাহিনা এই দু'ভাবেই শব্দটি উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। প্রথম প্রকার উচ্চারণের ক্ষেত্রে এর অর্থ হয়, যে স্ত্রীলোককে পরীক্ষা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রকার উচ্চারণের ক্ষেত্রে এর অর্থ হয় পরীক্ষা গ্রহণকারী সূরা।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরায় এমন দু'টি বিষয়ে কথা বলা হয়েছে যার সময়-কাল ঐতিহাসিকভাবে জানা। প্রথমটি হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আর (রা) ঘটনা। তিনি মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে একটি গোপন পত্রের মাধ্যমে কুরাইশ নেতাদের এ মর্মে অবগত করেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি মুসলমান মহিলাদের সম্পর্কে, যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় আসতে শুরু করেছিল এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, সন্ধির শর্ত অনুসারে মুসলমান পুরুষদের মত তাদেরও কি কাফেরদের হাতে সোপর্দ করতে হবে? এ দু'টি ঘটনার উল্লেখ থেকে এ বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে নাযিল হয়েছিল। এ দু'টি ঘটনা ছাড়াও সূরার শেষের দিকে তৃতীয় আরেকটি ঘটনার উল্লেখ আছে। তাহলো, ঈমান গ্রহণের পর বাই'য়াত গ্রহণের উদ্দেশ্যে মহিলারা যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হবে তখন তিনি তাদের কাছ থেকে কি কি বিষয়ের প্রতিশ্রুতি নেবেন? সূরার এ অংশ সম্পর্কেও অনুমান হলো, তা মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুকাল পূর্বে নাযিল হয়েছিল। কারণ মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশদের পুরুষদের মত তাদের নারীরাও বিপুল সংখ্যায় একসাথে ইসলাম গ্রহণ করবে বলে মনে হচ্ছিলো। তাদের নিকট থেকে সামষ্টিকভাবে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের প্রয়োজন তখন অবশ্যম্ভাবী ছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটির তিনটি অংশ ঃ

প্রথম অংশ সূরার শুরু থেকে ৯ আয়াত পর্যন্ত। সূরার সমাপ্তি পর্বের ১৩নং আয়াতটিও এর সাথে সম্পর্কিত। হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আ শুধু তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি

গোপন সামরিক তথ্য শত্রুদের জানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এটি যথাসময়ে ব্যর্থ করে দেয়া না গেলে মক্কা বিজয়ের সময় ব্যাপক রক্তপাত হতো। মুসলমানদেরও বহু মূল্যবান প্রাণ নষ্ট হতো এবং কুরাইশদেরও এমন বহু লোক মারা যেতো, যাদের দ্বারা পরবর্তী সময়ে ইসলামের ব্যাপক খেদমত পাওয়ার ছিল। শান্তিপূর্ণ উপায়ে মক্কা বিজিত হলে যেসব সুফল অর্জিত হতে পারতো তা সবই পণ্ড হয়ে যেতো। এসব বিরাট ও ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হতো শুধু এ কারণে যে, মুসলমানদেরই এক ব্যক্তি যুদ্ধের বিপদ থেকে নিজের সন্তান-সন্ততিকে নিরাপদ রাখতে চেয়েছিল। এ আয়াতে হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আর এ কাজের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। মারাত্মক এই ভুল সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ঈমানদারদের এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন ঈমানদারের কোন অবস্থায় কোন উদ্দেশ্যেই ইসলামের শত্রু কাফেরদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখা উচিত এবং এমন কোন কাজও না করা উচিত যা কুফর ও ইসলামের সংঘাতে কাফেরদের জন্য সুফল বয়ে আনে। তবে যেসব কাফের কার্যত ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক ও নির্যাতনমূলক কোন আচরণ করছে না তাদের সাথে প্রীতিপূর্ণ ও অনুগ্রহের আচরণ করায় কোন দোষ নেই।

১০ ও ১১ আয়াত হলো, সূরাটির দ্বিতীয় অংশ। সেই সময় মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি করছিল এমন একটি সামাজিক সমস্যার সমাধান পেশ করা হয়েছে এ অংশে। মক্কায় বহু মুসলমান মহিলা ছিল যাদের স্বামীরা ছিল কাফের। এসব মহিলা কোন না কোনভাবে হিজরাত করে মদীনায় এসে হাজির হতো। অনুরূপ মদীনায় বহুসংখ্যক মুসলমান পুরুষ ছিল যাদের স্ত্রীরা ছিল কাফের এবং তারা মক্কাতেই রয়ে গিয়েছিল। এসব লোকের দাম্পত্য বন্ধন অক্ষুণ্ন আছে কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিতো। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে চিরদিনের জন্য ফায়সালা দিলেন যে, মুসলমান নারীর জন্য কাফের স্বামী হালাল নয় এবং মুসলমান পুরুষের জন্যও মুশরিক স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে ধরে রাখা জায়েয নয়। এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনগত ফলাফলের ধারক। পরে আমরা টীকাসমূহে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

১২নং আয়াত হলো সূরাটির তৃতীয় অংশ। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, জাহেলী যুগের আরব সমাজে যেসব বড় বড় দোষ-ত্রুটি ও গোনাহর কাজ নারীসমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল যেসব নারী ইসলাম গ্রহণ করবে তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিতে হবে এবং এ বিষয়েও অঙ্গীকার নিতে হবে যে, আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে যেসব কল্যাণ ও সুকৃতির পথ, পন্থা ও নিয়ম-কানুন মেনে চলার আদেশ দেয়া হবে তা তারা মেনে চলবে।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۙ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ①

হে[১] ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে (জন্মভূমি ছেড়ে ঘর থেকে) বেরিয়ে থাক তাহলে আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা কর, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তারা তা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাদের আচরণ হলো, তারা রসূলকে এবং তোমাদেরকে শুধু এই অপরাধে জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার করে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো। তোমরা গোপনে তাদের কাছে বন্ধুত্বমূলক পত্র পাঠাও। অথচ তোমরা গোপনে যা কর এবং প্রকাশ্যে যা করো তা সবই আমি ভাল করে জানি। তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই এরূপ করে নিশ্চিতভাবেই সে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

১. যেসব ঘটনা প্রসংগে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে শুরুতেই তা বিস্তারিত বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এতে পরবর্তী বিষয়বস্তু বুঝা সহজ হবে। মক্কার মুশরিকদের কাছে হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আর (রা) লিখিত পত্র ধরা পড়ার পর এ

আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল। সমস্ত তাফসীরকার এ ব্যাপারে একমত। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা, উরওয়া ইবনে যুবায়ের প্রমুখ বর্ণনাকারীর সর্বসম্মত বর্ণনাও তাই।

ঘটনা হলো, কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম মক্কার ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। কিন্তু কোথায় অভিযান পরিচালনা করতে চাচ্ছেন বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবা ছাড়া আর কাউকে তিনি তা বললেন না। ঘটনাক্রমে এই সময় মক্কা থেকে একজন মহিলা আসল। পূর্বে সে আবদুল মুত্তালিবের দাসী ছিল। কিন্তু পরে দাসত্ব শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে গানবাদ্য করে বেড়াত। নবীর(সা) কাছে এসে সে তার দারিদ্র্যের কথা বলল এবং কিছু অর্থ সাহায্য চাইল। তিনি বনী আবদুল মুত্তালিব এবং বনী মুত্তালিবের লোকদের কাছে থেকে কিছু অর্থ চেয়ে দিয়ে তার অভাব পূরণ করলেন। সে মক্কায় ফিরে যেতে উদ্যত হলে হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা'আ তার সাথে দেখা করলেন এবং মক্কার কয়েকজন কাফের নেতার নামে লেখা একখানা পত্র গোপনে তাকে দিলেন। আর সে যাতে এই গোপনীয় বিষয়টি প্রকাশ না করে এবং গোপনে তাদের কাছে পৌঁছে দেয় সে জন্য তিনি তাকে দশটি দিনারও দিলেন। সে সবেমাত্র মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিল। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত আলী, হযরত যুবায়ের এবং হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদকে তার সন্ধানে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন, তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও। রাওদায়ে খাখ নামক স্থানে (মদীনা থেকে মক্কার পথে ১২ মাইল দূরে) তোমরা এক মহিলার সাক্ষাত পাবে। তার কাছে মুশরিকদের নামে হাতেবের একটি পত্র আছে। যেভাবে হোক তার নিকট থেকে এ পত্রখানা নিয়ে এসো। সে যদি পত্রখানা দিয়ে দেয় তাহলে তাকে ছেড়ে দেবে। আর যদি না দেয় তাহলে তাকে হত্যা করবে। তাঁরা ঐ স্থানে পৌঁছে মহিলাকে দেখতে পেলেন। তাঁরা তার কাছে পত্রখানা চাইলেন। কিন্তু সে বললঃ আমার কাছে কোন পত্র নেই। তাঁরা তার দেহ তল্লাশী করলেন। কিন্তু কোন পত্র পাওয়া গেল না। অবশেষে তারা বললেন ঃ পত্রখানা আমাদের দিয়ে দাও তা না হলে আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে তল্লাশী নেব। সে যখন বুঝতে পারলো রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই তখন সে তার চুলের খোপার ভেতর থেকে পত্রখানা বের করে তাদের দিল। আর তাঁরা তা নিয়ে নবীর (সা) দরবারে হাজির হলেন। পত্রখুলে পড়া হলো। দেখা গেল তাতে কুরাইশদের অবগত করানো হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। (বিভিন্ন বর্ণনায় পত্রের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণিত হয়েছে কিন্তু বিষয়বস্তু ছিল এটিই) নবী (সা) হযরত হাতেবকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি একি করেছো? তিনি বললেন ঃ আপনি আমার ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি যা করেছি তা এ জন্য করি নাই যে, আমি কাফের বা মুরতাদ হয়ে গিয়েছি এবং ইসলামকে পরিত্যাগ করে এখন কুফরকে ভালবাসতে শুরু করেছি। প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমার আপনজনেরা সব মক্কায় অবস্থান করছে। আমি কুরাইশ গোত্রের লোক নই। বরং কুরাইশদের কারো কারো পৃষ্ঠপোষকতা ও ছত্রছায়ায় আমি সেখানে বসতিস্থাপন করেছিলাম। অন্য যেসব মুহাজিরের পরিবার–পরিজন মক্কায় অবস্থান করছে তাদের গোত্র তাদের রক্ষা করবে। কিন্তু আমার পরিবার–পরিজনকে রক্ষা করার মত কেউই সেখানে নেই। তাই আমি এই পত্র লিখেছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, এটা হবে কুরাইশদের প্রতি আমার একটা অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহের কথা মনে করে তারা আমার

إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۝ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

তাদের আচরণ হলো, তারা যদি তোমাদের কাবু করতে পারে তাহলে তোমাদের সাথে শত্রুতা করবে এবং হাত ও জিহবা দ্বারা তোমাদের কষ্ট দেবে। তারা চায় যে, কোনক্রমে তোমরা কাফের হয়ে যাও।[২] কিয়ামতের দিন না তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন কোন কাজে আসবে না সন্তান-সন্ততি[৩] কোন কাজে আসবে। সেদিন আল্লাহ তোমাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেবেন।[৪] আর তিনিই তোমাদের আমল বা কর্মফল দেখবেন।[৫]

সন্তানদের ওপর নির্যাতন চালাবে না। (হযরত হাতেবের পুত্র আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন যে, ঐ সময় হযরত হাতেবের সন্তান-সন্ততি ও ভাই মক্কায় অবস্থান করছিল। তাছাড়া হযরত হাতেবের নিজের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় সেসময় তাঁর মাও সেখানে ছিল।) হাতেবের এই বক্তব্য শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সবাইকে বললেন : قد صدقكم হাতেব তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলেছে। অর্থাৎ এটিই তার এ কাজের মূল কারণ। ইসলামকে পরিত্যাগ বা কুফরকে সহযোগিতা করার মানসিকতা এর চালিকাশক্তি নয়। হযরত উমর উঠে বললেন : হে আল্লাহর রসূল, আমাকে অনুমতি দিন এই মুনাফিকের শিরচ্ছেদ করি। সে আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নবী (সা) বললেন, এ ব্যক্তি তো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তোমরা তো জানো না, হয়তো আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের বিষয় বিবেচনা করে বলে দিয়েছেন : তোমরা যাই করো না কেন আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন। (শেষ বাক্যাংশটির ভাষা বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোনটাতে আছে قد غفرت لكم 'আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।' কোনটাতে আছে انى غافر لكم 'আমি তোমাদের মাফ করে দেব।' আবার কোনটাতে আছে سأغفر لكم 'আমি অচিরেই তোমাদের মাফ করে দেব') একথা শুনে হযরত 'উমর (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন : আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই সর্বাধিক জানেন। এ হলো বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, তাবারী, ইবনে হিশাম, ইবনে হিব্বান এবং ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক সহীহ সনদে বর্ণিত বহু সংখ্যক হাদীসের সার সংক্ষেপ। এসব বর্ণনার মধ্যে যে বর্ণনাটি হযরত আলীর নিজের মুখ থেকে তাঁর সেক্রেটারী উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে শুনেছেন এবং তার নিকট থেকে হযরত আলীর (রা) পৌত্র হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হানফীয়া শুনে পরবর্তী রাবীদের কাছে পৌঁছিয়েছেন সেটিই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। এসব বর্ণনার কোনটিতেই স্পষ্ট করে একথা বলা হয়নি যে, হযরত হাতেবের এই ওজর শোনার পর তাকে মাফ করে দেয়া

হয়েছিল। আবার কোন সূত্র থেকে একথাও জানা যায় না যে, তাঁকে কোন শাস্তি দেয়া হয়েছিল। তাই আলেমগণ ধরে নিয়েছেন হযরত হাতেবের ওজর গ্রহণ করে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

২. এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে এবং পরে যা বলা হবে যদিও তা নাযিল হওয়ার উপলক্ষ ছিল হযরত হাতেবের ঘটনা, কিন্তু মহান আল্লাহ কেবল তার ব্যাপারে কথা বলার পরিবর্তে এর মাধ্যমে সমস্ত ঈমানদারদের চিরদিনের জন্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, যেখানে কুফর ও ইসলামের মোকাবিলা এবং যেখানে কিছু লোক ঈমানদারদের বিরুদ্ধে তাদের মুসলমান হওয়ার কারণে শত্রুতা করছে সেখানে কোন ব্যক্তির কোন উদ্দেশ্য বা কোন যুক্তির খাতিরেও এমন কোন কাজ করা যা দ্বারা ইসলামের স্বার্থের ক্ষতি এবং কুফর ও কাফেরদের স্বার্থের আনুকূল্য হয়, ঈমানের পরিপন্থি আচরণ। কারো মধ্যে যদি ইসলামের প্রতি শত্রুতা ও ক্ষতি করার মানসিকতা একেবারেই না থাকে এবং সে খারাপ নিয়তে নয় বরং নিছক নিজের একান্ত কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই এরূপ কাজ করে বসে তবুও তা কোন ঈমানদারের জন্য যোগ্য ও শোভনীয় কাজ নয়। এ ধরনের কাজ যেই করে থাকুক না কেন সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

৩. এখানে হযরত হাতেবের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তিনি তাঁর মা, ভাই এবং সন্তান-সন্ততিকে যুদ্ধের সময় শত্রুর নির্যাতন থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এ কাজ করেছিলেন। তাই বলা হচ্ছে, যাদের জন্য তুমি এত বড় অপরাধ করে বসলে কিয়ামতের দিন তারা তোমাকে রক্ষা করতে আসবে না। আল্লাহর আদালতে এগিয়ে গিয়ে কারো একথা বলার সাহস হবে না যে, আমার বাপ, আমার মা অথবা আমার ভাই আমার জন্য এ গোনাহ করেছিল। তাই তার জন্য যে শাস্তি হওয়ার তা আমাকে দেয়া হোক। সেদিন প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। অন্য কারো পরিণাম বা কর্মফল ভোগ করতে প্রস্তুত হওয়া তো দূরের কথা নিজের কৃতকর্মের পরিণাম থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায়, সেই ভাবনাতেই সবাই থাকবে দিশেহারা। কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় একথাটিই অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে, "অপরাধী সেদিন কামনা করবে, যদি তার সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, ভাই এবং সাহায্যকারী নিজ বংশ এবং গোটা পৃথিবীর সমস্ত লোককে বিনিময়ে দিয়েও যদি সে এ আযাব থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে তাহলে তা সে দেবে এবং নিজে মুক্তি লাভ করবে।" (আল মা'আরিজ, আয়াত ১১—১৪) আরেক স্থানে বলা হয়েছে, "সেদিন মানুষ নিজের ভাই, নিজের মা, নিজের বাপ, নিজের স্ত্রী এবং নিজের ছেলেমেয়ের কাছ থেকে পালাবে। প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে যে, হুশই থাকবে না। (আবাসা, ৩৪—৩৭)।

৪. অর্থাৎ সেখানে দুনিয়ার সব রকম আত্মীয়তা, সম্পর্ক এবং বন্ধন ছিন্ন করে দেয়া হবে। দল, পার্টি এবং বংশ বা গোত্র হিসেবে মানুষের হিসেব-নিকেশ হবে না। বরং প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে পেশ করা হবে এবং তাকে কেবল তার নিজের হিসেবই দিতে হবে। তাই কোন আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব বা যুথবদ্ধতার খাতিরে কারো কোন নাজায়েয কাজ করা উচিত নয়। কারণ কৃতকর্মের শাস্তি তার নিজেকেই ভোগ করতে হবে অন্য কেউ তার ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্বের অংশীদার হবে না।

৫. হযরত হাতেব সম্পর্কিত এই ঘটনাটির বিস্তারিত যে বিবরণ আমরা উপরে পেশ করেছি তা থেকে এবং ঐ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ এসব আয়াত থেকে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত ও ফলাফল পাওয়া যায় ঃ

এক ঃ কাজ যিনি করেছেন তিনি কি নিয়তে করেছেন সে বিষয়টি বাদ দিলেও এ কাজটি ছিল স্পষ্টত গুপ্তচরবৃত্তি তাও আবার অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে চরম বিপজ্জনক প্রকৃতির গুপ্তচরবৃত্তি। অর্থাৎ আক্রমণের ঠিক পূর্বক্ষণে বে-খবর শত্রুকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া ব্যাপারটা শুধু সন্দেহের পর্যায়ে ছিল না। অভিযুক্তের নিজ হাতে লেখা পত্রও ধরা পড়েছিল। তাই আর কোন প্রমাণেরও প্রয়োজন ছিল না তখন শান্তিকালীন অবস্থা ছিল না, যুদ্ধকালীন অবস্থা বিরাজ করছিল। তা সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম হাতেবকে সাফাই ও নির্দোষিতা প্রমাণ করার সুযোগ না দিয়ে গ্রেফতার করলেন না। আর কোন রুদ্ধদ্বার কক্ষে তাকে সাফাই পেশ করতে বলা হয়নি। বরং উন্মুক্ত আদালতে সবার সামনে সাফাই পেশ করতে দিয়েছেন। এ থেকে স্পষ্ট জানা যায়, ইসলামে এমন কোন আইন-কানুন ও নিয়ম-পদ্ধতির আদৌ কোন অবকাশ নেই যার ভিত্তিতে শাসক শুধু নিজের অবগতি ও সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে কোন অবস্থায় কাউকে গ্রেফতার করার অধিকার রাখে। তাছাড়া বদ্ধ কামরায় গোপনপন্থায় কারো বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানোর কোন বিধানও ইসলামে নেই।

দুই ঃ হযরত হাতেব শুধু মুহাজিরই ছিলেন না। তিনি বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সাহাবীদের মধ্যেও তার একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এত বড় অপরাধ করে ফেলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে অত্যন্ত কঠোরভাবে তার সমালোচনা করেছেন যা উপরোল্লেখিত আয়াত থেকে জানা যেতে পারে। বিভিন্ন হাদীসেও তার এ কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাফসীরকারদের মধ্যে এ ঘটনার উল্লেখ করেননি এমন তাফসীরকার নেই বললেই চলে। সাহাবায়ে কেরাম যে নির্ভুল ও নিষ্পাপ নন এটি তার বহু সংখ্যক প্রমাণের একটি। মানবীয় দুর্বলতার কারণে তাঁদের দ্বারাও ভুল-ত্রুটি হতে পারে এবং কার্যত হয়েছেও। আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সাহাবীদের প্রতি সম্মান দেখানোর যে শিক্ষা দিয়েছেন তার দাবী কখনো এ নয় যে, তাদের কারো দ্বারা কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলে তার উল্লেখ করা যাবে না। তাই যদি হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে তার উল্লেখ করতেন না এবং সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, মুফাস্সির এবং মুহাদ্দিসগণও তাঁদের রেওয়ায়াতসমূহে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতেন না।

তিন ঃ হযরত হাতেবের ঘটনায় হযরত উমর (রা) যে অভিমত ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন তা ছিল হযরত হাতেবের কাজের বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে। হযরত উমরের যুক্তি ছিল, এটি এমন একটি কাজ যা সরাসরি আল্লাহ, আল্লাহর রসূল এবং মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। অতএব হাতেব মুনাফিক এবং হত্যার উপযুক্ত। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং ইসলামী শরীয়াতের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে বললেন ঃ কাজের বাহ্যিক অবস্থা বিচার করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। বরং এও দেখা উচিত যে, যে ব্যক্তির দ্বারা কাজটি সংঘটিত হয়েছে তার অতীত জীবন এবং সার্বিক স্বভাব-চরিত্র কেমন। তার চাল-চলন

কিসের ইংগিত দেয়। নিসন্দেহে কাজটির বাহ্যিক রূপ ছিল গুপ্তচরবৃত্তি। কিন্তু কাজটি যিনি করেছেন ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের সাথে তার আজ পর্যন্তকার আচরণ কি একথাই বলে যে, এ ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার নিয়তে এ কাজ করতে পারে? যাঁরা ঈমান রক্ষার কারণে হিজরাত করেছিলেন তিনি তাঁদের একজন। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছাড়া কি তিনি এত বড় ত্যাগ স্বীকার করতে পারতেন? বদর যুদ্ধের মত নাজুক পরিস্থিতিতেও যখন শত্রুর তিনগুণ এবং অনেক বেশী ও ব্যাপকভাবে অস্ত্রসজ্জিত শক্তির সাথে মোকাবিলা হতে যাচ্ছিল—তখন ঈমানের খাতিরে তিনি জীবন বাজি রেখেছিলেন। এমন ব্যক্তির নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা কি সন্দেহযুক্ত হতে পারে? অথবা তাঁর সম্পর্কে কি একথা বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, তাঁর অন্তরে কুরাইশ কাফেরদের প্রতি সামান্যতম আকর্ষণ ও সহানুভূতি থাকতে পারে? তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় তাঁর কাজের কারণ তুলে ধরেছেন এই বলে যে, মক্কায় তাঁর ছেলেমেয়ের জন্য বংশ ও গোত্রের এমন কোন নিরাপত্তা ব্যূহ নেই যা অন্য মুহাজিরদের আছে। তাই যুদ্ধের সময় তাদেরকে শত্রুর নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি এ কাজ করেছেন। মক্কায় যে তাঁর কোন আপন গোত্র নেই, বাস্তব অবস্থাও তার প্রমাণ এবং একথাও সবার জানা যে, তাঁর সন্তান–সন্ততি সেখানেই অবস্থান করছে। তাই তাঁর এ বক্তব্য মিথ্যা মনে করার কোন কারণ নেই। তাছাড়া তাঁর সম্পর্কে এ অভিমত পোষণ করা এবং তাঁর এ বক্তব্য যে তাঁর কাজটির মূল কারণ নয়, বরং তাঁর মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার উদ্দেশ্য কাজ করছিল, সেরূপ মনে করার কোন সংগত যুক্তি নেই। তথাপি নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে শত্রুদেরকে মুসলমানদের সামরিক পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করা সদুদ্দেশ্যে হলেও একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের জন্য এরূপ কাজ ও আচরণ জায়েয নয়। কিন্তু সৎ ও নিষ্ঠাবান লোকের ত্রুটি এবং মুনাফিকের বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। শুধু কাজের ধরন ও প্রকৃতি দেখে উভয়ের একই শাস্তি হতে পারে না। আলোচ্য মোকদ্দমায় এটি ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্ত। সূরা মুমতাহিনার এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন। গভীর মনোনিবেশ সহকারে ওপরের তিনটি আয়াত পড়লে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এসব আয়াতে হযরত হাতেবকে তিরস্কার করা হয়েছে ঠিকই; তবে একজন মু'মিনকে তিরস্কারের ধরন যা হয়ে থাকে এটা ঠিক সেই ধরনের তিরস্কার। কোন মুনাফিকের জন্য যে ধরনের তিরস্কার হয়ে থাকে এটা ঠিক তা নয়। তাছাড়া তাঁকে কোন আর্থিক বা শারীরিক শাস্তি দেয়া হয়নি। বরং প্রকাশ্যে কঠোর তিরস্কার, সমালোচনা ও শাসনবাণী শুনিয়েই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তার অর্থ, মুসলিম সমাজে একজন অপরাধী ঈমানদারের মর্যাদাহানি হওয়া এবং তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়াও তার জন্য একটি বড় শাস্তি।

চার ঃ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি ঃ তুমি তো জান না, আল্লাহ তা'আলা হয়তো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের দেখে বলে দিয়েছেন ঃ তোমরা যাই কর না কেন, আমি তোমাদের মাফ করে দিয়েছি"— এর অর্থ এ নয় যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সাত খুন মাফ করে দেয়া হয়েছে এবং পৃথিবীতে যে গোনাহ ও অপরাধই তারা করতে চাইবে তা করার অবাধ স্বাধীনতা তাদের দেয়া হয়েছে। এসব অপরাধ ক্ষমা করার অগ্রিম নিশ্চয়তা

তারা লাভ করেছেন তা বুঝাতে নবী (সা) একথাটি বলেননি, কোন সাহাবীও কোন সময় একথার এ অর্থ গ্রহণ করেননি, এ সুসংবাদ শুনে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোন সাহাবীও যে কোন গোনাহর কাজ করার ব্যাপারে নিজেকে স্বাধীন মনে করেননি এবং ইসলামী শরীয়াতও এর ভিত্তিতে এমন কোন ফর্মুলা তৈরী করেনি যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোন সাহাবীর দ্বারা যদি কোন অপরাধ সংঘটিত হয় তাহলে তাকে কোন শাস্তি দেয়া যাবে না। প্রকৃতপক্ষে যে ক্ষেত্র ও পরিবেশে কথাটা বলা হয়েছিল সেই ক্ষেত্র ও পরিবেশ এবং নবী (সা) যে কথাটি বলেছিলেন সেই কথাটি সম্পর্কে যদি চিন্তা-ভাবনা ও পর্যালোচনা করা যায় তাহলে এর যে স্পষ্ট অর্থ বুঝা যায় তাহলো, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য নিষ্ঠা, কুরবানী এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার এত বড় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যার ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের আগের ও পরের সব গোনাহ মাফ করে দিয়ে থাকেন তাহলে তাঁদের এই খেদমত এবং আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পার প্রতি লক্ষ করলে তা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। অতএব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক সাহাবী সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা ও মুনাফেকীর সন্দেহ করো না। অপরাধের যে কারণ সে নিজে বর্ণনা করছে তা গ্রহণ করো।

পাঁচ : কুরআন মজীদ এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী থেকে একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কাফেরদের জন্য কোন মুসলমানের গোয়েন্দাগিরি করাটাই তার মুরতাদ, বেঈমান অথবা মুনাফিক হয়ে যাওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয়। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যদি অন্য কোন সাক্ষ-প্রমাণ থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। তা নাহলে এটি নিছক একটি অপরাধমূলক কাজ, কুফরীমূলক কাজ নয়।

ছয় : কুরআন মজীদের এই আয়াত থেকে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কাফেরদের পক্ষ হয়ে মুসলমানদের গোয়েন্দাগিরি করা কোন অবস্থায়ই জায়েয নয়। এতে কারো নিজের কিংবা তার অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের প্রাণ ও সম্পত্তি যত কঠিন বিপদের মুখোমুখিই হোক না কেন।

সাত : হযরত উমর (রা) যখন হযরত হাতেবকে গোয়েন্দাগিরির অপরাধে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন তখন তার জবাবে নবী (সা) একথা বলেননি যে, এ ধরনের অপরাধ হত্যাযোগ্য অপরাধ নয়। বরং তিনি হত্যা করার অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালেন এ জন্য যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হাতেবের নিষ্ঠা ও সৎনিয়তের স্পষ্ট প্রমাণ। তার এ বক্তব্যও সত্য যে, তিনি শত্রুদের কল্যাণ কামনায় নয়, বরং নিজের সন্তান-সন্ততিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এ কাজ করেছিলেন। এ ঘটনা থেকে একদল ফকীহ প্রমাণ পেশ করেছেন যে, মুসলিম গুপ্তচরদের হত্যা করাই হলো সাধারণ আইন। তবে যদি অত্যন্ত যুক্তিসংগত কারণ বর্তমান থাকে তাহলে তাকে ন্যূনতম শাস্তি দিয়ে কিংবা শুধু তিরস্কার করে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ইমাম শাফেয়ী (র) এবং অপর কিছুসংখক ফিকাহবিদদের মত হলো, মুসলিম গুপ্তচরদের তাযীর করতে হবে। কিন্তু তাকে হত্যা করা জায়েয নয়। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং ইমাম আওযায়ী বলেন : তাকে দৈহিক শাস্তি দিতে হবে এবং দীর্ঘদিন বন্দী করে রাখার শাস্তি দিতে হবে। ইমাম মালেক বলেন: তাকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মালেকী ফকীহদের বক্তব্য ভিন্নরূপ। আশহাব

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرٰهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهٗ ۚ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ ز كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِن شَيْءٍ ۖ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ④

তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মধ্যে একটি উত্তম আদর্শ বর্তমান। তিনি তাঁর কওমকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন ঃ আমরা তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহকে ছেড়ে যেসব উপাস্যের উপাসনা তোমরা করে থাক তাদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অসন্তুষ্ট। আমরা তোমাদের অস্বীকার করেছি।[৬] আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরদিনের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে— যতদিন তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে। তবে ইবরাহীমের তার বাপকে একথা বলা (এর অন্তরভুক্ত নয়) "আমি আপনার জন্য অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করবো। তবে আল্লাহর নিকট থেকে আপনার জন্য নিশ্চিত কোন কিছু অর্জন করে নেয়া আমার আয়ত্বাধীন নয়।"[৭] (ইবরাহীম ও ইবরাহীমের দোয়া ছিল ঃ) হে আমাদের রব, তোমার ওপরেই আমরা ভরসা করেছি, তোমার প্রতিই আমরা রুজু করেছি আর তোমার কাছেই আমাদের ফিরে আসতে হবে।

বলেন ঃ এ ব্যাপারে ইমাম ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। অপরাধ এবং অপরাধীর অবস্থা বিবেচনা করে তিনি তাঁর ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোন শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন। ইমাম মালেক (র) এবং ইবনুল কাসেমের একটি মতও তাই। ইবনুল মাজেশুন এবং আবদুল মালেক ইবনে হাবীব বলেন, গুপ্তচরবৃত্তি যদি অপরাধীর স্বভাবে পরিণত হয়ে থাকে তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে। ইবনে ওয়াহাব বলেন ঃ গুপ্তচরবৃত্তির শাস্তি মূলত মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু সে, যদি এ কাজ থেকে তাওবা করে তাহলে তাকে মাফ করা যেতে পারে। সাহনূন বলেন ঃ তাওবার ক্ষেত্রে তার তাওবা সত্যিকার তাওবা না ধোঁকাবাজি তা কিভাবে নিরূপণ করা যাবে? তাই তাকে হত্যা করাই উচিত। ইবনুল কাসেমের একটি মত এ বক্তব্যকে সমর্থন করে। আসবাগ বলেন ঃ হারবী বা যুদ্ধরত জাতির গুপ্তচরের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু মুসলিম ও যিম্মী গুপ্তচরকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে শাস্তি দিতে হবে। তবে সে যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুদের খোলাখুলি সাহায্য করে তাহলে ভিন্ন কথা। (আহকামুল কুরআন—ইবনুল আরাবী, উমদাতুল কারী, ফাতহুল বারী)।

আট ঃ উল্লেখিত হাদীস থেকে এ বিষয়ের বৈধতা লাভ করা যায় যে, অপরাধের তদন্ত বা অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজন হলে শুধু অভিযুক্ত পুরুষকেই নয়, স্ত্রীলোককেও উলঙ্গ করা যেতে পারে। হযরত আলী (রা), হযরত যুবায়ের (রা) এবং হযরত মিকদাদ (রা) যদিও মহিলাটিকে উলঙ্গ করেননি, কিন্তু পত্র না দিলে তাঁরা তাকে তার কাপড় খুলে তল্লাশী চালাবেন বলে ভয় দেখিয়েছিলেন। এ কাজটি যদি বৈধ না হতো তাহলে এ তিনজন সম্মানিত সাহাবী এ কাজ করার ভয় দেখাতে পারতেন না। এ ক্ষেত্রে যুক্তির দাবী হলো, তারা ফিরে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁদের অভিযানের কাহিনী অবশ্যই শুনিয়ে থাকবেন। নবী (সা) তাদের এ কাজ অপছন্দ করে থাকলে বা এ কাজের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকলে তা অবশ্যই বর্ণনা সূত্রে আমরা লাভ করতাম। এ কারণে ফকীহগণ এ ধরনের কাজ বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। (উমদাতুল কারী)

৬. অর্থাৎ আমরা তোমাদের অস্বীকারকারী। আমরা তোমাদেরকে সত্যপথের অনুসারী বলে মানি না এবং তোমাদের দীনকেও সত্য দীন বলে স্বীকার করি না। আল্লাহর প্রতি ঈমানের অপরিহার্য দাবী হলো তাগুতের সাথে কুফরী করা।

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا –

"যে ব্যক্তি তাগুতের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে যা ছিন্ন হবার নয়।" (আল বাকারাহ ২৫৬)

৭. অন্য কথায় এর অর্থ হলো, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর কাফের ও মুশরিক কওমের প্রতি যে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন এবং পরিষ্কার ভাষায় তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার যে ঘোষণা করেছিলেন তা তোমাদের জন্য অনুসরণীয়। কিন্তু তিনি তাঁর মুশরিক পিতার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার যে ওয়াদা করেছিলেন এবং কার্যত তা করেছিলেন, তার মধ্যে তোমাদের জন্য অনুসরণীয় কিছু নেই। কারণ কাফেরদের সাথে ভালবাসা ও সহানুভূতির সামান্যতম সম্পর্ক রাখাও ঈমানদারদের জন্য ঠিক নয়। সূরা তাওবায় (১১৩ আয়াত) আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُولِىْ قُرْبٰى –

"যত নিকট আত্মীয়ই হোক না কেন মুশরিকদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা কোন নবীর কাজ নয় এবং ঈমানদারদের জন্যও তা শোভনীয় নয়"।

তাই হযরত ইবরাহীম এ কাজ করেছিলেন এই যুক্তি দেখিয়ে কোন মুসলমানই তার কাফের নিকটাত্মীয়দের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে না। এখন কথা হলো, হযরত ইবরাহীম (আ) নিজে কিভাবে এ কাজ করলেন? আর তিনি কি তাঁর এ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন? এ প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব আমরা কুরআন মজীদ থেকেই পেয়ে যাই। তাঁর বাপ যে সময় তাঁকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন তখন বিদায় বেলায় তিনি বলেছিলেনঃ

سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّىْ –

"আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আমার রবের কাছে আপনার ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করবো।" (মারয়াম, ৪৭)

এই প্রতিশ্রুতির কারণে তিনি দুইবার তাঁর পিতার জন্য দোয়া করেছেন। এর একটি দোয়ার উল্লেখ আছে সূরা ইবরাহীমে (আয়াত, ৪১) ঃ

رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ –

"হে আমাদের প্রতিপালক যেদিন হিসেব নেয়া হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা মাতাকে এবং সমস্ত ঈমানদারকে মাফ করে দিও।"

দ্বিতীয়বার দোয়ার উল্লেখ আছে সূরা শু'আরাতে (আয়াত, ৮৬-৮৭)ঃ

وَاغْفِرْ لِاَبِىْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّالِّيْنَ – وَلَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ –

"আমার পিতাকে ক্ষমা করে দিন। সে তো পথভ্রষ্টদের অন্তরভুক্ত। আর যেদিন মানুষকে জীবিত করে উঠানো হবে সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না।"

কিন্তু পরে যখন তিনি বুঝতে পারলেন, যে পিতার ক্ষমা চেয়ে তিনি দোয়া করছেন সে আল্লাহর দুষমন তখন তিনি তার প্রতি বিমুখ হয়ে গেলেন এবং তার সাথে ভালবাসা ও সহানুভূতির সম্পর্কও ছিন্ন করলেন।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ۚ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ – (التوبه : ١١٤)

"আর ইবরাহীমের তার পিতার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করার কারণ তার পিতাকে দেয়া একটি প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অতপর তাঁর কাছে যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম অত্যন্ত কোমল হৃদয় ও নম্র স্বভাবের ছিলেন।"

এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে এ মৌলিক সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নবীদের সেসব কাজই কেবল অনুসরণযোগ্য যার ওপরে তাঁরা শেষ পর্যন্ত বহাল ছিলেন। এরপর থাকে তাদের সেসব আমল যা তাঁরা পরবর্তী সময়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন অথবা যেগুলোর ওপর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের বহাল থাকতে দেননি অথবা আল্লাহর শরীয়াতে যেসব আমলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে, তা অনুসরণযোগ্য নয়। অমুক নবী এ কাজ করেছেন এ যুক্তি দেখিয়ে কেউ নবীদের এ ধরনের কাজকর্মের অনুসরণ করতে পারে না।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যা মানুষের মনে খটকা সৃষ্টি করতে পারে। আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীমের (আ) যে কথাটিকে আল্লাহ তা'আলা অনুসরণযোগ্য হওয়া থেকে বাদ দিয়েছেন তার দু'টি অংশ আছে। একটি অংশ হলো, তিনি তাঁর বাপকে বলেছিলেন ঃ আমি আপনার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবো। দ্বিতীয় অংশটি হলো,

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾

হে আমাদের রব, আমাদেরকে কাফেরদের জন্য ফিতনা বানিয়ে দিও না।[৮] *হে আমাদের রব, আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও। নিসন্দেহে তুমিই পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী।*

এসব লোকের কর্মপদ্ধতিতে তোমাদের জন্য এবং আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রত্যাশী লোকদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।[৯] *এ থেকে যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও প্রশংসিত।*[১০]

আল্লাহর নিকট থেকে আপনাকে ক্ষমা নিয়েই দেব এ সাধ্য আমার নেই। এ দু'টি কথার মধ্যে প্রথম কথাটি অনুসরণযোগ্য না হওয়া বোধগম্য। কিন্তু দ্বিতীয় কথাটির মধ্যে কি এমন মন্দ দিক আছে যে, সেটিকে অনুসরণযোগ্য হওয়া থেকে বাদ দেয়া হয়েছে? অথচ তা নিতান্তই একটি সত্য কথা। এর জবাব হলো, হযরত ইবরাহীমের (আ) একথাটি বাদ পড়েছে এ জন্য যে, কেউ যখন কোন কাজ করে দেয়ার জন্য কারো সাথে ওয়াদা করার পর বলে যে, তোমার জন্য এর অধিক আর কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। তখন আপনা থেকেই তার অর্থ দাঁড়ায়, যদি এর চেয়েও বেশী কিছু করার সাধ্য তার থাকতো তাহলে সে তার জন্য তাও করতো। একথাটি ঐ ব্যক্তির সাথে তার আরো গভীর সহানুভূতিমূলক সম্পর্কই প্রকাশ করে। এ কারণে হযরত ইবরাহীমের কথার দ্বিতীয় অংশটিও বাদ যাওয়ার উপযুক্ত। যদিও তার এ বিষয়বস্তু অতিব সত্য ও বাস্তব যে, আল্লাহর নিকট থেকে ক্ষমা বা মাগফিরাত নিয়ে দেয়া কোন নবীর ইখতিয়ার বহির্ভূত ব্যাপার। আল্লামা আলূসীও তাঁর তাফসীর গ্রন্থ রুহুল মায়া'নীতে এ প্রশ্নের এ জবাব দিয়েছেন।

৮. কাফেরদের জন্য ঈমানদারদের ফিতনা হওয়ার কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। ঈমানদার বান্দার উচিত এর সবগুলো থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। উদাহরণস্বরূপ, এর একটি অবস্থা হতে পারে কাফেররা মু'মিনদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়া। আর এই বিজয়কে তারা তাদের সত্যপন্থী হওয়ার এবং ঈমানদারদের বাতিলপন্থী হওয়ার প্রমাণ বলে ধরে নিতে পারে। তারা মনে করতে পারে, এ লোকগুলো যদি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভ করে থাকে তাহলে কিভাবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করতে সক্ষম হলাম। দ্বিতীয় অবস্থা হতে পারে এই যে, ঈমানদারদের ওপর কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন সহ্যসীমা অতিক্রম করে যাওয়ার কারণে তারা পরিশেষে নতি স্বীকার করে বসবে এবং আদর্শ ও নৈতিকতার বিকিকিনি করে আপোষ করতে সম্মত হয়ে যাবে। এটা সারা দুনিয়ার সামনে ঈমানদারদের হাস্যাস্পদ হওয়ার কারণ হবে আর এভাবে কাফেররা দীন ও দীনের অনুসারীদের হেয় ও অপমানিত করার সুযোগ পেয়ে যাবে। তৃতীয় আরেকটি

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۚ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۞

২ রুকূ'

অসম্ভব নয় যে, আজ তোমরা যাদের শত্রু বানিয়ে নিয়েছো আল্লাহ তা'আলা তাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন এক সময় বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন।[১১] *আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমতাবান। আর তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।*

যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং বাড়ীঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেয়নি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের পছন্দ করেন।[১২]

অবস্থা হতে পারে, দীনে হকের প্রতিনিধিত্বের উচ্চাসনে সমাসীন হওয়া সত্ত্বেও ঈমানদারগণ এই পদমর্যাদার উপযুক্ত নৈতিক গুণাবলী থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে এবং তাদের জীবন, চরিত্র ও কর্মেও এমনসব দোষ–ত্রুটি থেকে যাবে যা জাহেলী সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান থাকে। এভাবে কাফেররা বলার সুযোগ পাবে যে, এ আদর্শের মধ্যে এমন কি সৌন্দর্যবৈশিষ্ট ও কল্যাণকর বিষয় আছে যা তাকে আমাদের কুফরী আদর্শের তুলনায় অধিক মর্যাদা দান করে? (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, টীকা, ৮৩)।

৯. অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, একদিন তাকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে এবং এ আশাও করে যে, আল্লাহ যেন তাকে তাঁর অনুগ্রহ ও নিয়ামত দানে ধন্য করেন আর আখেরাতের দিন সে সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়।

১০. অর্থাৎ এমন ঈমানদারদের দিয়ে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই যারা তাঁর দীনকে মানার দাবীও করবে আবার তাঁর দুশমনের সাথে বন্ধুত্বও করবে। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। এসব লোক তাঁকে আল্লাহ হিসেবে মানুক আল্লাহর উলুহিয়াত এর মুখাপেক্ষী নয়। তিনি তাঁর সত্তায় নিজেই প্রশংসিত। তাঁর প্রশংসিত হওয়া এদের প্রশংসা করার ওপর নির্ভর করে না। এরা যদি ঈমান গ্রহণ করে তাতে আল্লাহর কোন উপকার হবে না। বরং তাতে তাদের নিজেদেরই উপকার হবে। আর যে পর্যন্ত না তারা হযরত ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মত আল্লাহর দুশমনদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন না করবে সে পর্যন্ত তারা নিজেদের ঈমান দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না।

إِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَأَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করছেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেছে, বাড়ীঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারাই জালেম।[১৩]

১১. পূর্বোল্লেখিত আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে তাদের আত্মীয়–স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল প্রকৃত ঈমানদারগণ অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে যদিও তা মেনে চলছিলেন, কিন্তু নিজের মা, বাপ, ভাই, বোন এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কত কঠিন কাজ এবং এ কাজ ঈমানদারদের মন মানসিকতার জন্য কতটা দুর্বিসহ তা আল্লাহ ভাল করেই জানতেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই বলে সান্তনা দিয়েছেন যে, সেই সময় বেশী দূরে নয়, যখন তোমাদের এসব আত্মীয়–স্বজন ইসলাম গ্রহণ করবে এবং বর্তমান সময়ের এই শত্রুতা ভবিষ্যতে আবার ভালবাসায় রূপান্তরিত হবে। যে সময় একথা বলা হয়েছিল সে সময় কারো পক্ষেই বুঝে ওঠা সম্ভব ছিল না তা কিভাবে হবে। কিন্তু এসব আয়াত নাযিলের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই মক্কা বিজিত হলো, এ সময় কুরাইশরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকল এবং মুসলমানগণ দিব্যি দেখতে পেল, যে বিষয়ের আশাবাদ তাদের শুনান হয়েছিল তা কিভাবে বাস্তব রূপ লাভ করল।

১২. এখানে কারো মনে এরূপ সংশয় দেখা দিতে পারে যে, যেসব কাফের শত্রুতা করছে না তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ব্যাপারটি তো যুক্তিসংগত। কিন্তু ইনসাফও কি শুধু তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। কাফেরদের মধ্যে যারা শত্রু তাদের সাথে কি বেইনসাফী করতে হবে? এর জবাব হলো, পূর্বাপর এই প্রসংগের মধ্যে ইনসাফ কথাটি প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে ইনসাফ কথাটির অর্থ হলো, যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করে না ইনসাফের দাবী হলো তোমরাও তার সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করবে না। শত্রু এবং অশত্রুকে একই মর্যাদা দেয়া এবং উভয়ের সাথে একই আচরণ করা ইনসাফ নয়। ঈমান আনার কারণে যারা তোমাদের ওপরে জুলুম–নির্যাতন চালিয়েছে। স্বদেশ ও জন্মভূমি ছাড়তে বাধ্য করেছে এবং বের করে দেয়ার পরও তোমাদের পেছনে লেগে থাকতে ছাড়েনি তাদের সাথে কঠোর আচরণ করার অধিকার তোমাদের আছে। কিন্তু যারা এসব জুলুম–অত্যাচারে কোনভাবে শরীক হয়নি তোমরা তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে এবং আত্মীয়তা ও ভ্রাতৃ সম্পর্কের কারণে তোমাদের ওপরে তাদের যেসব অধিকার বর্তায় তা পূরণ করতে কার্পণ্য করবে না।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

হে ঈমানদাররা, ঈমানদার নারীরা যখন হিজরাত করে তোমাদের কাছে আসবে তখন (তাদের ঈমানদার হওয়ার বিষয়টি) পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নাও। তাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা অবশ্য আল্লাহই ভাল জানেন। অতপর যদি তোমরা বুঝতে পার যে, তারা সত্যিই ঈমানদার তাহলে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিও না।[১৪] না তারা কাফেরদের জন্য হালাল না কাফেররা তাদের জন্য হালাল। তাদের কাফের স্বামীরা তাদেরকে যে মোহরানা দিয়েছে তা তাদের ফিরিয়ে দাও। তাদেরকে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করায় তোমাদের কোন গোনাহ হবে না।[১৫] আর তোমরা নিজেরাও কাফের নারীদেরকে নিজেদের বিয়ের বন্ধনে আটকে রেখো না। নিজেদের কাফের স্ত্রীদের তোমরা যে মোহরানা দিয়েছ তা ফেরত চেয়ে নাও। আর কাফেররা তাদের মুসলমান স্ত্রীদের যে মোহরানা দিয়েছে তাও যেন তারা ফেরত চেয়ে নেয়।[১৬] এটি আল্লাহর নির্দেশ। তিনি তোমাদের সবকিছুর ফায়সালা করেন। আল্লাহ জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।

১৩. পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো সে বিষয়ে লোকের মধ্যে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারত যে, তাদের কাফের হওয়ার কারণেই বুঝি এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই এ আয়াতগুলোতে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের কুফরী এর মূল কারণ নয়। বরং ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের সাথে তাদের শত্রুতা ও নির্যাতনমূলক আচরণই এর মূল কারণ। অতএব, মুসলমানদের উচিত শত্রু কাফের এবং অশত্রু কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য করা, আর যেসব কাফের কখনো তাদের কোন ক্ষতি করেনি তাদের সাথে ইহসান ও অনুগ্রহের আচরণ করা উচিত। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর এবং তাঁর মায়ের ঘটনাটি এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। হযরত আবু বকরের (রা) এক স্ত্রী কুতাইলা বিনতে আবদুল উয্যা কাফের ছিলেন এবং হিজরাতের পর মক্কায়

থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর গর্ভেই হযরত আসমা জন্ম লাভ করেছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মদীনা এবং মক্কার মধ্যে যাতায়াত শুরু হলে তিনি মেয়েকে দেখার জন্য কিছু উপহার সামগ্রী নিয়ে মদীনায় হাজির হলেন। হযরত আসমার (রা) নিজের বর্ণনা হলো ঃ আমি গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমি কি আমার মায়ের সংগে দেখা করব? আর আমি কি তার সাথে আপনজনের মত সদাচরণও করব? জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি তার সাথে আপনজনদের মত সদাচরণ কর। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম) হযরত আসমার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এ ঘটনাটি আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে বলছেন, প্রথমে হযরত আসমা মায়ের সাথে সাক্ষাত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। পরে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সা) অনুমতি পাওয়ার পর তিনি তার সাথে দেখা করেছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম) এ থেকে স্বতঃই যে সিদ্ধান্তলাভ করা যায় তা হলো ইসলামের দুশমন না হলে কাফের পিতা মাতার খেদমত করা এবং কাফের ভাইবোন ও আত্মীয়–স্বজনকে সাহায্য করা একজন মুসলমানের জন্য সম্পূর্ণরূপে জায়েয। একইভাবে গরীব ও অসহায় জিম্মিদের জন্য সাদকার অর্থও খরচ করা যেতে পারে। (আহকামুল কুরআন—জাসসাস, রুহুল মায়ানী)

১৪. এই নির্দেশের পটভূমি হলো, হুদাইবিয়ার সন্ধির পর প্রথম প্রথম মুসলমানরা মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় এসে হাজির হতে থাকল এবং সন্ধির শর্ত মোতাবেক তাদেরকে যথারীতি ফেরত পাঠান হতে থাকল। এরপর মুসলিম নারীদের আগমন শুরু হলো এবং সর্বপ্রথম উম্মে কুলসূম বিনতে উকবা ইবনে আবু মু'আইত হিজরত করে মদীনায় এসে পৌঁছলেন। কাফেররা চুক্তির কথা বলে তাকেও ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানাল। উম্মে কুলসূমের দুই ভাই ওয়ালীদ ইবনে উকবা এবং উমারা ইবনে উকবা তাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য মদীনায় হাজির হলো। তখন এ মর্মে প্রশ্ন দেখা দিল যে, হুদাইবিয়ার সন্ধি নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে কি না? এখানে আল্লাহ তা'আলা এ প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে বলেছেন ঃ যদি সে মুসলমান হয় এবং নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে সে ঈমানের জন্যই হিজরাত করে এখানে এসেছে অন্য কিছু তাকে এখানে আনেনি, তাহলে তাকে ফেরত পাঠান যাবে না।

এ ক্ষেত্রে হাদীসের শুধু ভাবার্থ বর্ণনা করার কারণে বড় রকমের একটা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে যার সমাধান হওয়া আবশ্যক। হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তাবলী সম্পর্কে হাদীসসমূহে আমরা যেসব বর্ণনা দেখতে পাই তার অধিকাংশই ভাবার্থের বর্ণনা। আলোচ্য শর্ত সম্পর্কিত কোন বর্ণনার ভাষা হলো ঃ

مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا -

"তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যদি আমাদের কাছে চলে আসে তাকে আমরা ফেরত পাঠাব না। কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে কেউ তোমাদের কাছে চলে গেলে তাকে তোমরা ফিরিয়ে দেবে।"

কোন বর্ণনার ভাষা হলো ঃ

مَنْ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ اَصْحَابِهٖ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهٖ رَدَّهٗ عَلَيْهِ –

"রসূলুল্লাহর (সা) কাছে তাঁর সাহাবীদের কেউ যদি তার অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে আসে তাহলে তিনি তাকে ফেরত পাঠাবেন।"

আবার কোন বর্ণনাতে আছে ঃ

مَنْ اَتٰى مُحَمَّدًا مِنْ قُرَيْشٍ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهٖ رَدَّهٗ عَلَيْهِمْ –

"কুরাইশদের কোন ব্যক্তি যদি তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলে যায় তাহলে তিনি তাকে কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠাবেন।"

এ সব রেওয়ায়াতের বর্ণনার ধরন থেকে আপনা আপনি এ কথা প্রকাশ পায় যে, মূলত চুক্তিতে সন্ধির শর্ত যে ভাষায় লেখা হয়েছিল এসব বর্ণনায় তা হুবহু উদ্ধৃত হয়নি। বরং বর্ণনাকারীগণ তার বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। আর বহু সংখ্যক রেওয়ায়াত যেহেতু এই প্রকৃতির তাই মুফাস্সির ও মুহাদ্দিসগণ বুঝে নিয়েছেন যে, চুক্তির মধ্যে সাধারণভাবে নারী ও পুরুষ উভয়ই অন্তরভুক্ত এবং চুক্তি অনুসারে নারীদের ফেরত পাঠানো কর্তব্য ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই যখন তারা আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ দেখতে পেলেন যে, ঈমানদার নারীদের ফেরত পাঠান যেন না হয়, তখন তাঁরা এর ব্যাখ্যা করলেন যে, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার নারীদের ক্ষেত্রে অন্তত চুক্তি ভঙ্গের ফায়সালা ও নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এটা সহজভাবে গ্রহণ করার মত কোন মামুলী বক্তব্য নয়। সন্ধি যদি প্রকৃতপক্ষে পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে সবার জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য হয়ে থাকে তাহলে একপক্ষ এক তরফাভাবে তাতে সংশোধনী যোগ করবে কিংবা নিজেদের পক্ষ থেকে তার কোন অংশ পরিবর্তন করে ফেলবে তা কি করে বৈধ হতে পারে? আর এরূপ করা হয়েছিল বলে যদি ধরেও নেয়া হয় তাহলে বড় বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এই যে, কুরাইশরা এর কোন প্রতিবাদই করল না। কুরাইশরা তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের প্রতিটি কথার সমালোচনা করার জন্য সর্বদা এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি সন্ধির শর্তাবলী স্পষ্ট লংঘন করেছেন এমন প্রমাণ পেশ করার সুযোগ পেলে তো তারা চিৎকার করে আসমান মাথায় তুলে নিত। কিন্তু কোন বর্ণনা থেকেই আমরা এ বিষয়ে আভাস পর্যন্ত পাই না যে, কুরআনের এই ফায়সালার বিরুদ্ধে তারা সামান্যতম আপত্তি বা প্রতিবাদ করেছে। এটি ছিল এমন একটি প্রশ্ন, যে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তা করা হলেও চুক্তির মূল ভাষা অনুসন্ধান করে এই জটিলতার সমাধান পেশ করার চেষ্টা করা হতো। কিন্তু অনেকে এদিকে লক্ষই করেননি। কেউ কেউ (যেমন কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী) লক্ষ করলেও তাঁরা কুরাইশদের আপত্তি ও প্রতিবাদ না করার কারণ হিসেবে এরূপ ব্যাখা পর্যন্ত করতে দ্বিধা করেননি যে, আল্লাহ তা'আলা মু'জিযার মাধ্যমে এ ব্যাপারে কুরাইশদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যা পেশ করে তাঁরা কিভাবে সন্তুষ্ট হতে পারলেন তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

আসল কথা হলো, সন্ধি চুক্তির এই শর্তটি মুসলমানদের পক্ষ থেকে নয়, কুরাইশদের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়েছিল। তাদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিনিধি সুহাইল ইবনে আমর চুক্তিপত্রে যে ভাষা লিপিবদ্ধ করেছিল তা ছিল ঃ

عَلٰى اَنْ لَا يَاْتِيْكَ مِنَّا رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلَّا رَدَدْتَهٗ اِلَيْنَا –

"আমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কোন পুরুষও যদি আসে আর সে যদি তোমাদের ধর্মের অনুসারীও হয় তাহলেও তোমরা তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবে।"

চুক্তির এই ভাষা বুখারী "কিতাবুশ্ শুরুতে বাবুশ শুরুত ফিল জিহাদ ওয়াল মুসালাহা" অনুচ্ছেদে মজবুত সনদে উদ্ধৃত হয়েছে। সুহাইল হয়তো 'রাজুল' (رجل) শব্দটি ব্যক্তি অর্থে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু এটি তার চিন্তা ও মন–মস্তিষ্ক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। চুক্তিপত্রে রাজুল শব্দটিই লেখা হয়েছিল আরবী ভাষায় যা পুরুষদের বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই উম্মে কুলসুম বিনতে উকবার প্রত্যর্পণের দাবী নিয়ে তার ভাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলে (ইমাম যুহরীর বর্ণনা অনুসারে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বললেন ঃ كان الشرط فى الرجال دون النساء এ শর্ত শুধু পুরুষদের ব্যাপারে ছিল, মেয়েদের ব্যাপারে ছিল না। (আহকামুল কুরআন—ইবনে আরাবী, তাফসীরে কাবীর—ইমাম রাযী)। তখন পর্যন্ত খোদ কুরাইশরাও এই ভুল ধারণার মধ্যে ছিল যে, নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সব ধরনের মুহাজিরদের বেলায় এ চুক্তি প্রযোজ্য। কিন্তু নবী (সা) যখন চুক্তির এই ভাষার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তখন তারা হতবাক ও লা–জওয়াব হয়ে গেল এবং বাধ্য হয়েই তাদেরকে এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হলো।

যে কোন স্ত্রীলোক মক্কা ছেড়ে মদীনায় আসুক না কেন এবং যে উদ্দেশ্যেই আসুক না কেন চুক্তির এই শর্ত অনুসারে তাকে প্রত্যর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানানোর অধিকার মুসলমানদের ছিল। কিন্তু ইসলাম আগ্রহী ছিল কেবলমাত্র ঈমানদার নারীদের নিরাপত্তা দান করতে। পালিয়ে আসা সব রকম স্ত্রীলোকের জন্য মদীনাকে আশ্রয় কেন্দ্র বানান ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, যেসব স্ত্রীলোক হিজরাত করে আসবে এবং তাদের ঈমানদার হওয়ার কথা প্রকাশ করবে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এ বিষয়ে নিশ্চিত হও যে, প্রকৃতই তারা ঈমান গ্রহণ করে এখানে চলে এসেছে। এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর আর তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দিও না। আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ কার্যকরী করার জন্য যে নিয়ম পদ্ধতি রচনা করা হয়েছিল তা হলো, যেসব স্ত্রীলোক হিজরাত করে মদীনায় চলে আসত তাদেরকে এ মর্মে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো যে, তারা সত্যিই আল্লাহর একত্ব এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে কি না এবং কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হিজরাত করেছে কি না? ব্যাপারটা এমন নয়তো যে, সে স্বামীর প্রতি বিরূপ ও বিরক্ত হয়ে রাগে বা অভিমানে ঘর ছেড়ে চলে এসেছে? কিংবা আমাদের এখানকার কোন পুরুষের প্রতি তার ভালবাসা ও অনুরাগ তাকে নিয়ে এসেছে? কিংবা অন্য কোন পার্থিব স্বার্থ তার এ কাজের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে? যেসব স্ত্রীলোকেরা এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারত শুধু তাদেরকেই থাকতে দেয়া হতো এবং অবশিষ্ট সবাইকে ফিরিয়ে দেয়া হতো। (ইবনে জারীর—ইবনে আব্বাসের বর্ণনার বরাত দিয়ে কাতাদা, মুজাহিদ, ইকরিমা, ইবনে যায়েদ)।

এ আয়াতে সাক্ষদান আইনেরও একটা মূলনীতি ও সূত্র বর্ণনা করা হয়েছে আর তা কার্যকরী করার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কর্মপদ্ধতি ঠিক করে দিয়েছিলেন তা থেকে এর আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যা হয়ে গিয়েছে। আয়াতটিতে তিনটি কথা বলা হয়েছে। এক, হিজরাতকারিণী যেসব স্ত্রীলোক নিজেদেরকে ঈমানদার হিসেবে পেশ করবে তাদের ঈমানের বিষয়টি খোঁজ খবর নিয়ে দেখ। দুই, তাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তারা প্রকৃতই ঈমান গ্রহণ করেছে কি না তা জানার কোন উপায় বা মাধ্যম তোমাদের কাছে নেই। তিন, যাঁচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে যখন তোমরা জানতে পারবে যে তারা ঈমানদার, তাহলে তাদেরকে ফেরত পাঠাবে না। তাছাড়াও এই নির্দেশ অনুসারে ঐ সব স্ত্রীলোকদের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য নবী (সা) যে পদ্ধতি ঠিক করেছিলেন তা ছিল এই যে, সেসব মহিলাদের শপথভিত্তিক বক্তব্য বিশ্বাস করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, তাদের হিজরাত করার পেছনে উদ্বুদ্ধকারী শক্তি ঈমান ছাড়া অন্য কিছুই না। এ থেকে প্রথমত যে নীতিটি জানা গেল তাহলো মামলাসমূহের ফায়সালা করার জন্য প্রকৃত ঘটনা কি তা জানা থাকা আদালতের জন্য জরুরী নয়। বরং সাক্ষের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানই এ জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয়ত, যে কথাটি জানা গেল তা হলো, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা তার শপথ ভিত্তিক বক্তব্যের ওপর বিশ্বাসস্থাপন করব। তৃতীয়ত, যে কথাটি জানা গেল, কোন ব্যক্তি তার আকীদা–বিশ্বাস ও ঈমান সম্পর্কে নিজে যে কথা বলছে আমরা তা গ্রহণ করব এবং সে যা বলছে তার আকীদা–বিশ্বাস সত্যিই তাই কি না তা খুঁজে বেড়াতে শুরু করব না। তবে তার বক্তব্যের বিপরীত কোন স্পষ্ট প্রমাণ যদি আমাদের সামনে প্রকাশ পায় তাহলে ভিন্ন কথা। আর চতুর্থ আরেকটি কথা হলো, কোন ব্যক্তির যেসব একান্ত ব্যক্তিগত কথা অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয় সেসব ব্যাপারে তার নিজের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করা হবে। যেমন ঃ তালাক ও ইদ্দতের ব্যাপারে এবং মেয়েদের মাসিক ও পবিত্রতার ব্যাপারে তার নিজের বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে। এ ক্ষেত্রে সে সত্য মিথ্যা যাই বলুক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। এ নীতি অনুসারে "ইলমে হাদীস" বা হাদীসশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও সেসব বর্ণনা গ্রহণ করা হবে যার বর্ণনাকারীগণের বাহ্যিক অবস্থা তাদের সত্যবাদী হওয়ার প্রমাণ দেয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কোন বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার পথে কোন প্রমাণ বা ইংগিত বাধা হয়ে না দাঁড়ায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করা হবে।

১৫. এর অর্থ হলো, তাদের কাফের স্বামীদেরকে তাদের যে মোহরানা ফেরত দেয়া হবে সেটিই ঐ সব মেয়েদের মোহরানা হিসেবে গণ্য হবে না। বরং এখন যে কোন মুসলমানই তাদের কাউকে বিয়ে করতে চাইবে সে তাকে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করবে।

১৬. এসব আয়াতে চারটি বড় বড় নির্দেশের উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের পারিবারিক এবং আন্তর্জাতিক এই উভয় আইনের সাথেই এ চারটি নির্দেশ সম্পর্কিত।

প্রথম নির্দেশটি হলো, যে স্ত্রীলোক মুসলমান হয়ে যায় সে তার কাফের স্বামীর জন্য হালাল থাকে না আর তার কাফের স্বামীও তার জন্য হালাল থাকে না।

দ্বিতীয় নির্দেশটি হলো, যে বিবাহিতা নারী মুসলমান হয়ে দারুল কুফর থেকে হিজরাত করে দারুল ইসলামে আসে তার বিবাহ বন্ধন আপনা থেকেই ছিন্ন হয়ে যায় এবং ইচ্ছা করলে যে কোন মুসলমানই মোহরানা দিয়ে তাকে বিয়ে করতে পারে।

তৃতীয় নির্দেশটি হলো, কোন পুরুষ লোক মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর তার স্ত্রী যদি কাফেরই থেকে যায় তাহলে ঐ স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে আটকে রাখা তার জন্য জায়েয নয়।

চতুর্থ নির্দেশটি হলো, দারুল কুফর ও দারুল ইসলামের মধ্যে যদি সন্ধি চুক্তি বর্তমান থাকে তাহলে কাফেরদের যেসব বিবাহিত স্ত্রী হিজরাত করে দারুল ইসলামে চলে এসেছে মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের মোহরানা ফিরিয়ে দেয়া এবং মুসলমানদের সাথে বিবাহিত যেসব কাফের স্ত্রী দারুল কুফরে রয়ে গিয়েছে তাদেরকে প্রদত্ত মোহরানা কাফেরদের পক্ষ থেকে ফিরে পাওয়ার জন্য ইসলামী সরকারকে দারুল কুফরের সরকারের সাথে বিষয়টির ফায়সালা করার চেষ্টা করতে হবে।

এসব নির্দেশের ঐতিহাসিক পটভূমি হলো, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এমন অনেক পুরুষ ছিল যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাদের স্ত্রীরা ইসলাম গ্রহণ করেনি। আবার এমন অনেক স্ত্রীলোকও ছিল যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাদের স্বামীরা ইসলাম গ্রহণ করেনি। খোদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক মেয়ে হযরত যয়নবের (রা) স্বামী আবুল আস ছিলেন অমুসলিম এবং কয়েক বছর পর্যন্ত অমুসলিমই রয়ে গিয়েছিলেন। মুসলমান নারীদের জন্য তাদের কাফের স্বামী এবং মুসলমান স্বামীদের জন্য তাদের মুশরিক স্ত্রী হালাল নয় এমন কোন নির্দেশও ইসলামের প্রাথমিক যুগে হয়নি। তাই তাদের মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। হিজরাতের পরেও কয়েক বছর পর্যন্ত এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। এ সময় বহু সংখ্যক নারী মুসলমান হওয়ার পর হিজরাত করে চলে এসেছিল। কিন্তু তাদের কাফের স্বামীরা দারুল কুফরেই থেকে গিয়েছিল। আবার বহু সংখ্যক মুসলমান পুরুষ হিজরাত করে চলে এসেছিল। কিন্তু তাদের কাফের স্ত্রীরা দারুল কুফরেই রয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাদের বিবাহ বন্ধন অবশিষ্ট ছিল। এতে বিশেষভাবে মহিলাদের জন্য বড় ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছিল। কারণ, পুরুষরা তো দ্বিতীয় বিয়েও করতে পারে। কিন্তু মহিলাদের জন্য তা সম্ভব ছিল না। পূর্ব স্বামীর সাথে তার বিয়ে বাতিল না হওয়া পর্যন্ত সে অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত না। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর এসব আয়াত নাযিল হলে মুসলমান এবং কাফের ও মুশরিকদের মধ্যকার পূর্বের দাম্পত্য সম্পর্ক বাতিল করে দেয়া হয় এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্য একটা অকাট্য ও সুস্পষ্ট আইন তৈরী করে দেয়া হয়। ফিকাহবিদগণ এ আইনটিকে চারটি বড় বড় অনুচ্ছেদে সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করে দিয়েছেন।

একটি অবস্থা হলো, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি দারুল ইসলামে অবস্থানকারী হয় এবং তাদের মধ্যে একজন মুসলমান হয়ে যায় আর অপরজন কাফেরই থেকে যায়।

দ্বিতীয় অবস্থা হলো, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি দারুল কুফরে অবস্থানকারী হয় এবং তাদের একজন মুসলমান হয়ে যায় কিন্তু অপরজন কাফেরই থেকে যায়।

তৃতীয় অবস্থা হলো, স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন যদি মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে হিজরাত করে আসে এবং অপরজন দারুল কুফরে কাফের হিসেবেই থেকে যায়।

চতুর্থ অবস্থা হলো, মুসলমান স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন একজন যদি মুরতাদ হয়ে যায়।

এই চারটি অবস্থা সম্পর্কে ফিকাহবিদগণের কার কি মত আমরা তা আলাদা আলাদাভাবে নীচে বর্ণনা করছি।

এক ঃ প্রথম ক্ষেত্রে স্বামী যদি ইসলাম গ্রহণ করে আর স্ত্রী খৃষ্টান কিংবা ইহুদী হয় এবং সে তার ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে উভয়ের বিবাহ বন্ধন বহাল থাকবে। কারণ মুসলমান পুরুষের জন্য আহলে কিতাব স্ত্রী গ্রহণ করা বা থাকা জায়েয। এ বিষয়ে সমস্ত ফিকাহবিদ একমত।

আর ইসলাম গ্রহণকারী পুরুষের স্ত্রী যদি আহলে কিতাব না হয় এবং সে তার ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে সে সম্পর্কে হানাফীদের বক্তব্য হলো ঃ স্ত্রীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হবে। সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে বিয়ে বহাল থাকবে। আর যদি সে ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান হবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নির্জনবাস হয়ে থাকলে স্ত্রী মোহরানা লাভের অধিকারীনী হবে এবং নির্জনবাস না হয়ে থাকলে মোহরানা লাভের কোন অধিকার তার থাকবে না। কারণ তার অস্বীকৃতির কারণেই বিচ্ছেদ ঘটেছে। (আল মাবসূত, হিদায়া, ফাতহুল কাদীর) ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ বলেন ঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি নির্জনবাস না হয়ে থাকে তাহলে পুরুষের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে স্ত্রী তার বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি নির্জনবাস হয়ে থাকে তাহলে তিনবার মাসিক আসা পর্যন্ত স্ত্রী তার বিবাহ বন্ধনে থাকবে। এ সময়ের মধ্যে সে যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে বিয়ে বহাল থাকবে। অন্যথায়, তৃতীয় বার মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার সাথে সাথেই আপনা থেকেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র) একথাও বলেন যে, আমাদের পক্ষ থেকে যিম্মীদেরকে তাদের ধর্মীয় কাজে হস্তক্ষেপ না করার যে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে নারীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করাও ঠিক হবে না। কিন্তু বাস্তবে এটা একটা দুর্বল যুক্তি। কারণ একজন যিম্মী নারীকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হলে তখনই কেবল তা তার ধর্ম মতে বাধা সৃষ্টি করা বলে গণ্য হবে। তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে তোমার স্বামীর সাথে থাকতে পারবে অন্যথায় তোমাকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে, শুধু এই কথাটি তাকে বলা তার ধর্মমতে কোন প্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপ নয়। হযরত আলীর (রা) খিলাফত কালে এ ধরনের একটি ঘটনার নজীর পাওয়া যায়। তখন ইরাকের একজন অগ্নিপূজক জমিদার ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু তার স্ত্রী কাফেরই থেকে যায়। হযরত আলী (রা) তার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দিলেন। (আল মাবসূত) ইমাম মালেক (র) বলেন ঃ যদি নির্জনবাস না হয়ে থাকে তাহলে পুরুষের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তার কাফের স্ত্রী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তবে যদি নির্জনবাস না হয়ে থাকে তাহলে নারীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হবে। সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। (আল মুগনী ইবনে কুদামা)।

পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্বামী কাফের থেকে যায় তাহলে সে আহলে কিতাব হোক বা না হোক এবং উভয়ের নির্জনবাস হয়ে থাক বা না থাক হানাফীদের মতে সর্বাবস্থায় স্বামীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হবে। সে ইসলাম গ্রহণ করলে নারী তার বিবাহ বন্ধনে বহাল থাকবে এবং অস্বীকৃতি জানালে কাজী তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন। ইসলামের দাওয়াত পেশ করার পর স্বামী যতক্ষণ পর্যন্ত

ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি না জানাবে ততক্ষণ পর্যন্ত নারী তার স্ত্রী থাকবে ঠিকই কিন্তু স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভের অধিকার তার থাকবে না। স্বামীর অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটবে তা হবে বায়েন তালাক হিসেবে। এমতাবস্থায় নির্জনবাস না হয়ে থাকলে নারী নির্ধারিত মোহরানার অর্ধেক পাওয়ার অধিকারী হবে। আর নির্জনবাস হয়ে থাকলে সম্পূর্ণ মোহরানা লাভের অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে ইদ্দতকালীন খোরপোষ লাভেরও অধিকারী হবে। (আল মাবসূত, হিদায়া, ফাতহুল কাদীর) ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে, নির্জনবাস না হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং নির্জনবাস হওয়ার ক্ষেত্রে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর বিবাহ বন্ধনে বহাল থাকবে। এই সময়ের মধ্যে যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে বিবাহ বহাল থাকবে। অন্যথায় ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কিন্তু নারীর বেলায় ইমাম শাফেয়ীর (র) যে মত ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে পুরুষের বেলায়ও তিনি সেই একই মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ তার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা জায়েয নয়। তবে এ মতটি অত্যন্ত দুর্বল। হযরত উমরের (রা) খিলাফতকালে এ ধরনের বেশ কিছু সংখক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ নারী ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং পুরুষকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে আর যখন সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তখন দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হলো। যেমন ঃ বনী তাগলেব গোত্রের জনৈকা খৃস্টান স্ত্রীলোকের ব্যাপারটি তার সামনে পেশ করা হলে তিনি স্বামীকে বললেন ঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। তা নাহলে আমি তোমাদের দু'জনকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেব। সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তিনি তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি দিয়ে দিলেন। বাহযুল মালিকের এক নওমুসলিম জমিদারনীর মামলা তাঁর কাছে পাঠান হলে এ মামলাতেও তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তার স্বামীর সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হোক। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ভাল কথা। অন্যথায় দু'জনের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান হোক। সাহাবায়ে কিরামের সামনেই এসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু কেউ ভিন্নমত পোষণ করেছেন বলে উল্লেখ নেই। (আহকামুল কুরআন জাস্সাস, আল মাবসূত, ফাতহুল কাদীর) এ ব্যাপারে ইমাম মালেকের (র) রায় হলো, স্ত্রী যদি নির্জনবাসের পূর্বেই মুসলমান হয়ে যায় তাহলে স্বামীর সামনে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত পেশ করতে হবে। সে যদি দাওয়াত গ্রহণ করে তাহলে উত্তম। অন্যথায় অবিলম্বে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। কিন্তু যদি নির্জনবাস হওয়ার পরে স্ত্রীলোকটি ইসলাম গ্রহণ করে থাকে তাহলে ইদ্দতের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকবে। অন্যথায় ইদ্দতের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। ইমাম আহমাদের (র) একটি মত ইমাম শাফেয়ীর (র) মতকে সমর্থন করে। তাঁর দ্বিতীয় মতটি হলো, নির্জনবাস হোক বা না হোক স্বামী এবং স্ত্রীর দীন বা ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া সর্বাবস্থায় তাৎক্ষণিক বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ বলে গণ্য হবে। (আল মুগনী)

দুই ঃ স্ত্রী যদি দারুল কুফরে ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্বামী কাফের থেকে যায় অথবা স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্ত্রী (যে খৃস্টান বা ইহুদী বরং আহলে কিতাব নয় এমন ধর্মের অনুসারী হয়) তার ধর্ম আঁকড়ে ধরে থাকে এমতাবস্থায় হানাফীদের মতে তাদের নির্জনবাস হোক বা না হোক স্ত্রীর তিনবার মাসিক না হওয়া কিংবা মাসিক রহিতা হয়ে

থাকলে তিন মাস অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটবে না। এ সময়ের মধ্যে অপরজনও মুসলমান হয়ে গেলে বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকবে। অন্যথায় এ সময় শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রেও ইমাম শাফেয়ী (র) নির্জনবাস হওয়া এবং না হওয়ার ক্ষেত্রে পার্থক্য করেন। তাঁর রায় হলো, নির্জনবাস যদি না হয়ে থাকে তাহলে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে বিচ্ছেদ সংঘটিত হবে। আর যদি নির্জনবাস হওয়ার পরে ধর্মের ভিন্নতা দেখা দিয়ে থাকে তাহলে ইদ্দতের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে বহাল থাকবে। এ সময়ের মধ্যে যদি অপরজন ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে ইদ্দত শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিয়েও বাতিল হয়ে যাবে। (আল মাবসূত, ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কুরআন জাস্‌সাস)

তিন ঃ যে ক্ষেত্রে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের ভিন্নতা হওয়ার সাথে সাথে দেশও ভিন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ তাদের কোন একজন কাফের অবস্থায় দারুল কুফরে থেকে যায় এবং অপরজন হিজরাত করে দারুল ইসলামে চলে আসে তাদের সম্পর্কে হানাফীদের বক্তব্য হলো তাদের বিবাহ বন্ধন আপনা থেকেই ছিন্ন হয়ে যাবে। হিজরাত করে অগমনকারী যদি নারী হয় তাহলে তার তখনই দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার থাকে। তাকে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। তবে স্ত্রীর সাহচর্য লাভ করতে হলে তার গর্ভে সন্তান আছে কিনা তা জানার জন্য একবার মাসিক আসা পর্যন্ত স্বামীকে অপেক্ষা করতে হবে। আর সে যদি গর্ভবতীও হয় তবুও বিয়ে হতে পারবে। তবে একান্ত নৈকট্য লাভের জন্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ মাসয়ালায় ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম আবু হানীফার সাথে শুধু এতটুকু ভিন্ন মত পোষণ করেছেন যে, নারীকে ইদ্দত পালন করতে হবে এবং গর্ভবতী হলে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে হতে পারবে না। (আল মাবসূত, হিদায়া, আহকামুল কুরআন জাস্‌সাস) ইমাম শাফেয়ী (র), ইমাম আহমাদ (র) এবং ইমাম মালেক বলেন ঃ এ ক্ষেত্রে দেশ ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে কিছুই এসে যায় না। বরং এ ক্ষেত্রে মূল জিনিস হলো ধর্মের ভিন্নতা। যদি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের এই ভিন্নতা সৃষ্টি হয় তাহলে দারুল ইসলামে ধর্মের ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে যে বিধান প্রযোজ্য এ ক্ষেত্রেও সেই একই বিধান প্রযোজ্য হবে। (আল মুগনী)।

হিজরাতকারিনী মুসলমান নারী সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র) তার পূর্বোল্লেখিত মতের সাথে সাথে এ মতও প্রকাশ করেন যে, সে যদি তার কাফের স্বামীর সাথে ঝগড়া–বিবাদ করে তার স্বামীত্বের অধিকার রহিত করার উদ্দেশ্যে এসে থাকে তাহলে দেশ ভিন্ন হওয়ার কারণে নয় বরং তার এই সংকল্প ও ইচ্ছার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে বিবাহ–বিচ্ছেদ ঘটবে । (আল মাবসূত, হিদায়া)।

কিন্তু কুরআন মজীদের আলোচ্য আয়াতটি সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার মতই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি হিজরাত করে আগমনকারী ঈমানদার নারীদের সম্পর্কে নাযিল করেছিলেন এবং তাদের ব্যাপারেই বলেছেন যে, তারা তাদের দারুল. কুফরে ছেড়ে আসা কাফের স্বামীদের জন্য এখন আর হালাল নয়। আর মোহরানা দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করার জন্য দারুল ইসলামের মুসলমানদের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অপর দিকে মুহাজির মুসলমানদের

সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের যেসব কাফের স্ত্রী দারুল কুফরে রয়ে গিয়েছে তাদেরকে তোমাদের বিবাহ বন্ধনে আটকে রেখ না। ঐ সব স্ত্রীদেরকে তোমরা যে মোহরানা দিয়েছ কাফেরদের থেকে তা চেয়ে নাও। এটা স্পষ্ট যে, শুধু দীন বা ধর্মের ভিন্নতার কারণে এ নির্দেশ দেয়া হয়নি। বরং যে অবস্থা ও পরিবেশ এসব হুকুমকে বিশেষ রূপ দান করেছে তাহলো দেশের ভিন্নতা। হিজরাতের কারণে কাফের স্বামীদের সাথে মুসলমান মেয়েদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন না হয়ে থাকলে তাদেরকে বিয়ে করার অনুমতি মুসলমানদের কি করে দেয়া যেতে পারে। তাও আবার এমনভাবে যে, এ অনুমতির ক্ষেত্রে ইদ্দত পালনের কোন ইংগিত পর্যন্ত নেই। অনুরূপ لا تمسكوا بعصم الكوافر এর নির্দেশ আসার পরও যদি মুসলমান মুহাজিরদের কাফের স্ত্রীরা তাদের বিবাহ বন্ধনের মধ্যেই থাকত তাহলে সংগে সংগে এ হুকুমও দেয়া হতো যে, তাদের তালাক দিয়ে দাও। কিন্তু এখানে সেদিকেও কোন ইংগিত দেয়া হয়নি। একথা নিঃসন্দেহে ঠিক যে, এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর হযরত উমর (রা), হযরত তালহা এবং আরো কিছু সংখ্যক মুহাজির তাঁদের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, এরূপ করা তাদের জন্য জরুরী হয়ে পড়েছিল এবং তাদের স্ত্রীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া না হওয়া তালাক দেয়ার ওপরেই নির্ভর করছিল। আর তারা তালাক না দিলে ঐসব স্ত্রী তাদের স্ত্রীই থেকে যেত।

এর জবাবে নবীর (সা) যুগের তিনটি ঘটনাকে নজীর হিসেবে পেশ করা হয়। এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেশের ভিন্নতার কারণে মু'মিন ও কাফের স্বামী স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন যে ঠিক রেখেছেন এসব ঘটনাকে তার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়। প্রথম ঘটনাটি হলো, মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে আবু সুফিয়ান মাররুয্ যাহরান (বর্তমান ওয়াদীয়ে ফাতেমা) নামক স্থানে মুসলিম সেনাদলের কাছে এসে সেখানে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর তাঁর স্ত্রী হিন্দ কাফের হিসেবে মক্কায়ই থেকে যায়। মক্কা বিজয়ের পর হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করে। আর বিয়ে নবায়ন না করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পূর্বের বিয়ে বহাল রাখেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো, মক্কা বিজয়ের পর ইকরিমা ইবনে আবু জাহল এবং হাকীম ইবনে হিযাম মক্কা থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু তাঁদের উভয়ের স্ত্রী তাঁদের চলে যাওয়ার পর মুসলমান হয়ে যান। এরপর তারা নবীর (সা) নিকট থেকে তাদের স্বামীর জন্য নিরাপত্তা নেন এবং গিয়ে তাদের নিয়ে আসেন। উভয়েই ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরও পূর্ব বিয়ে বহাল রাখলেন। তৃতীয় ঘটনাটি নবীর (সা) নিজের মেয়ে হযরত যয়নাবের (রা)। হযরত যয়নাব (রা) হিজরাত করে মদীনায় চলে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী আবুল আস কাফের হিসেবে মক্কায়ই থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাতে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াত হলো, তিনি ৮ম হিজরীতে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী (সা) তাঁদের বিয়েও নবায়ন করেননি বরং পূর্বের বিয়ের ভিত্তিতে নিজের মেয়েকে আবুল আসের স্ত্রী হিসেবে থাকতে দিয়েছেন। এসব ঘটনার মধ্যে প্রথম দু'টি ঘটনা প্রকৃতপক্ষে দেশ ভিন্ন হওয়ার পর্যায়ভুক্ত নয়। কারণ সাময়িকভাবে এক ব্যক্তির একদেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া দেশের ভিন্নতা নয়। কেবল সেই ক্ষেত্রেই দেশের ভিন্নতা হয় যখন কোন ব্যক্তি একদেশ ছেড়ে অন্য কোন দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং তার ও তার স্ত্রীর মধ্যে

বর্তমান কালের পরিভাষা অনুসারে জাতীয়তার (Nationality) পার্থক্য দেখা দেয়। এরপর থাকে কেবল সাইয়েদা যয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারটি। এ ব্যাপারে দু'টি রেওয়ায়াত আছে। একটি হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াত। ওপরে যার বরাত দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে আসের রেওয়ায়াত। ইমাম আহমাদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজা এটি উদ্ধৃত করেছেন। দ্বিতীয় এই রেওয়ায়াতটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় মোহরানা নির্ধারণ করে নতুনভাবে মেয়েকে আবুল আসের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। যারা স্বামী ও স্ত্রীর দেশ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার আইনগত প্রভাব অস্বীকার করেন রেওয়ায়াতের এই পার্থক্যের ক্ষেত্রে এই নজীরটি তাদের জন্য প্রথমত অকাট্য দলীল হতে পারে না। দ্বিতীয়ত তারা যদি ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতকেই বিশুদ্ধ বলে গুরুত্ব দেন তাহলে তা তাদের নিজেদেরই মতের বিরুদ্ধে চলে যায়। কারণ তাদের মতানুসারে যেসব স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে যদি তাদের নির্জনবাস হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীর তিনবার মাসিক হওয়া পর্যন্ত তাদের বিয়ে অক্ষুণ্ন থাকে। এই সময়ের মধ্যে অপরজনও ইসলাম গ্রহণ করলে বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকে। অন্যথায় তৃতীয় মাসিক আসলে বিবাহ বন্ধন আপনা থেকেই ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু হযরত যয়নাবের যে ঘটনাকে তারা দলীল হিসেবে পেশ করেন তাতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ার পর কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল। হযরত যয়নাবের হিজরাতের ছয় বছর পর আবুল আস ঈমান গ্রহণ করেছিলেন এবং কুরআনের যে নির্দেশ অনুসারে মুসলমান নারীদেরকে মুশরিকদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছিল তা তাঁর ঈমান গ্রহণের অন্তত দুই বছর পূর্বে নাযিল হয়েছিল।

চার ঃ চতুর্থ বিষয়টি মুরতাদ হওয়া সম্পর্কিত। এর একটি অবস্থা হলো স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মুরতাদ হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় অবস্থা হলো তাদের কোন একজনের মুরতাদ হয়ে যাওয়া আর অপরজনের মুসলমান থাকা।

স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে যদি একই সাথে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে শাফেয়ী এবং হাম্বলী উলামাদের মতে নির্জনবাসের পূর্বে এরূপ হলে তৎক্ষণাৎ আর নির্জনবাসের পরে হলে ইদ্দতের সময় শেষ হওয়া মাত্র মুসলিম থাকা অবস্থায় যে বিয়ে হয়েছিল তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে হানাফীদের মতে, যদিও তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাওয়াই সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তির দাবী কিন্তু হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে মুরতাদ হওয়ার যে ব্যাপক ফিতনা দেখা দিয়েছিল তাতে হাজার হাজার মানুষ মুরতাদ হওয়ার পর আবার মুসলমান হয়েছিল। সাহাবায়ে কিরাম তাদের কাউকেই বিয়ে নবায়নের জন্য নির্দেশ দেননি। তাই আমরা সাহাবীদের ঐকমত্য ভিত্তিক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সাধারণ যুক্তি ও বুদ্ধির বিপক্ষে একথা মেনে নিচ্ছি যে, স্বামী-স্ত্রীর এক সাথে মুরতাদ হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না। (আল মাবসূত, হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া)

স্বামী যদি মুরতাদ হয়ে যায় এবং স্ত্রী মুসলমান থাকে এমতাবস্থায় ইতিপূর্বে তাদের মধ্যে নির্জনবাস হয়ে থাক বা না থাক হানাফী ও মালেকীদের মতে তখনই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু শাফেয়ী এবং হাম্বলীগণ এ ক্ষেত্রে নির্জনবাসের পূর্বের ও পরের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। তাদের মতে, নির্জনবাসের পূর্বে যদি এরূপ হয়ে

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ⑪

তোমাদের কাফের স্ত্রীদেরকে দেয়া মোহরানার কিছু অংশ যদি তোমরা ফেরত না পাও এবং পরে যদি তোমরা সুযোগ পেয়ে যাও তাহলে যাদের স্ত্রীরা ওদিকে রয়ে গিয়েছে তাদেরকে তাদের দেয়া মোহরানার সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে দাও।[১৭] যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো তাকে ভয় করে চলো।

থাকে তাহলে বিবাহ বন্ধন তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যদি নির্জনবাসের পরে হয়ে থাকে তাহলে বিবাহ বন্ধন ইদ্দতের সময়–কাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকবে। সে যদি এ সময়ের মধ্যে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে বিবাহ ঠিক থাকবে। অন্যথায় ইদ্দতের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে তার মুরতাদ হওয়ার সময় থেকে বিয়ে বাতিল বলে ধরে নেয়া হবে। অর্থাৎ স্ত্রীকে নতুন করে আর কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। চারটি মযহাবের ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত যে, নির্জনবাসের পূর্বে এ ঘটনা ঘটে থাকলে স্ত্রী অর্ধেক মোহরানা এবং নির্জনবাসের পরে ঘটে থাকলে সম্পূর্ণ মোহরানা লাভের অধিকারী হবে।

আর স্ত্রী যদি মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে হানাফীদের পুরনো ফতোয়া হলো, বিয়ে তৎক্ষণাৎ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তীকালে বলখ ও সমরখন্দের আলেমগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে, স্ত্রী মুরতাদ হওয়ার সংগে সংগেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না। স্বামীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য স্ত্রীরা যাতে মুরতাদ হওয়ার পথ অনুসরণ না করে সেজন্যই তারা এ পন্থার সাহায্য নিয়েছেন। মালেকীদের ফতোয়াও অনেকটা এরূপ। তাঁরা বলেন ঃ যদি এমন ইংগিত পাওয়া যায় যে, স্ত্রী কেবলমাত্র স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পন্থা হিসেবে মুরতাদ হয়েছে তাহলে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হবে না। শাফেয়ী ও হাম্বলী মযহাবের মতে স্বামীর মুরতাদ হওয়ার ক্ষেত্রে যে আইন প্রযোজ্য স্ত্রীর মুরতাদ হওয়ার ক্ষেত্রেও সেই একই আইন প্রযোজ্য। অর্থাৎ নির্জনবাসের পূর্বে মুরতাদ হলে বিয়ে তৎক্ষণাৎ বাতিল হয়ে যাবে। আর নির্জনবাসের পরে মুরতাদ হলে ইদ্দতের সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে ঠিক থাকবে। এ সময়ের মধ্যে সে মুসলমান হয়ে গেলে দাম্পত্য বন্ধন অক্ষুণ্ন থাকবে। তা নাহলে ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার সাথে সাথে মুরতাদ হওয়ার সময় থেকে বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে। মোহরানার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, স্ত্রী যদি নির্জনবাসের পূর্বে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে সে মোহরানা আদৌ পাবে না। তবে সে যদি নির্জনবাসের পরে মুরতাদ হয়ে থাকে তাহলে সম্পূর্ণ মোহরানা লাভ করবে। (আল মাবসূত, হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, আল মুগনী, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া)।

১৭. এ ব্যাপারে দু'টি অবস্থা বিদ্যমান ছিল। এ দু'টি ক্ষেত্রেই এ আয়াতটি প্রযোজ্য ঃ একটি অবস্থা ছিল এই যে, যেসব কাফেরের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল মুসলমানরা তাদের সাথে বিষয়টির ফায়সালা করতে চাচ্ছিল এভাবে যে, যেসব স্ত্রীলোক হিজরাত করে আমাদের কাছে চলে এসেছে আমরা তাদের মোহরানা ফিরিয়ে দেব। আর আমাদের লোকদের যেসব কাফের স্ত্রী ওদিকে রয়ে গিয়েছে তোমরা তাদের মোহরানা ফিরিয়ে দাও। কিন্তু তারা এ প্রস্তাব গ্রহণ করল না। ইমাম যুহরী বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ অনুসারে আমল করার জন্য মুসলমানগণ সেই স্ত্রীদের মোহরানা ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল যারা মক্কায় কাফেরদের কাছে থেকে গিয়েছিল। কিন্তু যেসব স্ত্রীলোক হিজরাত করে মুসলমানদের কাছে চলে এসেছিল মুশরিকরা তাদের মোহরানা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানাল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন ঃ মুশরিকদেরকে মুহাজির মহিলাদের যে মোহরানা ফিরিয়ে দিতে হবে তা তাদের ফিরিয়ে দেয়ার পরিবর্তে মদীনাতেই জমা করা হোক এবং মুশরিকদের কাছে যেসব লোকের মোহরানা পাওনা আছে জমাকৃত এই অর্থ থেকে তাদের প্রত্যেককে কাফেরদের কাছে পাওনা অর্থের সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে দেয়া হোক।

দ্বিতীয় অবস্থাটি ছিল এই যে, যেসব কাফেরদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল না তাদের এলাকা থেকেও বেশ কিছু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে দারুল ইসলামে এসেছিল এবং তাদের কাফের স্ত্রীরা সেখানেই রয়ে গিয়েছিল। একই ভাবে কিছু কিছু মহিলাও মুসলমান হয়ে হিজরাত করে চলে এসেছিল। কিন্তু তাদের কাফের স্বামীরা সেখানেই রয়ে গিয়েছিল। তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়া হলো যে, দারুল ইসলামেই অদল-বদল করে বিষয়টি চুকিয়ে দেয়া হোক। কাফেরদের নিকট থেকে যখন কোন মোহরানা ফেরত পাওয়া যাচ্ছে না তখন তাদেরকেও কোন মোহরানা ফিরিয়ে দেয়া যাবে না। তার পরিবর্তে যেসব স্ত্রীলোক দারুল ইসলামে চলে এসেছে তাদের ফেরতযোগ্য মোহরানা সেই স্বামীদের দেয়া হোক যাদের স্ত্রীরা কাফেরদের সাথে তাদের এলাকায় রয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এভাবে যদি হিসেব সমান সমান না হয় এবং যেসব মুসলমানের স্ত্রীরা কাফেরদের সাথে রয়ে গিয়েছে তাদের পাওনা মোহরানা হিজরাত করে আসা মুসলমান মহিলাদের মোহরানার পরিমাণ থেকে বেশী হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধের সময় যে গনীমাতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হবে তা দ্বারা অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ করতে হবে। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তির অংশের মোহরানা পাওনা থেকে যেত নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম গনীমাতের মাল থেকে তার ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিতেন। (ইবনে জারীর) আতা, মুজাহিদ, যুহরী, মাসরূক, ইবরাহীম নাখায়ী, কাতাদা, মুকাতিল এবং দাহ্হাক এ নীতি গ্রহণ করেছেন । তাঁরা বলেন, যে লোকদের প্রাপ্য মোহরানা কাফেরদের কাছে রয়ে গিয়েছে কাফেরদের নিকট থেকে হস্তগত হওয়া গনীমাতের মালের মোটের ওপর থেকে তার সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ গনীমাত বন্টনের পূর্বে তাদের হাতছাড়া হওয়া মোহরানা তাদের দিয়ে দিতে হবে এবং তারপর গনীমাত বন্টিত হবে। আর তখন এসব লোকও অন্য সব মুজাহিদদের মত সমান অংশ লাভ করবে। কোন কোন ফকীহ একথাও বলেন যে, শুধু

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰۤى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

হে নবী, ঈমানদার নারীগণ যখন তোমার কাছে বাইয়াত গ্রহণের জন্য আসে[১৮] এবং এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না,[১৯] যিনা করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না[২০] সন্তান সম্পর্কে কোন অপবাদ তৈরী করে আনবে না[২১] এবং কোন ভাল কাজে তোমার অবাধ্য হবে না[২২] তাহলে তাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করো[২৩] এবং তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

গনীমাতের সম্পদ থেকেই নয়, বরং 'ফাই' এর অর্থ দ্বারাও এসব লোকের ক্ষতিপূরণ করা যেতে পারে। কিন্তু আলেমদের একটি বড় দল এই মতটি গ্রহণ করেননি।

১৮. আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে নাযিল হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে মক্কা বিজিত হলে কুরাইশরা বাইয়াতের জন্য দলে দলে রসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে হাজির হতে থাকল। তিনি নিজে সাফা পাহাড়ের ওপর পুরুষদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করলেন এবং তাঁর নিজের পক্ষ থেকে মহিলাদের 'বাইয়াত' গ্রহণ করতে এবং এ আয়াতে যে বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নিতে হযরত উমরকে (রা) নির্দেশ দিলেন। (ইবনে আব্বাসের বর্ণনা সূত্রে ইবনে জারীর, কাতাদার বর্ণনা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম) এরপর তিনি মদীনায় ফিরে গিয়ে আনসারী মহিলাদের এক জায়গায় জমায়েত করার নির্দেশ দিলেন এবং তাদের বাইয়াত গ্রহণের জন্য হযরত উমরকে (রা) পাঠালেন। (ইবনে জারীর, ইবনে মারদইয়া, বায্যার, ইবনে হিব্বান উম্মে আতিয়া আনসারিয়ার বর্ণনা সূত্রে) তিনি ঈদের দিনেও পুরুষদের সমাবেশে বক্তৃতা করার পর মহিলাদের সমাবেশে গিয়েছেন এবং সেখানেও বক্তৃতার মধ্যে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। এর মধ্যে যেসব বিষয়ের উল্লেখ আছে সেসব বিষয়ে তিনি মহিলাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। (বুখারী ইবনে আব্বাসের বর্ণনা সূত্রে) এসব ক্ষেত্র ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মহিলারা ব্যক্তিগতভাবেও এবং সমষ্টিগতভাবেও তাঁর কাছে হাজির হয়ে বাইয়াত গ্রহণ করত যা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

১৯. মক্কায় যে সময় মহিলাদের নিকট থেকে বাইয়াত নেয়া হচ্ছিল সেই সময় হযরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা এই নির্দেশটির ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, আবু সুফিয়ান কিছুটা

কৃপণ প্রকৃতির লোক। আমি যদি তাকে না জানিয়ে আমার এবং আমার সন্তানদের প্রয়োজন পূরণের জন্য তার সম্পদ থেকে কিছু নেই তাতে কি আমার কোন গোনাহ হবে? তিনি বললেন ঃ না, তবে ন্যায়সংগত সীমার মধ্যে থেকে। অর্থাৎ ঠিক এতটা অর্থ নাও যা প্রকৃত অর্থে বৈধ প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট । (আহকামুল কুরআন, ইবনে আরাবী)।

২০. গর্ভপাত ঘটানোও এর অন্তরভুক্ত তা বৈধ গর্ভ বা অবৈধ গর্ভ যাই হোক না কেন।

২১. এর দ্বারা দুই প্রকারের অপবাদ বুঝানো হয়েছে। এক, কোন নারীর অন্য কোন নারীর প্রতি পরপুরুষের সাথে প্রেম-প্রণয় করার অপবাদ আরোপ করা এবং এ ধরনের কল্পকাহিনী মানুষের মধ্যে ছড়ান। কারণ এসব কথা বলে বেড়ানোর একটা রোগ মহিলাদের মধ্যে দেখা যায়। দুই, কোন নারীর অন্য পুরুষের ঔরসজাত সন্তান প্রসব করে স্বামীকে বিশ্বাস করানো যে, সেটা তারই সন্তান—এটাও অপবাদের অন্তরভুক্ত। আবু দাউদে হযরত আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবীকে (সা) বলতে শুনেছেন যে, যে নারী কোন পরিবারে এমন কোন সন্তান প্রবেশ করায় যে সেই বংশের সন্তান নয়, সেই নারীর আল্লাহর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাকে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।

২২. সংক্ষিপ্ত এই আয়াতাংশে আইনের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয় বর্ণনা করা হয়েছেঃ

প্রথম বিষয়টি হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের ব্যাপারেও "ভাল কাজে আনুগত্য করা" কথাটি যোগ করা হয়েছে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এ বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ ছিল না যে, তিনি কখনো মুনকার বা মন্দ কাজের নির্দেশও দিতে পারেন। এভাবে আপনা থেকেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর আইন ও নির্দেশের বাইরে গিয়ে পৃথিবীতে কোন মানুষের আনুগত্য করা যেতে পারে না। কারণ আল্লাহর রসূলের আনুগত্যের ব্যাপারেও যখন মারূফ বা ভাল কাজ হওয়ার শর্তযুক্ত করা হয়েছে তখন শর্তহীন আনুগত্য লাভের মর্যাদা অন্য কারো কিভাবে থাকতে পারে। কিংবা তার এমন কোন নির্দেশ অথবা আইন অথবা নিয়ম-কানুন এবং আচার অনুষ্ঠানের আনুগত্য কিভাবে করা হবে যা আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী? এই মৌলিক নীতিটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

لَا طَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ ، اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ

"আল্লাহর নাফরমানী করে কারো আনুগত্য করা যেতে পারে না। মারূফ বা সুকৃতির কাজেই কেবল আনুগত্য করা যেতে পারে। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

বড় বড় জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীগণ এ আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে এই বিষয়টিকেই গ্রহণ করেছেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম বলেনঃ

"আল্লাহ তা'আলা একথা বলেননি যে, তারা যেন আদৌ তোমার নাফরমানী না করে, বরং বলেছেন যে, মারূফ বা ভাল কাজে তারা যেন তোমার নাফরমানী না করে। আল্লাহ তা'আলা যখন নবীর আনুগত্যের ক্ষেত্রে পর্যন্ত এ শর্ত যুক্ত করেছেন তখন মারূফ ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে অন্যদের আনুগত্য করা যাবে তা কি করে হতে পারে।" (ইবনে জারীর)

ইমাম আবু বকর জাস্সাস লিখছেন ঃ

আল্লাহ জানতেন, তাঁর নবী মারূফ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে নির্দেশ দেন না। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নবীর নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে গিয়ে মারূফ বা ভাল কাজের শর্ত আরোপ করেছেন। যাতে আল্লাহর আনুগত্যমূলক নির্দেশ না হওয়া সত্ত্বেও কেউ কখনো কোন রাজশক্তির আনুগত্যের অবকাশ খুঁজে বের করতে না পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ اَطَاعَ مَخْلُوْقًا فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ذٰلِكَ الْمَخلوق-

"যে ব্যক্তি স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর উক্ত সৃষ্টিকে কর্তৃত্ব দান করেন।" (আহকামুল কুরআন)

আল্লামা আলুসী বলেন ঃ

"যেসব মূর্খ মনে করে 'উলুল আমর' বা শাসন কর্তৃত্বের আনুগত্য শর্তহীন, এ নির্দেশ তাদের ধারণা প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ তা'আলা তো রসূলের নির্দেশের আনুগত্য করার জন্যও ভাল কাজের নির্দেশ হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। অথচ রসূল কখনো 'মারূফ' বা ভাল কাজের জন্য ছাড়া নির্দেশ দেন না। এর উদ্দেশ্য মানুষকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দেয়া যে, স্রষ্টার নাফরমানী করে কারো আনুগত্য করা জায়েয নয়।" (রূহুল মা'য়ানী)

এই নির্দেশটি প্রকৃতপক্ষে ইসলামে আইনের শাসনের (Rull of law) ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ। মৌলিক কথা হলো, ইসলামের পরিপন্থী প্রত্যেকটি কাজই অপরাধ এবং কাউকে এ ধরনের কাজ করতে নির্দেশ দেয়ার আইনগত অধিকার কারো নেই। যে ব্যক্তিই আইনের পরিপন্থী কোন কাজের নির্দেশ দেয় সে নিজেই একজন অপরাধী। আর যে ব্যক্তি সে নির্দেশ পালন করে সে–ও অপরাধী। অধীনস্ত কোন ব্যক্তিই এ যুক্তি দেখিয়ে শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে না যে, তার উর্ধতন কর্মকর্তা তাকে এমন একটি কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিল যা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আইনগত দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহলো এ আয়াতটিতে পাঁচটি নেতিবাচক নির্দেশ দেয়ার পর একটি মাত্র ইতিবাচক নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্দেশটি হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাল কাজের জন্য যেসব নির্দেশ দেবেন তার সবগুলোর আনুগত্য করা হবে। অন্যায় ও পাপ কাজ সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় জাহেলী যুগের মহিলারা বড় বড় যেসব অন্যায় ও গোনাহর কাজে জড়িত ছিল তার উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা থেকে বিরত থাকার জন্য তাদের কাছে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। কিন্তু ভাল কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তার কোন ফিরিস্তি দিয়ে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়নি যে, তোমরা অমুক অমুক কাজ করবে বরং শুধু এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে যে, নবী (সা) ভাল কাজ করার জন্য যে নির্দেশই দিবেন তোমাদেরকে তার আনুগত্য করতে হবে। এখন এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে যেসব নির্দেশ দিয়েছেন কেবল তাই যদি ভাল কাজ, হতো তাহলে প্রতিশ্রুতি নেয়া উচিত ছিল এই ভাষায় যে, তোমরা আল্লাহর নাফরমানী করবে না অথবা তোমরা কুরআনের নির্দেশসমূহ অমান্য করবে না। কিন্তু প্রতিশ্রুতি যখন এই ভাষায় নেয়া হয়েছে যে, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেক কাজের জন্য যে, নির্দেশই দেবেন তোমরা তা লংঘন করবে না"। সুতরাং আপনা থেকেই এর অর্থ দাঁড়ায় সমাজ সংস্কারের জন্য নবীকে (সা) ব্যাপক ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে এবং তাঁর সব নির্দেশই অবশ্য পালনীয়—কুরআন মজীদে তার উল্লেখ থাক বা না থাক।

আইনগত এই ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের ওপর ভিত্তি করেই বাইয়াত গ্রহণের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎকালীন আরব সমাজের মহিলাদের মধ্যে প্রসার লাভ করা বহুসংখ্যক অন্যায় ও পাপকাজ পরিত্যাগ করার জন্য প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন এবং এমন কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন যার উল্লেখ কুরআন মজীদে নেই। এ বিষয়ে জানার জন্য নিম্ন বর্ণিত হাদীসগুলো দেখুন ঃ

ইবনে আব্বাস (রা), উম্মে সালামা (রা) এবং উম্মে আতিয়া আনসারিয়া প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিতেন যে, তারা মৃতদের জন্য বিলাপ করে কাঁদবে না। বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী এবং ইবনে জারীর এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে বিস্তারিত উল্লেখ আছে যে, নবী (সা) হযরত উমরকে (রা) মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়ে বললেন ঃ তাদের বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করবে। কারণ জাহেলী যুগে মহিলারা মৃতদের জন্য বিলাপ করে কাঁদত এবং পরিধেয় পোশাক ছিঁড়ে ফেলত, মুখমন্ডল খামচাত, চুল কেটে ফেলত এবং খুব বেশী চিৎকার ও হা-হুতাশ করত। (ইবনে জারীর)

যায়েদ ইবনে আসলাম বর্ণনা করেন ঃ নবী (সা) বাইয়াত গ্রহণের সময় মহিলাদেরকে নিষেধ করেছেন, তারা যেন বিলাপ করে না কাঁদে, মুখমন্ডল না খামচায়, কাপড় না ছিঁড়ে, হা-হুতাশ ও আহাজারী না করে এবং কবিতা আবৃত্তি করে ইনিয়েবিনিয়ে না কাঁদে। (ইবনে জারীর) প্রায় অনুরূপ অর্থের একটি হাদীস ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে জারীর এমন একজন মহিলার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে নিজে বাইয়াত গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্তরভুক্ত ছিল।

কাতাদা এবং হাসান বসরী বলেন ঃ নবী (সা) মহিলাদের বাইয়াত নেয়ার সময় যেসব প্রতিশ্রুতি নিতেন তার মধ্যে একটি ছিল তারা বেগানা পুরুষের সাথে কথা বলবে না। ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, বেগানা পুরুষদের সাথে নির্জনে, একা একা কথা বলবে না। কাতাদা আরো স্পষ্ট করে বলেছেন যে, নবীর (সা) একথা শুনে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! অনেক সময় এ রকম অবস্থা দেখা দেয় যে, আমরা বাড়ীতে থাকি না। কেউ হয়তো তখন সাক্ষাতের জন্য আমাদের কাছে আসে। তিনি বললেন ঃ আমি এ অবস্থা বুঝাতে চাইনি। অর্থাৎ "বাড়ীতে কেউ নেই", কোন আগন্তুককে এতটুকু কথা বলা মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। (ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন)

হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার খালা উমাইমা (রা) বিনতে রুকাইকা থেকে হযরত আমর ইবনুল আস বর্ণনা করেছেন, নবী (সা) মহিলাদের থেকে এই মর্মে

প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, বিলাপ করে কাঁদবে না এবং জাহেলী যুগের মত সাজগোজ করে নিজেদের প্রদর্শন করবে না। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক খালা সালমা বিনতে কায়েস বলেন ঃ আমি বাইয়াতের জন্যে কয়েকজন আনসারী মহিলার সাথে তাঁর কাছে হাজির হলে তিনি কুরআনের এই আয়াত অনুসারে আমাদের থেকে বাইয়াত নিয়ে বললেন ঃ ولاتغششن ازواجكن "তোমাদের স্বামীর সাথে প্রতারণা করবে না।" ফিরে আসার মুহূর্তে এক মহিলা আমাকে বলল ঃ গিয়ে নবীকে (সা) জিজ্ঞেস করো স্বামীর সাথে প্রতারণা করা বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন? আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

تَاْخُذُ مَالَهُ فَتَحَابِىْ بِهٖ غَيْرَهُ

"স্বামীর টাকা পয়সা নিয়ে অন্যের জন্য ব্যয় করা।" (মুসনাদে আহমাদ)

উম্মে আতিয়া (রা) বলেন ঃ বাইয়াত গ্রহণের পর নবী (সা) আমাদের নির্দেশ দিলেন যে, আমরা দুই ঈদের জামায়াতে হাজির হব। তবে জুময়ার নামায আমাদের জন্য ফরয নয়। আর তিনি আমাদেরকে জানাযার সাথে যেতেও নিষেধ করলেন ।(ইবনে জারীর)

কিছু সংখ্যক লোক নবীর (সা) এই আইনগত ক্ষমতা ও ইখতিয়ারকে তাঁর রিসালাতের পদবী বা মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত করার পরিবর্তে তাঁর ইমারতের পদবী ও মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত করেন। তারা বলেন, তিনি যেহেতু তাঁর সময়ের শাসকও ছিলেন, তাই এই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকে যেসব নির্দেশ তিনি দিয়েছেন তা শুধু তাঁর যুগ পর্যন্তই অবশ্য পালনীয় ছিল। যারা একথা বলেন, তারা অত্যন্ত মূর্খতাপূর্ণ কথা বলেন। নবীর (সা) যেসব নির্দেশ আমরা ওপরে উদ্ধৃত করেছি সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন। এর মধ্যে নারী সমাজের সংস্কার ও সংশোধনের জন্য যেসব নির্দেশ তিনি দিয়েছেন তা যদি কেবল তদানীন্তন শাসক হিসেবেই তিনি দিতেন তাহলে চিরদিনের জন্য সারা দুনিয়ার মুসলিম সমাজের নারীদের মধ্যে এসব সংস্কার ও সংশোধন কি করে কার্যকর হতে পারতো? এ পৃথিবীতে এমন মর্যাদাবান কোন শাসক আছেন কি যে, একবার মাত্র তাঁর মুখ থেকে একটি নির্দেশ জারী হয়েছে আর সংগে সংগে গোটা দুনিয়ার যেখানে যেখানে মুসলিম জনবসতি আছে সেখানকার মুসলমান সমাজে চিরদিনের জন্য সেই সংস্কার ও সংশোধন জারী হয়ে গিয়েছে যা জারী করার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন? (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা হাশর, টীকা ১৫)

২৩. কিছু সংখ্যক নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মহিলাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের পদ্ধতি পুরুষদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন ছিল। পুরুষদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের পদ্ধতি ছিল এই যে, বাইয়াত গ্রহণকারী নবীর (সা) হাতে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করত। কিন্তু মহিলাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের সময় তিনি কখনো তাঁর হাত দিয়ে কোন মহিলার হাত ধরেননি বরং ভিন্ন পদ্ধতিতে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে যেসব হাদীস উল্লেখিত হয়েছে তা আমরা নীচে বর্ণনা করছি ঃ

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ "আল্লাহর শপথ, বাইয়াত গ্রহণের সময় নবীর (সা) হাত কোন মহিলার হাতকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণের সময় তিনি মুখে শুধু একথাটুকু বলতেন যে, আমি তোমার থেকে বাইয়াত নিয়েছি"। (বুখারী, ইবনে জারীর)

"উমাইমা বিনতে রুকাইকা বলেন ঃ আমি আরো কয়েকজন মহিলার সাথে বাইয়াতের জন্য নবীর (সা) খেদমতে হাজির হলে তিনি কুরআনের এই আয়াতের নির্দেশ অনুসারে আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন। যখন আমরা বললাম ঃ মা'রূফ বা ভাল কাজে আমরা আপনার নাফরমানী করব না"। তখন তিনি বললেনঃ فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ "যতটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে ও সাধ্যে কুলাবে।" আমরা বললাম ঃ আমাদের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আমাদের নিজেদের চেয়েও বেশী দয়াপরবশ।" তারপর আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল, হাত বাড়িয়ে দিন। আমরা আপনার হাতে বাইয়াত করব। তিনি বললেনঃ আমি মহিলাদের সাথে মোসাফাহা করি না। আচ্ছা, আমি তোমাদের থেকেও প্রতিশ্রুতি নেব। সুতরাং তিনি আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন। আর একটি হাদীসে তাঁর বর্ণনা হলো, নবী (সা) আমাদের মধ্যকার কোন মহিলার সাথেই মোসাফাহা করলেন না। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম)।

আবু দাউদ তাঁর 'মারাসীল' গ্রন্থে শা'বী থেকে রেওয়ায়াত করেছেন যে, মহিলাদের বাইয়াত নেয়ার সময় নবীর (সা) দিকে একখানা কাপড় এগিয়ে দেয়া হলো। তিনি শুধু তা হাতে নিলেন এবং বললেন ঃ আমি মহিলাদের সাথে মোসাফাহা করি না। ইবনে আবী হাতেম শা'বী থেকে, আবদুর রায্যাক নাখায়ী থেকে এবং সায়ীদ ইবনে মনসূর কায়েস ইবনে আবী হাযেম থেকে প্রায় একই বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছেন।

ইবনে ইসহাক মাগাযীতে আবান ইবনে সালেহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, মহিলাদের বাইয়াত নেয়ার সময় নবী (সা) পানির একটি পাত্রে নিজের হাত ডুবাতেন এবং মহিলারাও সেই একই পাত্রে হাত ডুবাতো।

বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ঈদের খুতবা দেয়ার পর নবী (সা) পুরুষদের কাতারের মধ্যে দিয়ে মহিলারা যেখানে বসে ছিল সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে বক্তৃতা করার সময় তিনি কুরআন মজীদের এ আয়াতটি পড়লেন। তারপর মহিলাদেরকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা কি এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো? সমাবেশের মধ্যে থেকে এক মহিলা জবাব দিল হাঁ, হে আল্লাহর রসূল, আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

ইবনে হিব্বান, ইবনে জারীর এবং বায্যার প্রমুখের একটি রেওয়ায়াতে উম্মে আতিয়া আনসারিয়ার একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যাতে বলা হয়েছে ঃ নবী (সা) ঘরের বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমরা ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু এ বক্তব্য থেকে একথা বুঝা যায় না যে, মহিলারা তাঁর সাথে মোসাফাহাও করেছিল। কেননা, হযরত উম্মে আতিয়া মোসাফাহা করার কথা স্পষ্ট করে বলেননি। সম্ভবত সে সময় অবস্থা ছিল এই যে, প্রতিশ্রুতি গ্রহণের সময় নবী (সা) বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকবেন এবং ভেতর থেকে মহিলারাও প্রত্যেকে তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকবে। কিন্তু তাদের কারো হাতই রসূলুল্লাহর (সা) হাত স্পর্শ করেনি।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْـَٔاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْقُبُورِ ﴿١٣﴾

হে ঈমানদারগণ, যাদের ওপর আল্লাহ গযব নাযিল করেছেন তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। আখেরাত সম্পর্কে তারা ঠিক তেমনি নিরাশ যেমন কবরস্থ কাফেরা নিরাশ।[২৪]

২৪. মূল ইবারত হলো ঃ

قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ –

এর দু'টি অর্থ হতে হতে পারে। একটি হলো, তারা আখেরাতের কল্যাণ ও সওয়াব থেকে ঠিক তেমনি নিরাশ হয়ে গিয়েছে যেমন আখেরাত অস্বীকারকারীরা তাদের কবরস্থ মৃত আত্মীয়–স্বজনদের পুনরায় জীবিত করে উঠান সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গিয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত হাসান বসরী, কাতাদা এবং দাহহাহ (র) এ অর্থটি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় অর্থটি হতে পারে, তারা আখেরাতের রহমত ও মাগফিরাত থেকে ঠিক তেমনি নিরাশ যেমন কবরে পড়ে থাকা কাফেররা সব রকমের কল্যাণ থেকে নিরাশ। কারণ, এ ব্যাপারে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, তাদেরকে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং হযরত মুজাহিদ, ইকরিমা, ইবনে যায়েদ, কালবী, মুকাতিল ও মনসূর রাহিমাহুমুল্লাহ থেকে এ অর্থটি বর্ণিত হয়েছে।

আস্‌ সফ্‌

৬১

নামকরণ

সূরার চতুর্থ আয়াতের يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا আয়াতাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যাতে 'সফ' শব্দটি আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এর নাযিল হয়ার সময়–কাল জানা যায় না। কিন্তু এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করলে অনুমান করা যায় যে, সূরাটি সম্ভবত ওহুদ যুদ্ধের সমসাময়িককালে নাযিল হয়ে থাকবে। কারণ এর মধ্যে যেসব পরিবেশ–পরিস্থিতির প্রতি ইংগিত রয়েছে। তা সেই সময়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হলো ঈমানের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে নিষ্ঠা ঐকান্তিকতা অবলম্বন এবং আল্লাহর পথে জীবন কুরবানী করতে উদ্বুদ্ধ করা। এতে দুর্বল ঈমানের মুসলমানদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। যারা ঈমানের মিথ্যা দাবী করে ইসলামে প্রবেশ করেছিল তাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে আবার যারা ঈমানের ব্যাপারে একনিষ্ঠ ছিল তাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন আয়াতে শুধু প্রথম দু'টি শ্রেণীকে সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন আয়াতে শুধু মুনাফিকদের সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোন আয়াতে নিষ্ঠাবান মু'মিনদের প্রতি লক্ষ করে কথা বলা হয়েছে। কোন্‌ স্থানে কাদের উদ্দেশে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তা বক্তব্যের ধরন থেকেই বুঝা যায়।

শুরুতেই সমস্ত ঈমানদারদের এই মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, যারা বলে এক কথা কিন্তু করে অন্য রকম কাজ, তারা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত। আর যারা ন্যায়ের পথে লড়াই করার জন্য মজবুত প্রাচীরের মত দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ তা'আলার নিকট তারা অত্যন্ত প্রিয়।

৫ থেকে ৭ আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের লোকদেরকে সাবধান করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল জাতি মূসা (আ) এবং ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে যে আচরণ করেছে তোমাদের রসূল এবং তোমাদের দীনের সাথে তোমাদের আচরণ সেই রকম হওয়া উচিত নয়। হযরত মূসা (আ) আল্লাহর রসূল একথা জানা সত্ত্বেও তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তারা তাঁকে কষ্ট–যন্ত্রণা দিয়েছে এবং হযরত ঈসার (আ) কাছ থেকে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখতে পাওয়ার পরও তাঁকে অস্বীকার করা থেকে বিরত হয়নি। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, ঐ জাতির

লোকদের মেজাজের ধরন–প্রকৃতিই বাঁকা হয়ে গিয়েছে এবং হিদায়াত লাভের তাওফিক বা শুভবুদ্ধি থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। এটা এমন কোন বাঞ্ছনীয় বা ঈর্ষণীয় অবস্থা নয় যে, অন্য কোন জাতি তা লাভের জন্য উদগ্রীব হবে।

এরপর ৮ ও ৯ আয়াতে চ্যালেঞ্জ করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টান এবং তাদের সাথে ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিকরা আল্লাহর এই নূরকে নিভিয়ে দেয়ার যতই চেষ্টা–সাধনা করুক না কেন তা পুরা শানশওকতের সাথে গোটা পৃথিবীতে অবশ্যই বিস্তার লাভ করবে। মুশরিকরা যতই অপছন্দ করুক না কেন আল্লাহর মহান রসূলের আনীত দীন বা জীবনব্যবস্থা অন্য সব জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবশ্যই বিজয়ী হবে।

অতপর ১০ থেকে ১৩ পর্যন্ত আয়াতে ঈমানদারদের বলা হয়েছে যে, দুনিয়া এবং আখেরাতে সফলতা লাভের পথ মাত্র একটি। তাহলো খাঁটি ও সরল মনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পর ঈমান আনো এবং জান–মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। এর ফল হিসেবে আখেরাতে পাবে আল্লাহর আঁযাব থেকে মুক্তি, গোনাহসমূহের মাগফিরাত এবং চিরদিনের জন্য জান্নাত। আর দুনিয়াতে পুরস্কার হিসেবে পাবে আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা এবং বিজয় ও সফলতা।

সূরার শেষে ঈমানদারদের বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে তাঁর হাওয়ারী বা সাহায্যকারীরা আল্লাহর পথে যেভাবে সহযোগিতা করেছে তারাও যেন অনুরূপভাবে 'আনসারুল্লাহ' বা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়ায় যাতে ইতিপূর্বে ঈমান আনয়নকারীগণ যেভাবে আল্লাহর সাহায্য–সহযোগিতা লাভ করেছিলেন তারাও কাফেরদের বিরুদ্ধে তেমনি সাহায্য–সহযোগিতা লাভ করতে পারে।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ① يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ② كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ④

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর তাসবীহ করেছে। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।[১]

হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা নিজেরা করো না? আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ যে, তোমরা এমন কথা বলো যা করো না।[২] আল্লাহ সেই সব লোকদের ভালবাসেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সিসা গলিয়ে ঢালাই করা এক মজবুত দেয়াল।[৩]

১. এটা এই ভাষণের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হাদীদের তাফসীর, টীকা ১ ও ২। এ ধরনের ভূমিকা দিয়ে বক্তব্য শুরু করার কারণ হলো, পরে যা বলা হবে তা শোনা বা পড়ার আগে মানুষ যাতে একথা ভালভাবে বুঝে নেয় যে, আল্লাহ তা'আলা অভাবহীন এবং অমুখাপেক্ষী। তাঁর প্রতি কারো ঈমান আনা, সাহায্য করা এবং ত্যাগ ও কুরবানী করার ওপর তাঁর কর্তৃত্ব নির্ভরশীল নয়। তিনি এর অনেক উর্ধে। তিনি যখন ঈমান গ্রহণকারীদের ঈমানের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়ার শিক্ষা দেন এবং বলেন, সত্যকে উন্নতশির করার জন্য জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করো তখন এ সব তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই বলেন। তাঁর ইচ্ছা তাঁর নিজের শক্তি ও ব্যবস্থাপনার সাহায্যেই বাস্তব রূপ লাভ করে। কোন বান্দা তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নে সামান্যতম তৎপরতাও যদি না চালায় বরং গোটা পৃথিবী সে পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকরও হয় তবুও তার নিজের শক্তি ও ব্যবস্থাপনা দ্বারা তা বাস্তব রূপ লাভ করে।

২. একথাটির একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ আছে যা এর শব্দসমূহ থেকেই প্রতিভাত হচ্ছে। এ ছাড়া একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষও আছে যা পরবর্তী আয়াতের সাথে

এটিকে মিলিয়ে পড়লে বুঝা যায়। প্রথম উদ্দেশ্য ও লক্ষ হলো, একজন খাঁটি মুসলমানের কথা ও কাজে মিল থাকা উচিত। সে যা বলবে তা করে দেখাবে। আর করার নিয়ত কিংবা সৎসাহস না থাকলে তা মুখেও আনবে না। এক রকম কথা বলা ও অন্য রকম কাজ করা মানুষের এমন একটি জঘন্য দোষ যা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করার দাবী করে তার পক্ষে এমন নৈতিক দোষ ও বদ স্বভাবে লিপ্ত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। নবী (সা) ব্যাখ্যা করে বলেছেন : কোন ব্যক্তির মধ্যে এরূপ স্বভাব থাকা প্রমাণ করে যে, সে মু'মিন নয় বরং মুনাফিক। কারণ তার এই স্বভাব মুনাফিকির একটি আলামত। একটি হাদীসে নবী (সা) বলেছেন :

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثَةٌ (زَادَ الْمُسْلِمُ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ) اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ (بخارى ، مسلم)

"মুনাফিকের পরিচয় বা চিহ্ন তিনটি (যদিও সে নামায পড়ে এবং মুসলমান হওয়ার দাবী করে)। তাহলো, সে কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং তার কাছে কোন আমানত রাখলে তার খিয়ানত করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি অন্য একটি হাদীসে বলেছেন :

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا؛ اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ ، وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (بخارى، مسلم)

"চারটি স্বভাব এমন যা কোন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া গেলে সে হবে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব পাওয়া যাবে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব বিদ্যমান। স্বভাবগুলো হলো, তার কাছে আমানত রাখা হলে সে খিয়ানত করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করলে নৈতিকতা ও দীনদারীর সীমালংঘন করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ বিষয়ে মোটামুটি একমত যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে যদি কোন ওয়াদা করে (যেমন কোন জিনিসের মানত করল) কিংবা মানুষের সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় অথবা কারো সাথে কোন বিষয়ে ওয়াদা করে আর তা যদি গোনাহর কাজের কোন প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা না হয় তাহলে পালন করা অবশ্য কতর্ব্য। তবে যে কাজের প্রতিশ্রুতি দেয়া বা ওয়াদা করা হয়েছে তা গোনাহর কাজ হলে সে কাজ করবে না ঠিকই কিন্তু তার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। সূরা মায়েদার ৮৯ আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। (আহকামুল কুরআন—জাস্সাস ও ইবনে আরাবী)।

এটা হলো এ আয়াতগুলোর সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ। এরপর থাকে এর সেই বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ, যে জন্য এ ক্ষেত্রে আয়াত কয়টি পেশ করা হয়েছে, পরবর্তী আয়াতটিকে

এর সাথে মিলিয়ে পড়লেই সেই বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ জানা যায়। যারা ইসলামের জন্য জীবনপাত করার লম্বা লম্বা ওয়াদা করতো কিন্তু চরম পরীক্ষার সময় আসলে জান নিয়ে পালাতো সেই সব বাক্যবাগিশদের তিরস্কার করাই এর উদ্দেশ্য। দুর্বল ঈমানের লোকদের এই দুর্বলতার জন্য কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। যেমন, সূরা নিসার ৭৭ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ তোমরা সেই সব লোকদের প্রতি কি লক্ষ করেছ যাদের বলা হয়েছিল, নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও। এখন যেই তাদেরকে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে অমনি তাদের একটি দল মানুষকে এমন ভয় করতে আরম্ভ করেছে যা আল্লাহকে করা উচিত কিংবা তার চেয়েও অধিক। তারা বলে ঃ হে আল্লাহ, আমাদের জন্য লড়াইয়ের নির্দেশ কেন লিপিবদ্ধ করে দিলে? আমাদেরকে আরো কিছুদিনের জন্য অবকাশ দিলে না কেন? সূরা মুহাম্মাদের ২০ আয়াতে বলেছেন ঃ যারা ঈমান এনেছে তারা বলছিল, এমন কোন সূরা কেন নাযিল করা হচ্ছে না (যার মধ্যে যুদ্ধের হুকুম থাকবে), কিন্তু যখন একটি সুস্পষ্ট অর্থবোধক সূরা নাযিল করা হলো যাতে যুদ্ধের উল্লেখ ছিল তখন তোমরা দেখলে যাদের মনে রোগ ছিল তারা তোমাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কাউকে মৃত্যু আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বিশেষ করে ওহুদ যুদ্ধের সময় এসব দুর্বলতা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। সূরা আলে ইমরানের ১৩ থেকে ১৭ রুকূ' পর্যন্ত একাধারে এ বিষয়ের প্রতিই ইংগিত দেয়া হয়েছে।

এ আয়াতগুলোতে যেসব দুর্বলতার সমালোচনা করা হয়েছে, আয়াতগুলোর শানে নুযূল বর্ণনা প্রসংগে মুফাস্সিরগণ তার বিভিন্ন ধরন ও প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক ছিল যারা জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে বলত ঃ হায়! আল্লাহ তা'আলার কাছে যে কাজটি সবচেয়ে বেশী প্রিয় তা যদি আমরা জানতাম তাহলে তাই করতাম। কিন্তু যখন বলে দেয়া হলো যে, সেই কাজটি হলো জিহাদ, তখন নিজেদের কথা রক্ষা করা তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ল। মুকাতিল ইবনে হাইয়ান বলেন ঃ ওহুদের যুদ্ধে এসব লোক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হলে তারা নবীকে (সা) ফেলে রেখে জান নিয়ে পালিয়েছিল। ইবনে যায়েদ বলেন ঃ বহু লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই মর্মে আশ্বাস দিত যে, আপনাকে যদি শত্রুর মুখোমুখি হতে হয় তাহলে আমরা আপনার সাথে থাকব। কিন্তু শত্রুর সাথে মুখোমুখি হওয়ার সময় আসলে তাদের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি মিথ্যা প্রমাণিত হত। কাতাদা এবং দাহ্হাক বলেন ঃ কোন কোন লোক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত ঠিকই, কিন্তু তারা কোন কাজই করত না। কিন্তু যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বড় গলায় বলত ঃ আমি এভাবে লড়াই করেছি, আমি এভাবে হত্যা করেছি। এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা এই প্রকৃতির লোকদেরকে তিরস্কার করেছেন।

৩. এর দ্বারা প্রথমত জানা গেল যে, কেবল সেই ঈমানদারই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে সফল হয় যারা তাঁর পথে মরণপণ করে কাজ করতে এবং বিপদ আপদ মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত থাকে। দ্বিতীয়ত, জানা গেল যে, আল্লাহ যে সেনাদলকে পছন্দ করেন তার মধ্যে তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। এক, তারা বুঝে শুনে ভালভাবে চিন্তা–ভাবনা করে আল্লাহর পথে লড়াই করবে এবং এমন কোন পথে লড়াই করবে না যা 'ফী

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ⑤

তোমরা মূসার সেই কথাটি স্মরণ করো যা তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন। "হে আমার কওমের লোক, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও? অথচ তোমরা ভাল করেই জানো যে, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর প্রেরিত রসূল।[৪] এরপর যেই তারা বাঁকা পথ ধরলো অমনি আল্লাহও তাদের দিল বাঁকা করে দিলেন। আল্লাহ ফাসেকদের হিদায়াত দান করেন না।[৫]

সাবীলিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর পথের সংজ্ঞায় পড়ে না। দুই, তারা বিচ্ছিন্নতা ও শৃঙ্খলহীনতার শিকার হবে না, বরং মজবুত সংগঠন সুসংহত অবস্থায় কাতারবন্দী বা সুশৃঙ্খল হয়ে লড়াই করবে। তিন, শত্রুর বিরুদ্ধে তার অবস্থা হবে "সুদৃঢ় দেয়ালের" মত। এই শেষ গুণটি আবার অর্থের দিক থেকে অত্যন্ত ব্যাপক। যুদ্ধের ময়দানে কোন সেনাবাহিনীই ততক্ষণ পর্যন্ত সুদৃঢ় দেয়ালের মত দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে নিম্নবর্ণিত গুণাবলী সৃষ্টি না হবে ঃ

—আকীদা-বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য। এ গুণটিই কোন সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈনিক অফিসারকে পূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ করে।

—পরস্পরের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার ওপর আস্থা। প্রকৃতপক্ষে সবাই নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষে নিষ্ঠাবান এবং অসদুদ্দেশ্য থেকে মুক্ত না হলে এ গুণ সৃষ্টি হতে পারে না। আর এ গুণ যদি সৃষ্টি না হয় তাহলে যুদ্ধের মত কঠিন পরীক্ষা কারো কোন দোষ-ত্রুটি গোপন থাকতে দেয় না। আর আস্থা নষ্ট হয়ে গেলে সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য পরস্পরের ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে একে অপরকে সন্দেহ করতে শুরু করে।

—নৈতিক চরিত্রের একটি উন্নত মান থাকতে হবে। সেনাবাহিনীর অফিসার এবং সাধারণ সৈনিক যদি সেই মানের নীচে চলে যায় তাহলে তাদের মনে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সম্মানবোধ সৃষ্টি হতে পারে না। তারা পারস্পরিক কোন্দল ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ থেকেও রক্ষা পেতে পারে না।

—উদ্দেশ্য ও লক্ষের প্রতি এমন অনুরাগ ও ভালবাসা এবং তা অর্জনের জন্য এমন দৃঢ় সংকল্প থাকা চাই যা গোটা বাহিনীর মধ্যে জীবনপাত করার অদম্য আকাংখা সৃষ্টি করে দেবে আর যুদ্ধের ময়দানে তা প্রকৃতই মজবুত দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে থাকবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে যে শক্তিশালী সামরিক সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল, যার সাথে সংঘর্ষে বড় বড় শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং শতাব্দীর পর

শতাব্দী কোন শক্তি যার মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারেনি এ সব গুণ ও বৈশিষ্টই ছিল তার ভিত্তি।

৪. কুরআন মজীদের বেশ কয়েকটি স্থানে অতি বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসাকে আল্লাহর নবী এবং তাদের পরম কল্যাণকামী হিসেবে জানার পরও বনী ইসরাঈল তাঁকে কতভাবে কষ্ট দিয়েছে এবং কিভাবে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। উদাহরণ হিসেবে দেখুন, সূরা বাকারাহ, আয়াত ৫১, ৫৫, ৬০, ৬৭ থেকে ৭১; আন নিসা, আয়াত ১৫৩; আল মায়েদা, আয়াত ২০ থেকে ২৬; আল আ'রাফ, আয়াত ১৩৮ থেকে ১৪১, ১৪৮ থেকে ১৫১; ত্বা হা, আয়াত ৮৬ থেকে ৯৮। বাইবেলে ইহুদীদের নিজেদের বর্ণিত ইতিহাসও এ ধরনের ঘটনায় পরিপূর্ণ। শুধু নমুনা স্বরূপ কয়েকটি ঘটনার জন্য দেখুন, যাত্রা পুস্তক, ৫ ঃ ২০—২১, ১৪ ঃ ১১—১২; ১৬ ঃ ২—৩; ১৭ ঃ ৩—৪; গণনাপুস্তক, ১১ঃ ১১—১৫; ১৪ ঃ ১—১০; ১৬ অধ্যায় সম্পূর্ণ; ২০ ঃ ১-৫; কুরআন মজীদের এ স্থানটিতে এসব ঘটনার প্রতি ইংগিত করে মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল জাতি তাদের নবীর সাথে যে আচরণ করেছিল তারা যেন তাদের নিজেদের নবীর সাথে ঐরূপ আচরণ না করে। অন্যথায় বনী ইসরাঈল যে পরিণামের সম্মুখীন হয়েছিল তারাও সেই একই পরিণামের সম্মুখীন হওয়া থেকে রক্ষা পাবে না।

৫. অর্থাৎ যেসব মানুষ ইচ্ছা করে বাঁকা পথে চলতে চায় অযথা তাদেরকে সোজা পথে চালান এবং যারা আল্লাহর নাফরমানী করার জন্য বদ্ধপরিকর তাদেরকে জোর করে হিদায়াত দান করা আল্লাহর নিয়ম বা রীতি নয়। এর দ্বারা একথা আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কোন ব্যক্তি বা জাতির গোমরাহীর সূচনা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় না বরং স্বয়ং সেই ব্যক্তি বা জাতির পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নিয়ম বা বিধান হলো, যারা গোমরাহীকে গ্রহণ করে তিনি তাদের জন্য সঠিক পথে চলার উপায়-উপকরণ নয়, বরং গোমরাহীর উপায়-উপকরণই সরবরাহ করেন যাতে যেসব পথে তারা নিজেদেরকে নিয়ে যেতে চায় সেসব পথে যেন অবাধে যেতে পারে। আল্লাহ তো মানুষকে বাছাই করে নেয়ার স্বাধীনতা (Freedom of choice) দিয়েছেন। এরপর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিটি মানুষের বা মানুষের দল ও গোষ্ঠীর নিজের কাজ যে, তারা তাদের রবের আনুগত্য করবে কি করবে না এবং সঠিক পথ গ্রহণ করবে না বাঁকা পথের কোন একটিতে চলবে। এই বাছাই ও গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন জবরদস্তি নেই। কেউ যদি আনুগত্য ও হিদায়াতের পথ বেছে নেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জোর করে গোমরাহী এবং নাফরমানীর পথে ঠেলে দেন না। আর কেউ যদি নাফরমানী করা এবং সঠিক পথ অনুসরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তাহলে তাকে জোর করে আনুগত্য ও হিদায়াতের পথে নিয়ে আসাও আল্লাহর নিয়ম নয়। কিন্তু এটাও একটা বাস্তব ব্যাপার যে, কেউ নিজের জন্য যে পথই বেছে নিক না কেন সে পথে চলার জন্য উপায়-উপকরণ আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ সরবরাহ না করেন এবং অনুকূল অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ পথে কার্যত এক পাও অগ্রসর হতে পারে না। এটাই হলো আল্লাহর দেয়া তাওফীক বা আনুকূল্য যার ওপর মানুষের প্রতিটি চেষ্টা-সাধনা ফলপ্রসূ হওয়া নির্ভর করে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি ভাল কাজের তাওফীক আদৌ না চায়, বরং উল্টা মন্দ ও পাপ কাজের তাওফীক চায় তাহলে সে তাই

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑥

আর স্মরণ করো[৬] ঈসা ইবনে মারয়ামের সেই কথা যা তিনি বলেছিলেন ঃ হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল। আমি সেই তাওরাতের সত্যতা প্রতিপাদনকারী যা আমার পূর্বে এসেছে[৭] এবং একজন রসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমাদ।[৮]

কিন্তু যখন তিনি তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করলেন তখন তারা বলল ঃ এটা তো স্পষ্ট প্রতারণা।[৯]

লাভ করবে। আর যখন সে মন্দ ও পাপ কাজের 'তাওফীক' লাভ করে তখন তার মন–মানসিকতার গোটা ছাঁচ এবং চেষ্টা–সাধনা ও কাজকর্মের পথও বাঁকা হয়ে যেতে থাকে। এমন কি ভাল ও কল্যাণকে গ্রহণ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা ধীরে ধীরে তার মধ্য থেকে নিঃশেষ হয়ে যায়। "তারা বাঁকা পথ ধরলে আল্লাহও তাদের দিল বাঁকা করে দিলেন" কথাটির অর্থ এটাই। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি নিজে গোমরাহী কামনা করে গোমরাহীর জন্য তৎপর থাকে এবং গোমরাহীতে নিমজ্জিত থেকে অধিকতর গোমরাহীর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য সমস্ত চিন্তা–ভাবনা ও চেষ্টা–সাধনা নিয়োজিত করে তাকে জোর করে হিদায়াতের দিকে ফিরিয়ে দেয়া আল্লাহর আইন ও নিয়ম–নীতির পরিপন্থী ব্যাপার। কারণ যে পরীক্ষার জন্য মানুষকে দুনিয়ায় বাছাইয়ের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এরূপ কাজ সেই উদ্দেশ্য লক্ষকেই নস্যাত করে দেবে। আর এভাবে হিদায়াত লাভ করে মানুষ সঠিক পথে চললেও সে জন্য তার কোন প্রকার বিনিময় বা উত্তম প্রতিদান লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ারও যুক্তিসংগত কোন কারণ নেই। এ ক্ষেত্রে তো বরং যে ব্যক্তি বাধ্যতামূলক হিদায়াত লাভ করেনি এবং গোমরাহীর মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে তারও কোন প্রকার শাস্তি লাভ না করা উচিত। কারণ এমতাবস্থায় তার গোমরাহীর মধ্যে থেকে যাওয়ার সমস্ত দায়–দায়িত্ব আল্লাহর ওপরই বর্তায়। সে বরং আখেরাতে জবাবদিহির সময় এ যুক্তি পেশ করতে পারে যে, আপনার কাছে বাধ্যতামূলকভাবে হিদায়াত দান করার ব্যবস্থা যখন ছিল তখন আপনি আমাকে এই কৃপা থেকে বঞ্চিত রেখেছিলেন কেন? 'আল্লাহ তা'আলা ফাসেকদের হিদায়াত দান করেন না' বাণীটির তাৎপর্য এটাই। অর্থাৎ যেসব মানুষ নিজেরাই তাদের জন্য গোনাহ ও নাফরমানীর পথ বেছে নিয়েছে তিনি তাদেরকে আনুগত্যের পথে চলার 'তাওফীক' দেন না।

৬. এটা বনী ইসরাঈল জাতির দ্বিতীয়বারের নাফরমানির কথা। তারা একটি নাফরমানি করেছিল তাদের উত্থান যুগের শুরুতে। আর এটি হলো তাদের দ্বিতীয়

নাফরমানি যা তারা এই যুগেরই শেষ দিকে, সর্বশেষ পর্যায়ে করেছিলো। এরপর চিরদিনের জন্য তাদের ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হলো। এ দু'টি ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদেরকে আল্লাহর রসূলের সাথে বনী ইসরাঈলের মত আচরণ করার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া।

৭. এই আয়াতাংশের তিনটি অর্থ। আর এ তিনটি অর্থই যথাযথ ও সঠিক।

এর একটি অর্থ হলো, আমি কোন স্বতন্ত্র এবং অভিনব দীন বা জীবন বিধান নিয়ে আসিনি। বরং হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যে দীন এনেছিলেন আমিও সেই দীন এনেছি। আমি তাওরাতকে রহিত বা বাতিল করতে আসিনি বরং তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী হিসেবে এসেছি। আল্লাহর রসূলগণ যেমন চিরদিনই তাঁদের পূর্বের নবী–রসূলদের সত্য হওয়ার কথা ঘোষণা করে এসেছেন আমিও তেমনি পূর্ববর্তী নবী–রসূলদের সত্যতা ঘোষণা করছি। তাই আমার রিসালাত মেনে নিতে দ্বিধা–সংকোচ করার কোন কারণ তোমাদের জন্য নেই।

দ্বিতীয় অর্থ হলো, আমার আগমন সম্পর্কে তাওরাতে যেসব সুসংবাদ বিদ্যমান আমি তার বাস্তব রূপ। তাই তোমাদের কর্তব্য আমার বিরোধিতা না করে এই ভেবে স্বাগত জানান যে, পূর্ববর্তী নবীগণ যার আগমনের সুসংবাদ আগে দিয়েছিলেন তিনি এখন এসে গিয়েছেন।

আর এই আয়াতাংশকে পরবর্তী আয়াতাংশের সাথে মিলিয়ে পড়লে তৃতীয় আরেকটি অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাওরাতে আল্লাহর রসূল আহমাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমনের যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তার সত্যতা ঘোষণা করছি এবং নিজেও তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিচ্ছি। এই তৃতীয় অর্থ অনুসারে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের এই বাণী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দেয়া সেই সুসংবাদের প্রতি ইংগিত যা তিনি তাঁর কওমের সামনে ভাষণ দেয়ার সময় বলেছিলেন। সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেন ঃ

"তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন। তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে। কেননা হোরেবে সমাজের (সমাবেশ) দিবসে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে এই প্রার্থনাই ত করিয়াছিলে, যথা আমি যেন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব পুনর্ব্বার শুনিতে ও এই মহাগ্নি আর দেখিতে না পাই, পাছে আমি মারা পড়ি। তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালই বলিয়াছে। আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব।" (দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় ১৮ ঃ শ্লোক—১৫ থেকে ১৯)

এটা তাওরাতের এমন একটা স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। এ ভাষণে হযরত মূসা (আ) তাঁর কওমকে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী শুনাচ্ছেন যে, আমি তোমার জন্য তোমার ভাইদের

মধ্য থেকে একজনকে নবী করে পাঠাবো। একথা সবার কাছেই স্পষ্ট যে, কোন কওমের 'ভাই' কথার অর্থ ঐ কওমেরই কোন গোত্র বা খান্দান হতে পারে না। বরং তার অর্থ কেবল এমন কোন জাতিই হতে পারে যার সাথে তার বংশগত নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান। এর অর্থ যদি খোদ বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকেই কোন নবীর আগমন হতো তাহলে তার ভাষা হতো, আমি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজনকে নবী করে পাঠাব। অতএব বনী ইসরাঈলের ভাই অর্থ অনিবার্যভাবে হযরত ইসমাঈলের বংশধরগণই হতে পারে। আর হযরত ইবরাহীমের সন্তান হওয়ার কারণে হযরত ইসমাঈল ও তাঁর বংশধরগণ তাদের বংশগত আত্মীয় হিসেবে গণ্য। তাছাড়া বনী ইসরাঈলের কোন নবী এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব রূপ হতে পারেন না। এর আরো একটি কারণ এই যে, হযরত মূসার পরে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে কোন একজন নবী নয় বরং বহু সংখক নবী এসেছেন বাইবেলে যার ভুরি ভুরি বর্ণনা রয়েছে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে দ্বিতীয় যে কথাটি বলা হয়েছে তাহলো, যাকে নবী বানিয়ে পাঠান হবে তিনি হবেন হযরত মূসার মত। এ কথা স্পষ্ট যে, এর অর্থ আকার-আকৃতি এবং জীবনের ঘটনাবলীর সাথে সাদৃশ্য মোটেই নয়। কারণ এ দিক দিয়ে বিচার করলে কোন ব্যক্তিই অপর কোন ব্যক্তির মত হয় না। আবার এর দ্বারা শুধু নবুওয়াতের গুণাবলীর দিক দিয়ে সাদৃশ্য বুঝায় না। কারণ হযরত মূসার পরে যত নবীর আগমন ঘটেছে তাঁদের সবারই নবীসুলভ গুণাবলী ছিল এক অভিন্ন। তাই কোন একজন নবীর এরূপ বৈশিষ্ট হতে পারে না যে, তিনি এই গুণের ক্ষেত্রে তাঁর অনুরূপ হবেন। তাই এ দু'টি দিক দিয়ে সাদৃশ্য বাদ পড়ার পর অপর কোন সাদৃশ্য দ্বারা যদি আগমনকারী নবীকে নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করা বোধগম্য হতে পারে তবে সেই সাদৃশ্য এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে, আগমনকারী নবী একটি স্বতন্ত্র শরীয়াত নিয়ে আসবেন। একমাত্র এদিক দিয়েই তিনি হতে পারেন হযরত মূসার অনুরূপ। আর এ বৈশিষ্ট হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কোন নবীর মধ্যে নেই। কারণ তাঁর আগে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যত নবীই এসেছেন তাঁরা ছিলেন হযরত মূসার শরীয়াতের অনুসারী। তাঁদের কেউ-ই স্বতন্ত্র কোন শরীয়াত নিয়ে আসেননি। ভবিষ্যদ্বাণীর নিম্নবর্ণিত বক্তব্য দ্বারা এ ব্যাখ্যা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে :

"এটা তোমার (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের) সেই প্রার্থনা অনুসারে হবে যা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে সমাবেশের দিন হোরেবে করেছিলে, যেন আমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব পুনর্বার শুনিতে এবং এই মহাগ্নি আর দেখতে না পাই, পাছে আমি মারা পড়ি। তখন সদাপ্রভু আমাকে বললেন, তারা ভালই বলছে। আমি তাদের জন্য তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য থেকে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করবো ও তার মুখে আমার বাক্য দিব।"

এই বাক্যটির মধ্যে উল্লেখিত হোরেব অর্থ সেই পাহাড় হযরত মূসাকে প্রথমবার যেখানে শরীয়াতের আহকাম বা বিধিবিধান দেয়া হয়েছিল। আর এর মধ্যে বনী ইসরাঈলদের যে প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো, ভবিষ্যতে যদি আমাদেরকে কোন শরীয়াত দেয়া হয় তাহলে যেন সেই ভীতিকর অবস্থার মধ্যে না দেয়া হয়, যা শরীয়াত দেয়ার সময় হোরেব পাহাড়ের পাদদেশে সৃষ্টি করা হয়েছিল। কুরআন মজীদ ও

বাইবেল উভয় গ্রন্থে সেই সব অবস্থার উল্লেখ বিদ্যমান। (দেখুন, সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ৫৫, ৫৬, ৬৩; আল আ'রাফ, আয়াত ১৫৫, ১৭১; বাইবেল, যাত্রাপুস্তক ১৯ ঃ ১৭, ১৮;) এর জবাবে হযরত মূসা বনী ইসরাঈলকে বলছেন ঃ আল্লাহ তোমাদের এ প্রার্থনা কবুল করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি তাদের জন্য এমন একজন নবী পাঠাবো, যার মুখে আমার কথা দিব। অর্থাৎ হোরেব পাহাড়ের পাদদেশে যে ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল পরবর্তী শরীয়াত দেয়ার সময় সেই অবস্থার সৃষ্টি করা হবে না। বরং এর পরে যে নবীকে এই পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করা হবে তাঁর মুখে আল্লাহর বাণী দিয়ে দেয়া হবে এবং তিনি আল্লাহর বান্দাদের তা শুনিয়ে দেবেন। এই স্পষ্ট কথাগুলো নিয়ে চিন্তা–ভাবনা ও বিচার–বিবেচনার পর এ ব্যাপারে কি কোন সন্দেহ থাকে যে, এ বাণীর বাস্তব রূপ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কেউ নয়? হযরত মূসার পরে স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ শরীয়াত কেবল তাঁকেই দেয়া হয়েছে। হোরেব পাহাড়ের পাদদেশে বনী ইসরাঈলের যেমন সমাবেশ হয়েছিল, তাঁকে শরীয়াত দেয়ার সময় এমন কোন সমাবেশ হয়নি এবং শরীয়াতের বিধিবিধান দেয়ার সময় কোন ক্ষেত্রেই সেইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করা হয়নি যা সেখানে করা হয়েছিল।

৮. এটি কুরআন মজীদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। ইসলাম বিরোধীরা এ আয়াত নিয়ে যেমন অনেক অপপ্রচার চালিয়েছে তেমনি জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধও করেছে। কারণ এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম স্পষ্টভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উল্লেখ করে তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তাই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক।

এক ঃ এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নাম বলা হয়েছে 'আহমাদ'। আহমাদ শব্দের দু'টি অর্থ। এক, আল্লাহর সর্বাধিক প্রশংসাকারী। দুই, সবচেয়ে বেশী প্রশংসিত অথবা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী প্রশংসার যোগ্য। সহীহ হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত যে এটি ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি নাম। মুসলিম ও আবু দাউদ তায়ালিসীতে হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَالْحَاشِرُ "আমি মুহাম্মাদ, আমি আহ্মাদ এবং আমি সমবেতকারী..................হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়িম থেকে ইমাম মালেক, বুখারী, মুসলিম, দারেমী, তিরমিযী এবং নাসায়ী একই বক্তব্য সম্বলিত অনেকগুলো হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই নামটি সাহাবীদের মধ্যেও পরিচিত ছিল। হযরত হাস্সান ইবনে সাবেতের কবিতার একটি ছত্রে বলা হয়েছে ঃ

صَلَّى الْإِلٰهُ وَمَنْ نَحِفُّ بِعَرْشِهِ ، وَالطَّيِّبُوْنَ عَلَى الْمُبَارَكِ أَحْمَدُ

মহান আল্লাহ, তাঁর আরশের চারপাশে সমবেত ফেরেশতারা এবং সব পবিত্র সত্তা বরকত ও কল্যাণময় আহমাদের ওপর দরূদ পাঠিয়েছেন।

এ বিষয়টি ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামের নাম শুধু মুহাম্মাদ ছিল না বরং আহমাদও ছিল। আরবদের গোটা সাহিত্যে কোথাও এ কথার উল্লেখ নেই যে, নবীর (সা) পূর্বে কারো নাম আহমাদ রাখা হয়েছিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে এত অধিক সংখ্যক লোকের নাম আহমাদ ও গোলাম আহমাদ রাখা হয়েছে যে, তা হিসেব করাও অসম্ভব। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে যে, নবুওয়াতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র উম্মাতের মধ্যে তাঁর এই পবিত্র নামটি সুপরিচিত ও সুবিদিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম যদি আহমাদ না হয়ে থাকে তাহলে যারা তাদের ছেলেদের নাম গোলাম আহমাদ রেখেছে তারা তাদের ছেলেদেরকে কোন্ আহমাদের গোলাম হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল?

দুই ঃ যোহন লিখিত সুসমাচারে সাক্ষ দেয় যে, হযরত ঈসা মাসীহর আগমনের সময় বনী ইসরাঈল জাতি তিনজন মহাব্যক্তিত্বের আগমনের অপেক্ষায় ছিল। এক, মাসীহ, দুই, এলিয় (অর্থাৎ হযরত ইলিয়াসের পুনরায় আগমন) এবং তিন, "সেই নবী"। যোহনের সুসমাচারের ভাষা হলো ঃ

"আর যোহনের (হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম) সাক্ষ্য এই,—যখন যিহূদিগণ কয়েক জন যাজক লেবীয়কে দিয়া যিরূশালেম হইতে তাঁহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, 'আপনি কে?' তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না; তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই খ্রীষ্ট নই। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি? আপনি কি এলিয়? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী? তিনি উত্তর করিলেন, না। তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল, আপনি কে? যাঁহারা আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যেন উত্তর দিতে পারি। আপনার বিষয়ে আপনি কি বলেন? তিনি কহিলেন আমি "প্রান্তরে এক জনের রব, যে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর পথ সরল কর" .... তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি সেই খ্রীষ্ট নহেন, এলিয়ও নহেন, সেই ভাববাদীও নহেন তবে বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন? (অধ্যায়—১, পদ ১৯ থেকে ২৫)

এসব কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, বনী ইসরাঈল হযরত ঈসা মাসীহ এবং হযরত ইলিয়াস ছাড়াও আরো একজন নবীর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। হযরত ইয়াহইয়া সেই নবী ছিলেন না। সেই নবীর আগমন সম্পর্কে আকীদা–বিশ্বাস বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে এতটা প্রসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত ছিল যে, তাঁকে বুঝানোর জন্য 'সেই নবী' কথাটা বলাই যেন যথেষ্ট ছিল। পুনরায় একথা বলার আর প্রয়োজনই হতো না যে, তাওরাতে যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া এসব কথা থেকে এও জানা গেল যে, তিনি যে নবীর প্রতি ইংগিত করছিলেন তাঁর আগমনের বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত ছিল। কেননা, হযরত ইয়াহইয়াকে যখন বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করা হলো, তখন তিনি একথা বলেননি যে, তোমরা কোন্ নবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ, আর কোন নবী তো আসেবন না?

তিন ঃ এবার সেই সব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি একটু লক্ষ করুন যা যোহনের সুসমাচারের ১৪ থেকে ১৬ পর্যন্ত অধ্যায়ে একাধারে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

"আর আমি পিতার নিকট নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন; তিনি সত্যের আত্মা; জগত তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না; কেননা সে তাঁহাকে দেখেনা, তাঁহাকে জানেও না; তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন" (১৪ঃ ১৬, ১৭)

"তোমাদের নিকটে থাকিতে থাকিতেই আমি এইসকল কথা কহিলাম। কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।" (১৪ ঃ ২৫, ২৬)

"এর পর আমি তোমাদের সহিত আর অধিক কথা বলিব না; কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছে, আর আমাতে তাহার কিছুই নাই।" (১৪ ঃ ৩০)

"যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আইসেন—যখন সেই সহায় আসিবেন—তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।" (১৫ ঃ ২৬)

"তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।" (১৬ ঃ ৭)

"তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন; কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন। পিতার যাহা যাহা আছে সকলই আমার; এই জন্য বলিলাম, যাহা আমার, তিনি তাহাই লইয়া থাকেন, ও তোমাদিগকে জানাইবেন।" (১৬ ঃ ১২–১৫)

চার ঃ বাইবেলের এসব উদ্ধৃতির সঠিক অর্থ নিরূপণের জন্য সর্বপ্রথম জানা দরকার যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সমকালীন ফিলিস্তিনবাসীদের ভাষা ছিল আরামীয় ভাষার সেই কথ্য রূপ যাকে সুরিয়ানী (SYRIAC প্রাচীন সিরীয় ভাষা) বলা হয়। ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের দুই আড়াই শত বছর পূর্বেই সালুকী (Seleucide) শাসন আমলে এ অঞ্চল থেকে ইব্রিয় বা হিব্রু ভাষা বিদায় নিয়েছিল এবং সুরিয়ানী ভাষা তার স্থান দখল করেছিল। যদিও প্রথমে সালুকী এবং পরে রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবে গ্রীক ভাষাও এ অঞ্চলে পৌঁছেছিল কিন্তু যে শ্রেণীটি সরকার ও রাজদরবারে স্থান করে নিয়েছিল কিংবা স্থান করে নেয়ার জন্য গ্রীক ভাবধারা পন্থী হয়ে গিয়েছিল কেবল তাদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষ সুরিয়ানী ভাষার একটি বিশেষ কথ্য রূপ (Dialect) ব্যবহার করত যার ধ্বনি, কথনভঙ্গি, উচ্চারণরীতি এবং বাকধারা দামেশক অঞ্চলে প্রচলিত সুরিয়ানী ভাষারূপ থেকে ভিন্ন ছিল এবং এ দেশের সাধারণ মানুষ গ্রীক ভাষার সাথে এতটা অপরিচিত ছিল যে, ৭০ খৃষ্টাব্দে যিরুশালেম দখলের পর রোমান জেনারেল টিটুস (Titus) যিরুশালেমের অধিবাসীদের সামনে গ্রীক ভাষায় বক্তৃতা করলে তা সুরিয়ানী ভাষায় অনুবাদ করতে হয়েছিল। এ থেকে আপনা আপনি প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর শাগরিদদের যা বলেছিলেন তা অবশ্যই সুরিয়ানী ভাষায় হবে।

দ্বিতীয় যে, বিষয়টি জানা জরুরী তা এই যে, বাইবেলের চারটি পুস্তক বা সুসমাচারই সেই সব গ্রীক ভাষাভাষী খৃস্টানদের লেখা যারা হযরত ঈসার পর এ ধর্ম গ্রহণ করেছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বাণী ও কাজকর্মের বিস্তারিত বিবরণ তাদের কাছে সুরিয়ানী ভাষী কোন খৃস্টানের মাধ্যমে লিখিত আকারে নয় বরং মৌখিক বর্ণনার আকারে পৌছেছিল এবং সুরিয়ানী ভাষার এই বর্ণনাসমূহকে তারা নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করে লিপিবদ্ধ করেছিল। এসব পুস্তক বা সুসমাচারের কোনটিই ৭০ খৃস্টাব্দের পূর্বে লিখিত নয়। আর যোহন লিখিত সুসমাচার তো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের একশত বছর পরে সম্ভবত এশিয়া মাইনরের এফ্সুস শহরে বসে লেখা। তাছাড়াও গ্রীক ভাষায় সর্বপ্রথম লিখিত সুসমাচারের মূল কোন কপিও সংরক্ষিত নাই। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে গ্রীক ভাষায় লিখিত যেসব পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন জায়গা থেকে খুঁজে খুঁজে এনে একত্রিত করা হয়েছিল তার কোনটিই চতুর্থ শতাব্দির পূর্বের নয়। তাই তিন শতাব্দীকাল সময়ে এসবের মধ্যে কি কি রদবদল এবং পরিবর্তন–পরিবর্ধন হয়েছে তা বলা মুশকিল। যে জিনিস এ বিষয়টিকে বিশেষভাবে সন্দেহজনক করে তোলে তা হলো, খৃস্টানরা তাদের পছন্দ মাফিক জেনে বুঝে তাদের সুসমাচারের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনকে বৈধ মনে করে এসেছে। ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা (১৯৪৬ সনের সংস্করণে) এর বাইবেল শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবন্ধের রচয়িতা লিখছেন ঃ

"বাইবেলের সুসমাচারসমূহে অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাক্য যা পদকেই অন্য কোন সূত্র থেকে এনে গ্রন্থের মধ্যে শামিল করার মত সুস্পষ্ট পরিবর্তন করা হয়েছে জেনে শুনে। ....স্পষ্টত উদ্দেশ্যমূলকভাবে এসব পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। তা করেছে এমন সব লোক যারা মূল গ্রন্থে অন্তরভুক্ত করার জন্য কোন জায়গা থেকে কিছু তথ্য লাভ করেছে এবং গ্রন্থকে উন্নত ও অধিক কল্যাণকর বানানোর জন্য নিজের পক্ষ থেকে তার মধ্যে সেই সব তথ্য শামিল করার অধিকারী বলে নিজেদেরকে মনে করেছে.................এরূপ বহুসংখ্যক সংযোজন দ্বিতীয় শতকেই হয়েছিল। কিন্তু তার উৎস সম্পর্কে জানা যায়নি।"

বর্তমানে বাইবেলের সুসমাচারসমূহে আমরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যেসব বাণী দেখতে পাই তা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে এবং তাতে কোন রদবদল ও পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধিত হয়নি এমন কথা বলা উপরোক্ত পরিস্থিতির আলোকে নিশ্চিতভাবেই অত্যন্ত কঠিন।

তৃতীয় এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মুসলমানদের বিজয়ের পরেও প্রায় তিন শতাব্দীকাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনের খৃস্টান অধিবাসীদের ভাষা ছিল সুরিয়ানী এবং খৃস্টীয় নবম শতকে গিয়ে আরবী ভাষা সে স্থান দখল করে। সুরিয়ানী ভাষাভাষী ফিলিস্তিনবাসীদের মাধ্যমে খৃস্টীয় ঐতিহ্য বা ধর্মাচরণ, আচার–অনুষ্ঠান ও ইতিহাস সম্পর্কে যেসব তথ্য প্রথম তিন শতাব্দীতে মুসলিম মনীষীগণ লাভ করেছিলেন তা সেই সব লোকদের লব্ধ তথ্যের তুলনায় অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য হওয়া উচিত যা তাদের কাছে সুরিয়ানী থেকে গ্রীক এবং গ্রীক থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদের পর অনুবাদ হয়ে পৌছেছিল। কেননা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মুখ থেকে উচ্চারিত মূল সুরিয়ানী শব্দসমূহ মুসলিম মনীষীদের কাছে সংরক্ষিত থাকার সম্ভাবনাই বেশী ছিল।

পাঁচ ঃ অনস্বীকার্য এসব ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি লক্ষ করে দেখুন ওপরে উদ্ধৃত যোহন লিখিত সুসমাচারের পদগুলোতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এমন একজন আগমনকারীর আগমনের সুসংবাদ দিচ্ছেন যিনি তাঁর পরে আসবেন। তিনি তাঁর সম্পর্কে বলছেন ঃ তিনি হবেন গোটা বিশ্বের নেতা (সরওয়ারে আলম), চিরকাল থাকবেন, সত্যের সবগুলো পথ দেখাবেন এবং নিজে তাঁর (হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে সাক্ষ দেবেন। যোহন লিখিত সুসমাচারের এসব বাক্যের মধ্যে "পবিত্র আত্মা" এবং "সত্যের আত্মা" ইত্যাদি কথাগুলো অন্তরভুক্ত করে মূল বিষয় ও বক্তব্যকে বিকৃত করার পুরোপুরি চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গভীর মনোযোগ সহকারে বাক্যগুলো পড়লে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যে আগমনকারীর আগমনের কথা বলা হয়েছে তিনি কোন আত্মা নন বরং মানুষ। তিনি এমন এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যাঁর শিক্ষা হবে বিশ্বজনীন, সর্বব্যাপী এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী সেই বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্য বাইবেলের বাংলা অনুবাদে 'সহায়' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং যোহন লিখিত মূল সুসমাচারে গ্রীক ভাষার যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল সে ব্যাপারে খৃস্টানদের অনড় দাবী হচ্ছে, যে শব্দটি ছিল Paracletis কিন্তু শব্দটির অর্থ নিরূপণে খোদ খৃস্টান পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট জটীলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মূল গ্রীক ভাষায় Paraclet শব্দটির কয়েকটি অর্থ হয়। কোন স্থানের দিকে ডাকা, সাহায্যের জন্য ডাকা, ভীতি প্রদর্শন করা, সাবধান করা, উৎসাহিত করা, প্ররোচিত করা, আশ্রয় প্রার্থনা করা বা আবেদন নিবেদন করা এবং দোয়া করা। তাছাড়াও গ্রীক বাগবিধি অনুসারে শব্দটির অর্থ হয় সান্ত্বনা দেয়া, পরিতৃপ্ত করা, সাহস যোগানো। বাইবেলের যেসব জায়গায় এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেসব জায়গায় এর কোন একটি অর্থও খাপ খায় না। ওরাইজেন (Origen) কোথাও এর অনুবাদ করেছেন Consolator আবার কোথাও অনুবাদ করেছেন Deprecator। কিন্তু অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ এ দু'টি অনুবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা, প্রথমত গ্রীক ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে এটি শুদ্ধ নয়। দ্বিতীয়ত সবগুলো বাক্যের যেখানে যেখানে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে এ অর্থ খাপ খায় না। আরো কিছু সংখ্যক অনুবাদক এর অনুবাদ করেছেন Teacher. কিন্তু গ্রীক ভাষার ব্যবহার রীতি অনুসারে এ অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে না। এর অনুবাদে তার তুলিয়ান এবং অগাষ্টাইন Advocate শব্দটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আরো কিছু সংখ্যক লোক Assistant, Camforter এবং Consoler ইত্যাদি শব্দ গ্রহণ করেছেন। (দেখুন ইনসাইক্লোপেডিয়া অব বাইবেলিক্যাল লিটারেচার, শব্দ—প্যারাক্লিটাস)।

এখন মজার ব্যাপার হলো, গ্রীক ভাষাতেই অন্য একটি শব্দ আছে Periclytos.যার অর্থ প্রশংসিত। এ শব্দটি সম্পূর্ণরূপে محمد শব্দের সমার্থক। উচ্চারণের ক্ষেত্রেও Periclytos এবং Paracleteus এর মধ্যে বেশ মিল আছে। অসম্ভব নয় যে, যেসব খৃস্টান মহাত্মনরা তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহে নিজেদের মর্জি ও পছন্দ মাফিক নির্দ্বিধায় পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে অভ্যস্ত ছিলেন তারা যোহন কর্তৃক বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর এই শব্দটিকে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী দেখতে পেয়ে তা লিপিবদ্ধ করার সময় কিছুটা রদবদল করে দিয়েছে। এ বিষয়টি যাঁচাই করার জন্য যোহন কর্তৃক লিখিত আদি গ্রীক ভাষার সুসমাচার গ্রন্থ কোথাও বর্তমান নেই। তাই দু'টি শব্দের মধ্যে মূলত কোন্টি ব্যবহার করা হয়েছিল তা অনুসন্ধান করে দেখার সুযোগ নেই।

ছয় ঃ কিন্তু যোহন কোন্ গ্রীক শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তার ওপরে এ বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা নির্ভর করে না। কেননা তাও অনুবাদ। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, ফিলিস্তিনের সুরিয়ানী ভাষা ছিল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ভাষা। তাই তিনি তাঁর সুসংবাদ বাণীতে যে শব্দ ব্যবহার করে থাকবেন তা অবশ্যই সুরিয়ানী ভাষারই কোন শব্দ হবে। সৌভাগ্যবশত আমরা সুরিয়ানী ভাষার সেই মূল শব্দটি পাচ্ছি ইবনে হিশামের সীরাত গ্রন্থে এবং তার সমার্থক গ্রীক শব্দটি কি তাও সাথে সাথে ঐ একই গ্রন্থ থেকে জানা যাচ্ছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে ইবনে হিশাম ইউহান্নাস (যোহন)–এর সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ের ২৩ থেকে ২৭ পদ এবং ১৬ অধ্যায়ের পুরো অংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করেছেন এবং তাতে গ্রীক ভাষার "فارقليط" শব্দের জায়গায় সুরিয়ারী ভাষার منحمنا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অতপর ইবনে ইসহাক অথবা ইবনে হিশাম এভাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন যে, মুন্‌হামান্না (منحمنا) শব্দের অর্থ সুরিয়ানী ভাষায় মুহাম্মাদ এবং গ্রীক ভাষায় বারকালীতুস (برقليطس) হয়। (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৮)।

এখন দেখুন, ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণিত যে, খৃষ্টীয় নবম শতক পর্যন্ত ফিলিস্তিনের খৃষ্টান জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল সুরিয়ানী। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই এ অঞ্চল ইসলামবিজিত অঞ্চলের অন্তরভুক্ত ছিল। ইবনে ইসহাক ৭৬৮ খৃষ্টাব্দে এবং ইবনে হিশাম ৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইনতিকাল করেন। এর অর্থ হলো, তাঁদের উভয়ের যুগেই ফিলিস্তিনের খৃষ্টানরা সুরিয়ানী ভাষায় কথা বলত। আর ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশামের জন্য তাঁদের নিজ দেশের খৃষ্টান নাগরিকদের সাথে যোগাযোগ বা সম্পর্ক স্থাপন মোটেই কোন কঠিন বিষয় ছিল না। তা ছাড়াও সে সময় লক্ষ লক্ষ গ্রীক ভাষী খৃষ্টান ইসলামী ভূখণ্ডে বসবাস করত। তাই সুরিয়ানী ভাষার কোন্ শব্দ গ্রীক ভাষার কোন্ শব্দের সমর্থক তা জেনে নেয়াও তাঁদের জন্য কঠিন ছিল না। এখন কথা হলো, ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃত অনুবাদে যদি সুরিয়ানী শব্দ منحمنا (মুনহামান্না) ব্যবহৃত হয়ে থাকে আর ইবনে ইসহাক বা ইবনে হিশাম যদি তার ব্যাখ্যা এই করে থাকেন যে, আরবী ভাষায় তার সমার্থক শব্দ "মুহাম্মাদ" এবং গ্রীক ভাষায় "বারকালীতুস" তাহলে এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশই আর থাকে না যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নাম নিয়েই তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। সাথে সাথে একথাও জানা যায় যে, যোহন কর্তৃক গ্রীক ভাষায় লিখিত সুসমাচারে মূলত Periclytos শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে কোন এক সময়ে খৃষ্টানরা পরিবর্তন করে Paracletus বানিয়ে দিয়েছে।

সাত ঃ এর চেয়েও প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রমাণ হলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের একটি বর্ণনা। তাতে তিনি বলেছেন, নাজ্জাশী যখন তাঁর দেশ হাবশায় হিজরাতকারী মুহাজিরদের তাঁর দরবারে ডেকে পাঠালেন এবং হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুখে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাসমূহ সম্পর্কে শুনলেন তখন তিনি বলে উঠলেন ঃ

مَرْحَبًا بِكُمْ وَبِمَنْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ اَشْهَدُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّهُ الَّذِيْ نَجِدُ فِي الْاِنْجِيْلِ وَاَنَّهُ الَّذِيْ بَشَّرَ بِهِ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ (مسند احمد)

"স্বাগত জানাই তোমাদেরকে আর স্বাগত জানাই তাঁকেও যার নিকট থেকে তোমরা এসেছ। আমি সাক্ষ দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর রসূল। আর তিনিই সেই সত্তা যাঁর উল্লেখ আমরা ইনজীলে দেখতে পাই এবং তিনিই সেই সত্তা যার সুসংবাদ ঈসা ইবনে মারয়াম দিয়েছিলেন।"

বিভিন্ন হাদীসে এ কাহিনী খোদ হযরত জা'ফর (রা) এবং হযরত উম্মে সালমা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে শুধু এ কথাই প্রমাণিত হয় না যে, সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে নাজ্জাশী জানতেন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম একজন নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বরং একথাও প্রমাণিত হয় যে, বাইবেলের সুসমাচারে সেই নবীর এমন সব সুস্পষ্ট লক্ষণাদিরও উল্লেখ ছিল যার ভিত্তিতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই যে সেই নবী সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নজ্জাশী একটুও দ্বিধাগ্রস্ত হননি। তবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের এ সুসংবাদ সম্পর্কে নাজ্জাশীর জ্ঞানের সূত্র ও উৎস যোহন লিখিত এই সুসমাচার ছিল, না অন্য আর কোন উৎস ও সূত্র সে সময় বর্তমান ছিল, এ বর্ণনা থেকে তা জানা যায় না।

আট ঃ সত্য কথা হলো, খৃস্টান গীর্জাসমূহ কর্তৃক নির্ভরযোগ্য ও সর্বসমর্থিত (Canonical Gospels) বলে ঘোষিত চারখানি সুসমাচার যে কেবল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেই হযরত ঈসার (আ) ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ জানার নির্ভরযোগ্য উৎস হতে পারে না, তাই নয়, বরং তা খোদ হযরত ঈসার (আ) নিজের সঠিক জীবন বৃত্তান্ত ও শিক্ষাসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়ারও নির্ভরযোগ্য উৎস নয়। বরং তা জানার অধিক নির্ভরযোগ্য উৎস হচ্ছে বার্নাবাসের সেই সুসমাচার যাকে গীর্জাসমূহ বেআইনী ও অনির্ভরযোগ্য (Apocryphal) বলে উড়িয়ে দিয়ে থাকে। খৃস্টানরা তা গোপন করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। শত শত বছর পর্যন্ত তা লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন করে রাখা হয়েছিল। ইটালীয় ভাষায় অনূদিত এর একটি মাত্র কপি ষোড়শ শতাব্দীতে পোপ সিক্সটাসের (Sixtus) লাইব্রেরীতে পাওয়া যেত। কিন্তু তা পড়ার অনুমতি কারো ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে তা জন টোলেন্ড নামক এক ব্যক্তির হাতে আসে। অতপর বিভিন্ন হাত ঘুরে ১৭৩৮ খৃস্টাব্দে তা ভিয়েনার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীতে পৌছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এ গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ অক্সফোর্ডের ক্লেরিন্ডন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশিত হওয়ার পর পরই সম্ভবত খৃস্টান জগত আচ করতে পারে যে, যে ধর্মকে হযরত ঈসার নামে নামকরণ করা হয় এ গ্রন্থ তারই মূলোৎপাটন করছে। তাই এর মুদ্রিত কপিসমূহ বিশেষ কোন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে উধাও করে দেয়া হয়। এরপর তা আর কখনো প্রকাশিত হতে পারেনি। এ গ্রন্থেরই ইটালিয়ান ভাষার অনুবাদ থেকে স্প্যানিশ ভাষায় অনূদিত আরেকটি কপি অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাওয়া যেত। জর্জ সেল তাঁর কুরআনের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় এ গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেটাও কোথাও গায়েব করে দেয়া হয়েছিল এবং বর্তমানে কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায় না। অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত ইংরেজী অনুবাদের একটি ফটোষ্ট্যাট কপি দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। আমি

এর প্রতিটি শব্দ পড়েছি। আমার মনে হয়, এটা অতি বড় একটা নিয়ামত। খৃষ্টানরা কেবল হিংসা–বিদ্বেষ ও হঠকারিতার কারণে এর থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

খৃষ্টীয় সাহিত্যে যেখানেই এই ইনজিল বা সুসমাচারের উল্লেখ দেখা যায়, সেখানেই একথা বলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, এটা কোন মুসলমানের রচিত নকল সুসমাচার যা বার্নাবাসের নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এটা একটা নির্জলা মিথ্যা কথা। এত বড় একটা মিথ্যা বলার কারণ এই যে, এ গ্রন্থের বিভিন্নস্থানে স্পষ্টভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। প্রথমত এই সুসমাচার গ্রন্থখানি পড়লে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এ গ্রন্থ কোন মুসলমানের রচনা হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এ গ্রন্থ যদি কোন মুসলমানের রচিত হতো তাহলে মুসলমানদের মধ্যে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ত এবং মুসলিম মনীষী ও পন্ডিতদের রচনায় ব্যাপকভাবে এর উল্লেখ থাকত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অবস্থা হলো জর্জ সেলের কুরআনের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকার পূর্বে এর অস্তিত্ব সম্পর্কেই মুসলমানদের আদৌ জানা ছিল না। তাবারয়ী, ইয়া'কূবী, মাস'উদী, আল বিরুনী ও ইবনে হাযম এবং অন্যান্য গ্রন্থকারগণ ছিলেন খৃষ্টীয় সাহিত্য সম্পর্কে গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী মুসলিম মনীষী। তাঁদের কারো রচনাতেই খৃষ্টান ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনায় বার্নাবাসের সুসমাচারের আভাস–ইংগিত পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ইসলামী বিশ্বের গ্রন্থাগারসমূহে যেসব গ্রন্থরাজি ছিল ইবনে নাদীম রচিত "আল ফিহরিস্ত" এবং হাজী খলীফা রচিত "কাশফুয্ যুনুন" গ্রন্থই তার ব্যাপক ও সর্বোত্তম তালিকা গ্রন্থ। এ দু'টি গ্রন্থেও তার কোন উল্লেখ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর আগে কোন মুসলমান পণ্ডিতই বার্নাবাসের সুসমাচারের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। একথাটি মিথ্যা হওয়ার তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মেরও ৭৫ বছর আগে পোপ প্রথম গ্লাসিয়াসের (Gelasius) যুগে খারাপ আকীদা ও বিভ্রান্তিকর (Heretical) গ্রন্থরাজির যে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং পোপের দেয়া একটি ফতোয়ার জোরে যা পড়তে নিষেধ করা হয়েছিল তার মধ্যে বার্নাবাসের সুসমাচার (Evangelium Barnabe) গ্রন্থখানিও অন্তরভুক্ত ছিল। প্রশ্ন হলো, তখন মুসলমান এসেছিল কোথা থেকে যে এই নকল ইনজীল বা সুসমাচার রচনা করেছিল? খোদ খৃষ্টান পণ্ডিত পুরোহিতগণও একথা স্বীকার করেছেন যে, সিরিয়া, স্পেন, মিসর প্রভৃতি দেশে প্রাথমিক যুগের খৃষ্টান গীর্জাসমূহে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বার্নাবাসের সুসমাচার প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ষষ্ঠ শতাব্দীতে এসে তা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

নয় ঃ এই সুসমাচার থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম সম্পর্কে হযরত ঈসার সুসংবাদসমূহ উদ্ধৃত করার আগে গ্রন্থখানির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা প্রয়োজন যাতে তার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া যায় এবং একথাও জানা যায় যে, খৃষ্টানরা এর প্রতি এত মারমুখী কেন?

যে চারখানি সুসমাচারকে আইনসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করে বাইবেলের অন্তরভুক্ত করা হয়েছে তার কোনটিরই লেখক হযরত ঈসার সাহাবী ছিলেন না। তাঁরা কেউ একথা দাবীও করেননি যে, তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাহাবীদের নিকট থেকে তথ্য নিয়ে তাঁর সুসমাচারে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেসব উৎস থেকে তাঁরা তথ্য

গ্রহণ করেছেন তার কোন বরাতও তারা উল্লেখ করেননি। যদি তাঁরা বরাত উল্লেখ করতেন তাহলে তা থেকে জানা যেতো যে, বর্ণনাকারী যেসব ঘটনা বর্ণনা করছেন এবং যেসব বাণী উদ্ধৃত করছেন তা তিনি নিজে দেখেছেন এবং শুনেছেন না একজন বা কয়েকজনের মাধ্যমে তা তাঁর কাছে পৌছেছে? পক্ষান্তরে বার্নাবাসের সুসমাচারের লেখক বলেছেন আমি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রথম বারজন হাওয়ারীর একজন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমি হযরত ঈসা মাসীহর সাথে ছিলাম এবং নিজের চোখে দেখা ঘটনা এবং নিজের কানে শোনা বাণী এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করছি। শুধু এতটুকুই নয়, বরং গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে তিনি বলছেন, পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সময় হযরত মাসীহ আমাকে বলেছিলেন ঃ আমার ব্যাপারে যেসব ভুল ধারণা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে তা বিদূরিত করা এবং দুনিয়ার সামনে সঠিক অবস্থা তুলে ধরা তোমার দায়িত্ব।

কে ছিলেন এই বার্নাবাস? বাইবেলের "প্রেরিতদের কার্য" পুস্তকে এই নামের এক ব্যক্তির উল্লেখ বার বার এসেছে। এ ব্যক্তি ছিল সাইপ্রাসের এক ইহুদী পরিবারের লোক। খৃস্টান ধর্মের প্রচার এবং ঈসা মাসীহর অনুসারীদের সাহায্য–সহযোগিতার ক্ষেত্রে তার সেবা ও অবদানের অনেক প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু কখন সে মাসীহর ধর্ম গ্রহণ করেছিল তা কোথাও বলা হয়নি এবং প্রাথমিক যুগের বারজন হাওয়ারীর যে তালিকা তিনটি সুসমাচারে দেয়া হয়েছে তার মধ্যে কোথাও তার নামের উল্লেখ নেই। তাই উক্ত সুসমাচারের লেখক সেই বার্নাবাস নিজে না অন্য কেউ তা বলা কঠিন। মথি এবং মার্ক হাওয়ারীদের (Apostles) নামের যে তালিকা দিয়েছেন বার্নাবাসের দেয়া তালিকা শুধু দু'টি নামের ক্ষেত্রে তাদের থেকে ভিন্ন। ঐ দু'টি নামের একটি হলো 'তূমা'। এ নামটির পরিবর্তে বার্নাবাস নিজের নাম উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়টি হলো 'শামাউন কানানী'। এ নামটির পরিবর্তে তিনি ইয়াহুদা ইবনে ইয়া'কূবের নাম উল্লেখ করেছেন। লুক লিখিত সুসমাচারে এই দ্বিতীয় নামটিরও উল্লেখ আছে। তাই এরূপ ধারণা করা যুক্তিসংগত যে, পরবর্তীকালে কোন এক সময় শুধু বার্নাবাসকে হাওয়ারীদের তালিকা থেকে বাদ দেয়ার জন্য তূমার নাম অন্তরভুক্ত করা হয়েছে যাতে তার সুসমাচার গ্রন্থের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আর নিজেদের ধর্মগ্রন্থসমূহে এ ধরনের রদবদল ও পরিবর্তন পরিবর্ধন করে নেয়া ঐ সব মহাত্মনদের দৃষ্টিতে কোন অন্যায় ও অবৈধ কাজ ছিল না।

কেউ যদি বার্নাবাসের এই ইনজীল বা সুসমাচার গ্রন্থখানি পক্ষপাত শূন্য ও বিদ্বেষমুক্ত মনে চোখ খুলে পড়ে এবং বাইবেল নতুন নিয়মের চারখানি সুসমাচারের সাথে তার তুলনা করে তাহলে সে একথা উপলব্ধি না করে পারবে না যে, এই গ্রন্থখানি উক্ত চারখানি গ্রন্থের চেয়ে অনেক উন্নত মানের। এতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জীবনের ঘটনাবলী অধিক বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যেন কেউ প্রকৃতপক্ষে সেখানকার সবকিছু দেখছিল এবং নিজেও তাতে শরীক ছিল। চারখানি সুসমাচারের অসংবদ্ধ ও খাপ ছাড়া কানিহীসমূহের তুলনায় এর ঐতিহাসিক বর্ণনা অধিক সুসংহত এবং ঘটনাসমূহের ধারাবাহিকতাও আরো ভালভাবে বোধগম্য। এতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষাসমূহ বাইবেলের চারখানি সুসমাচারের তুলনায় অধিক স্পষ্ট, বিস্তারিত এবং মর্মস্পর্শীরূপে বর্ণিত হয়েছে। এতে তাওহীদের শিক্ষা, শিরক খণ্ডন, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী, ইবাদাতের প্রাণসত্তা এবং উত্তম ও উন্নত চরিত্রের বিষয়াবলী

অত্যন্ত জোরালোভাবে, যুক্তি ও প্রমাণসহ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। যেসব শিক্ষণীয় উপমা ও উদাহরণের মাধ্যমে মাসীহ আলাইহিস সালাম যেসব বিষয় বর্ণনা করেছেন, চারখানি সুসমাচারে তার ছিঁটে ফোঁটাও নেই। তিনি কি ধরনের বিজ্ঞোচিত পন্থায় তাঁর শাগরিদদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতেন এ গ্রন্থ থেকে সে বিষয়টিও অধিক বিস্তারিতভাবে জানা যায়। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ভাষা, বাচনভঙ্গি এবং মেজাজ প্রকৃতি সম্পর্কে যার সামান্য পরিমাণও জ্ঞান আছে সে এই সুমাচার গ্রন্থখানি পাঠ করলে একথা স্বীকার না করে পারবে না যে, এটা পরবর্তীকালে কারো রচিত কোন নকল কাহিনী নয়। বরং চারখানি সুসমাচারের তুলনায় এতে হযরত ঈসা তাঁর প্রকৃত মর্যাদায় অধিকতর স্পষ্ট হয়ে আমাদের সামনে ফুটে ওঠেন। তাছাড়া সুসমাচার চতুষ্টয়ে তাঁর বিভিন্ন বাণীর মধ্যে যে বৈপরীত্য লক্ষ করা যায় এ গ্রন্থে তার নামগন্ধ পর্যন্ত নেই।

হযরত ঈসার জীবন ও শিক্ষা হিসেবে এ গ্রন্থে যা বর্ণিত হয়েছে, তা সঠিক অর্থে একজন নবীর জীবন ও শিক্ষা বলেই মনে হয়। এতে তিনি নিজেকে একজন নবী হিসেবেই পেশ করেছেন। পূর্ববর্তী সমস্ত নবী এবং আসমানী কিতাবসমূহকে সত্য বলে ঘোষণা করেছেন। এতে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, নবী–রসূলদের (আলাইহিমুস সালাম) শিক্ষা ছাড়া সত্যকে জানার অন্য কোন মাধ্যম নেই। যারা নবী–রসূলদের পরিত্যাগ করে তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই পরিত্যাগ করে। সমস্ত নবী–রসূল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের যে শিক্ষা দিয়েছেন তিনি হুবহু সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। এ গ্রন্থে তিনি নামায, রোযা এবং যাকাতের শিক্ষা দিচ্ছেন। এ গ্রন্থে বার্নাবাস বহুস্থানে তাদের নামাযের যে উল্লেখ করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, এই ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও তাহাজ্জুদের সময়ই তারা নামায পড়তেন এবং সর্বদা নামাযের আগে অযু করতেন। নবী–রসূলদের মধ্য থেকে হযরত দাউদ ও সুলায়মানকেও তিনি নবী বলে স্বীকৃতি দিতেন। অথচ ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাঁদেরকে নবীদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে রেখেছে। তিনি হযরত ইসমাঈলকেই 'যাবীহ' (যাঁকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে যবেহ করতে নিয়ে গিয়েছিলেন—অনুবাদক) বলে ঘোষণা করেন, একজন ইহুদী আলেমকে তিনি স্বীকার করান যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইসমাঈলই ছিলেন 'যাবীহ' কিন্তু বনী ইসরাঈলরা জোড়াতালি দিয়ে জোর করে হযরত ইসহাককে যাবীহ বানিয়ে রেখেছে। কুরআন মজীদে আখেরাত, কিয়ামত, জান্নাত ও দোযখ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তাঁর শিক্ষাও প্রায় তার কাছাকাছি।

দশ ঃ বার্নাবাসের সুসমাচারে বিভিন্নস্থানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে স্পষ্ট সুসংবাদের উল্লেখ থাকার কারণে যে খৃষ্টানরা এর বিরোধী তা নয়। কারণ নবীর (সা) জন্মেরও বহু আগে তারা এ গ্রন্থকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের উষ্মা ও অসন্তুষ্টির প্রকৃত কারণ উপলব্ধি করতে হলে বিষয়টি সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রথম যুগের অনুসারীগণ তাঁকে কেবল একজন নবী হিসেবে স্বীকার করতেন, হযরত মূসার শরীয়াতের অনুসরণ করতেন, আকীদা–বিশ্বাস, হুকুম–আহকাম ও ইবাদাত–বন্দেগীর ক্ষেত্রে নিজেদেরকে বনী ইসরাঈল জাতির অন্য সবার থেকে মোটেই আলাদা কিছু মনে করতেন না এবং ইহুদীদের সাথে তাদের বিরোধ

ছিল শুধু এতটুকু যে, তাঁরা হযরত ঈসাকে 'মাসীহ' হিসেবে মেনে নিয়ে তার প্রতি ঈমান এনেছিলেন, কিন্তু ইহুদীরা তাঁকে 'মাসীহ' হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাতো। পরবর্তীকালে সেন্টপল এই দলে শামিল হলে সে রোমান, গ্রীক এবং অন্যান্য অ-ইহুদী ও অ-ইসরাঈলী লোকদের মধ্যেও এ ধর্মের তাবলীগ ও প্রচার শুরু করে দেয়। এ উদ্দেশ্যে সে একে এমন একটি নতুন ধর্ম বানিয়ে ফেলে যার আকীদা-বিশ্বাস, মূলনীতি এবং হুকুম-আহকাম হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পেশকৃত ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল। এই ব্যক্তি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাহচর্য আদৌ পায়নি। বরং তাঁর জীবদ্দশায় সে ছিল তার চরম বিরোধী এবং তাঁর পরেও কয়েক বছর পর্যন্ত সে তাঁর অনুসারীদের চরম শত্রু ছিল। পরবর্তী সময়ে এই দলে শামিল হয়ে যখন সে একটি নতুন ধর্ম তৈরী করতে শুরু করে তখনও সে তার এ কাজের সমর্থনে হযরত ঈসার দেয়া কোন সনদ পেশ করেননি বরং নিজের 'কাশ্‌ফ' ও 'ইলহাম' বা মনের স্বতস্ফূর্ত সৎপ্রেরণার ভিত্তিতেই তা করেছে। নতুন এই ধর্ম রচনার ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য ছিল, ধর্ম হবে এমন যা দুনিয়ার সমস্ত অ-ইহুদী (Gentile) গ্রহণ করবে। সে ঘোষণা করলো, খৃস্টানরা ইহুদীদের শরীয়াতের সমস্ত বিধি-নিষেধ ও বাধ্য বাধকতা থেকে মুক্ত। সে পানাহারের ব্যাপারে হালাল ও হারামের সব বিধি-নিষেধ তুলে দিলো। সে খাতনার নির্দেশও বাতিল করে দিল অ-ইহুদীদের কাছে যা বিশেষভাবে অপছন্দনীয় ছিল। এমন কি সে 'মাসীহর' খোদায়ী, খোদার বেটা হওয়া এবং সমস্ত আদম সন্তানের জন্মগত পাপের কাফ্‌ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য শূলিবিদ্ধ হয়ে জীবন দেয়ার আকীদা-বিশ্বাসও গড়ে নিল। কারণ তা সাধারণভাবে সমস্ত মুশরিকের মেজাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। হযরত ঈসার (আ) প্রথম যুগের অনুসারীগণ এসব বিদ'আতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন কিন্তু সেন্টপল যে দরজা খুলে দিয়েছিল তা দিয়ে অ-ইহুদী খৃস্টানদের এক বিরাট সয়লাব এ ধর্মে ঢুকে পড়লো যার মোকাবেলায় ঐ নগণ্য সংখ্যক লোকগুলো কোনক্রমেই টিকে থাকতে পারলেন না। তা সত্ত্বেও তৃতীয় খৃস্টাব্দের শেষ ভাগ পর্যন্তও এমন বহুলোক ছিলো যারা হযরত ঈসার খোদা হওয়ার আকীদা অস্বীকার করতো। কিন্তু চতুর্থ খৃস্টাব্দের প্রারম্ভে (৩২৫ খৃঃ) নিকিয়ার (Nicaca) কাউন্সিল পল প্রবর্তিত আকীদা-বিশ্বাসকে খৃস্টানদের সর্বসম্মত ধর্ম হিসেবে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করে। অতপর রোমান সাম্রাজ্য খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করে এবং কাইজার থিওডোসিয়াসের সময় খৃস্ট ধর্মই সাম্রাজ্যের সরকারী ধর্ম হিসেবে পরিগণিত হয়। এরপর এটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার যে, যেসব গ্রন্থ এ আকীদার পরিপন্থী তা পরিত্যক্ত ঘোষিত হবে এবং কেবল সেই সব গ্রন্থরাজি নির্ভরযোগ্য বলে গৃহীত হবে যা এই আকীদার সাথে সংগতিপূর্ণ। ৩৬৭ খৃস্টাব্দে এথানাসিয়াসের (Athanasius) এক পত্রের দ্বারা প্রথমবারের মত স্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থরাজির একটি ঘোষণা দেয়া হয়। পরে ৩৮২ খৃস্টাব্দে পোপ ডেমাসিয়াসের (Damasius) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলন তা অনুমোদন করে এবং পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে পোপ গেলাসিয়াস (Gelasius) এই গ্রন্থসমষ্টিকে স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে প্রত্যাখাত গ্রন্থরাজির একটি তালিকাও প্রস্তুত করেন। অথচ পল প্রবর্তিত যেসব আকীদা-বিশ্বাসকে ভিত্তি করে ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল সেসব আকীদা-বিশ্বাসের কোন একটিও হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজে শিক্ষা দিয়েছিলেন বলে খৃস্টান পাদরী-পুরোহিতদের কেউ কখনো দাবী করতে পারেননি। বরং

যে সুসমাচারগুলো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহের অন্তরভুক্ত তার মধ্যেও হযরত ঈসার (আ) কোন বাণী থেকে ঐ সব আকায়েদের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এসব অগ্রহণযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে বার্নাবাসের সুসমাচারকে অন্তরভুক্ত করার কারণ হলো তা সরকারীভাবে গৃহীত খৃষ্টবাদের আকীদা-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ সম্পর্কে এর রচয়িতা গ্রন্থের শুরুতে বলছেন ঃ যেসব লোক শয়তানের প্রতারণায় পড়ে ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে। খাতনা করা অপ্রয়োজনীয় মনে করে এবং হারাম খাদ্যকে হালাল করে দেয় তাদের ধ্যান-ধারণা সংশোধনের উদ্দেশ্যে পলও এসব প্রতারিতদের একজন। তিনি বলছেন ঃ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যখন পৃথিবীতে ছিলেন তখন তাঁর মু'জিযাসমূহ দেখে মুশরিক রোমান সৈন্যরা সর্বপ্রথম তাঁকে খোদা এবং কেউ কেউ খোদার পুত্র বলতে শুরু করে। অতপর বনী ইসরাঈলদের সর্বসাধারণের মধ্যেও এই ছোঁয়াচে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এতে হযরত ঈসা (আ) অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে এই ভ্রান্ত আকীদা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যারা তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলতো তাদেরকে অভিশাপ দিলেন। অতপর এই আকীদার প্রতিবাদের জন্য তিনি তাঁর শাগরেদদের সমগ্র ইয়াহুদিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন এবং যার থেকে এসব মু'জিযা প্রকাশ পাচ্ছে, তাকে 'খোদা অথবা খোদার পুত্র' মনে করার ভ্রান্ত ও উদ্ভট ধারণা থেকে মানুষ যাতে বিরত থাকে সে জন্য যেসব মু'জিযা তাঁর নিজের থেকে প্রকাশ পেতো তাঁর দোয়ায় শাগরেদদের থেকেও সেসব মু'জিযা প্রকাশ করা হলো। এ ব্যাপারে তিনি হযরত ঈসার (আ) বক্তৃতাসমূহ বিস্তারিত উদ্ধৃতি করেছেন যাতে তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে এসব ভ্রান্ত আকীদার প্রতিবাদ করেছিলেন। আর এই গোমরাহী প্রসার লাভ করায় হযরত ঈসা (আ) কতটা বিচলিত ছিলেন, তাও তিনি এ গ্রন্থের স্থানে স্থানে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া বার্নাবাস পলের গড়া এ আকীদাও খন্ডন করেছেন যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ক্রুশে জীবন দিয়েছিলেন। তিনি নিজ চোখে দেখা যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন তাহলো, যে সময় ইয়াহুদা ইহুদী পুরোহিতদের নেতার নিকট থেকে ঘুষ গ্রহণ করে হযরত ঈসাকে গ্রেফতার করানোর জন্য সৈন্যদের নিয়ে আসলো তখন আল্লাহ তা'আলার হুকুমে চারজন ফেরেশতা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন এবং ইয়াহুদা ইসকার ইউতির আকৃতি ও কন্ঠ অবিকল হযরত ঈসার আকৃতি ও কন্ঠের মত করে দেয়া হলো। তাকেই শূলি বিদ্ধ করা হয়েছে, হযরত ঈসাকে (আ) নয়। এভাবে এই সুসমাচার গ্রন্থখানি পলের গড়া খৃষ্টান ধর্মের মূল উটপাটিত করে ফেলেছে এবং কুরআনের বক্তব্যকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছে। অথচ এসব বক্তব্যের কারণেই কুরআন নাযিলের ১১৫ বছর আগে খৃষ্টান পাদরীগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

এগার ঃ এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বার্নাবাসের ইনজিল বা সুসমাচার প্রকৃতপক্ষে বাইবেলের চারটি সুমাচার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য সুসমাচার। এ গ্রন্থ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা, জীবন-চরিত এবং বাণীসমূহ সঠিকভাবে তুলে ধরে। এটা খৃষ্টানদের দুর্ভাগ্য যে, এ গ্রন্থের সাহায্যে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস শুধরে নেয়া এবং হযরত ঈসার (আ) মূল শিক্ষাসমূহ জানার যে সুযোগ তারা লাভ করেছিল শুধু জিদ ও হঠকারিতার কারণে তা থেকে তারা বঞ্চিত থেকে গেল। বার্নাবাস হযরত ঈসা (আ) থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম সম্পর্কে যেসব সুসংবাদ বর্ণনা করেছেন এখন তা আমরা দ্বিধাহীনভাবে এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। এসব সুসংবাদের কোনটিতে

হযরত ঈসা (আ) নবীর (সা) নাম উল্লেখ করেছেন, কোনটিতে 'রসূলুল্লাহ' বলেছেন, কোনটিতে তাঁর জন্য 'মাসীহ' শব্দ ব্যবহার করেছেন, কোনটিতে 'প্রশংসার যোগ্য' (Admirable) বলেছেন, আবার কোনটিতে স্পষ্টভাবে এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছেন যা হুবহু لا اله الا الله محمد رسول الله এর সমার্থক। এখানে সবগুলো সুসংবাদবাণী উদ্ধৃত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তা এত অধিক সংখ্যক এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে পূর্বাপর প্রসংগে এসেছে যে তার সমন্বয়ে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থই তৈরী হতে পারে। আমরা তার মধ্য থেকে নমুনা হিসেবে এখানে কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করছি ঃ

"সমস্ত নবী—যাঁদেরকে আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, যাঁদের সংখ্যা এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার—অস্পষ্টভঙ্গিতে কথা বলেছেন। কিন্তু আমার পরে সমস্ত নবী এবং পবিত্র সত্তাসমূহের জ্যোতি আসবেন যিনি নবীদের বলা কথার অন্ধকার দিকের ওপর আলোকপাত করবেন। কারণ তিনি খোদার রাসূল।" (অধ্যায়—১৭)

"ফরিশী এবং লাবীরা বললো ঃ যদি তুমি মাসীহও না হয়ে থাকো, ইলিয়াসও না হয়ে থাকো কিংবা অন্য কোন নবীও না হয়ে থাকো তাহলে তুমি নতুন শিক্ষা দিচ্ছ কেন এবং নিজেকে মাসীহর চেয়ে বড় করেই বা পেশ করছো কেন? জবাবে ঈসা বললেন ঃ আমার দ্বারা আল্লাহ যেসব মু'জিযা দেখান তা প্রকাশ করে যে, আমি তাই বলি যা খোদা চান। অন্যথায় তোমরা যার কথা বলে থাকো, প্রকৃতপক্ষে আমি নিজেকে তার সেই (মাসীহ) চেয়ে বড় করে পেশ করার যোগ্য নই। যাকে তোমরা মাসীহ বলে থাকো আমি তো খোদার সেই রসূলের মোজার গিরা বা তাঁর জুতার ফিতা খোলারও উপযুক্ত নই, যাঁকে আমার আগে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, আমার পরে আসবেন এবং সত্যের বাণী নিয়ে আসবেন, যাতে তাঁর দীনের কোন সীমাবদ্ধতা না থাকে।" (অধ্যায়—৪২)

"আমি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তোমাদের বলছি, যেসব নবী এসেছেন তাঁরা সকলেই কেবল একটি মাত্র কওমের জন্য খোদার নিদর্শন হিসেবে সৃষ্টি হয়েছিলেন। তাই যেসব লোকের জন্য তাঁদের পাঠানো হয়েছিল তাদের মধ্যে ছাড়া সেই সব নবীর বাণী আর কোথাও প্রচারিত হয়নি। কিন্তু আল্লাহর রসূল যখন আসবেন, খোদা হয়তো তাঁকে নিজের হাতের মোহর দিয়ে পাঠাবেন এমনকি দুনিয়ার যেসব কওম তাঁর শিক্ষা লাভ করবে তাদেরকেই তিনি মুক্তি ও রহমত পৌছিয়ে দেবেন। তিনি খোদাহীন লোকদের ওপর কর্তৃত্ব নিয়ে আসবেন এবং এমনভাবে মূর্তি পূজার মূলোৎপাটন করবেন যে, শয়তান অস্থির হয়ে উঠবে।"

"এরপর শাগরেদদের সাথে দীর্ঘ কথাবার্তার সময় হযরত ঈসা (আ) স্পষ্ট করে একথা বলেন যে, সেই নবী হবেন বনী ইসমাঈল বংশের লোক।" (অধ্যায়—৪৩)

"এ জন্য আমি তোমাদের বলি যে, খোদার রসূল এমন এক দীপ্তি ও সৌন্দর্য যার দ্বারা খোদা তা'আলার সৃষ্ট প্রায় সব বস্তুই আনন্দিত হবে। কেননা, তিনি উপলব্ধি ও উপদেশ, বুদ্ধিমত্তা ও শক্তি, ভয় ও ভালবাসা এবং দূরদর্শিতা ও পরহেযগারীর প্রাণসত্তায় উজ্জীবিত। তিনি বদান্যতা ও দয়ামায়া, ন্যায়নিষ্ঠতা ও তাকওয়া এবং শিষ্টাচার ও ধৈর্যের প্রাণসত্তা দ্বারা গুণান্বিত। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাদের এই প্রাণসত্তা দান করেছেন তিনি তাদের তুলনায় তা তিনগুণ লাভ করেছেন। যে সময় তিনি দুনিয়ায় আসবেন সে সময়টা কত বরকতপূর্ণ ও কল্যাণময় হবে। নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করো, যেমনটি প্রত্যেক নবী তাঁকে

দেখেছেন তেমনি আমিও তাঁকে দেখেছি এবং সম্মান দেখিয়েছি। তাঁর রূহকে দেখেই আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াত দিয়েছেন। আর আমি যখন তাঁকে দেখলাম তখন আমার প্রাণ একথা বলতে গিয়ে পরম প্রশান্তিতে ভরে উঠলো যে, হে মুহাম্মাদ, খোদা তোমার সাথে থাকুন এবং তিনি যেন আমাকে তোমার জুতার ফিতা বেঁধে দেয়ার যোগ্য বানিয়ে দেন। কারণ, এই মর্যাদাটুকু পেলেও আমি একজন বড় নবী এবং খোদার এক পবিত্র সত্তা হিসেবে পরিগণিত হবো।" (অধ্যায়—৪৪)

"(আমার চলে যাওয়ার কারণে) তোমাদের মন যেন বিচলিত না হয় এবং তোমরা ভয় না পাও। কারণ, আমি তোমাদের সৃষ্টি করি নাই। বরং আল্লাহ তা'আলা আমাদের স্রষ্টা, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। বাকী রহিল আমার কথা। আমি এ সময় দুনিয়ায় এসেছি আল্লাহর সেই রাসূলের জন্য পথ পরিষ্কার করতে যিনি দুনিয়ার জন্য মুক্তি নিয়ে আসবেন..........ইন্দারিয়াস বললো ঃ হে মহান শিক্ষক, আমরা যাতে তাঁকে চিনতে পারি সে জন্য আপনি তাঁর কিছু নিদর্শন বলে দিন। ঈসা জবাব দিলেন ঃ তিনি তোমাদের যুগে আসবেন না, বরং তোমাদের বহু বছর পরে আসবেন যখন আমার 'ইনযিল' এতটা বিকৃত হয়ে যাবে যে, বড় জোর ত্রিশজন ঈমানদার অবশিষ্ট থাকবে। তখন আল্লাহ দুনিয়ার ওপরে অনুগ্রহ করবেন এবং তাঁর রাসূলকে পাঠাবেন। তাঁর মাথার ওপর সাদা মেঘ ছায়া দান করবে। তিনি যে, আল্লাহর মনোনীত তা এভাবে জানা যাবে এবং তাঁর দ্বারা দুনিয়া খোদার পরিচয় জানতে পারবে। খোদাহীনদের বিরুদ্ধে তিনি বিরাট শক্তি নিয়ে আসবেন এবং পৃথিবী থেকে মূর্তিপূজা উচ্ছেদ করবেন। তাঁর জন্য আমি খুবই আনন্দিত। কারণ, তাঁর মাধ্যমে আমাদের খোদাকে চেনা যাবে, তাঁর পবিত্রতা প্রমাণিত হবে এবং সারা দুনিয়া আমার সত্যতা জানতে পারবে। আর তিনি তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবেন যারা আমাকে মানুষের চেয়ে বড় কিছু সাব্যস্ত করবে..........তিনি এমন একটি সত্য নিয়ে আসবেন যা সমস্ত নবী কর্তৃক আনীত সত্যের চেয়ে অধিক স্পষ্ট হবে।" (অধ্যায়—৭২)

"খোদার প্রতিশ্রুতি এসেছিল, যেরুশালেমে সুলায়মানের উপাশনালয়ের মধ্যে অন্য কথাও নয়। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করো, এমন এক সময় আসবে, যখন খোদা অন্য এক শহরে তাঁর রহমত নাযিল করবেন। অতপর সব জায়গায় সঠিকভাবে তাঁর ইবাদত বন্দেগী হতে পারবে। আর আল্লাহ তাঁর রহমতে সব জায়গায় সঠিক ও সত্যিকার নামায কবুল করবেন..........আমি প্রকৃতপক্ষে ইসরাঈলের পরিবারগুলোর জন্য ত্রাণকারী নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। কিন্তু আমার পরে সারা দুনিয়ার জন্য খোদার প্রেরিত সেই মাসীহ আসবেন যার জন্য আল্লাহ সারা দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। তখন সারা দুনিয়ায় আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী হবে এবং তাঁর রহমত নাযিল হবে।" (অধ্যায়—৮৩)

"(ঈসা পুরোহিত সর্দারকে বললেন ঃ) জীবন্ত সেই খোদার শপথ, যাঁর জন্য আমার প্রাণ নিবেদিত। সারা বিশ্বের জাতিসমূহ যে মাসীহর আগমনের জন্য অপেক্ষা করছে, আমাদের পিতা ইবরাহীমকে (আ) আল্লাহ যাঁর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই বলে যে, তোমার বংশের মাধ্যমে পৃথিবীর সব জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে, সে মাসীহ তো আমি নই।"

(আদিপুস্তক ঃ অধ্যায় ঃ ২২ পদ—১৮)

"কিন্তু খোদা যখন আমাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাবেন তখন শয়তান পুনরায় এভাবে বিদ্রোহ ছড়াবে যাতে খোদাকে যারা ভয় করে না তারা আমাকে খোদা এবং খোদার বেটা হিসেবে মেনে নেয়। তার কারণে আমার বাণী এবং শিক্ষা বিকৃত করে ফেলা হবে, এমনকি বড়জোর ত্রিশ জন ঈমানদার লোক অবশিষ্ট থাকবে। সেই সময় খোদা দুনিয়ার প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং তাঁর সেই রসূলকে পাঠাবেন যাঁর জন্য তিনি দুনিয়ার এই সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন। যিনি শক্তিতে বলিয়ান হয়ে দক্ষিণ থেকে আসবেন এবং মূর্তিসমূহকে মূর্তির পূজারীদের সহ ধ্বংস করে ফেলবেন। শয়তান মানুষের ওপর যে কর্তৃত্ব লাভ করেছে তিনি তার থেকে সে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেবেন। যারা তাঁর ওপর ঈমান আনবে তাদের মুক্তির জন্য তিনি খোদার রহমত নিয়ে আসবেন। আর বড়ই সৌভাগ্যের অধিকারী তারা যারা তাঁর কথা মানবে।" (অধ্যায়—৯৬)

"পুরোহিত সদার জিজ্ঞেস করলো ঃ খোদার সেই রাসূলের পরে অন্য কোন নবী কি আসবেন? ঈসা জবাব দিলেন ঃ তাঁর পরে খোদার প্রেরিত আর কোন সত্য নবী আসবেন না। কিন্তু অনেক মিথ্যা নবী আসবে যে কারণে আমি দুঃখিত ও মনক্ষুণ্ন। কেননা খোদার ইনসাফপূর্ণ ফয়সালার কারণে শয়তান তাদের আবির্ভাব ঘটাবে। তারা আমার এই ইনযীলের আড়ালে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখবে।" (অধ্যায়—৯৭)

পুরোহিত সরদার জিজ্ঞেস করলো ঃ সে মাসীহকে কোন্ নামে ডাকা হবে এবং কি কি নিদর্শন তাঁর আগমনকে প্রকাশ করবে? ঈসা জবাব দিলেন ঃ সেই মাসীহর নাম 'প্রশংসা যোগ্য'। কেননা, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর রূহ সৃষ্টি করেছিলেন, তখন নিজেই তার এ নাম রেখেছিলেন এবং সেখানে তাঁকে ফেরেস্তাদের মত মর্যাদায় রাখা হয়েছিলো। খোদা বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ, অপেক্ষা কর। কেননা, তোমার কারণেই আমি জান্নাত, পৃথিবী এবং আরো অনেক 'মাখলুক' সৃষ্টি করবো। আর তা সব উপহার হিসেবে তোমাকে দেব। এমন কি যে তোমাকে মোবারকবাদ দেবে, তাকেও কল্যাণ দান করা হবে এবং যে তোমাকে অভিসম্পাত করবে তাকে অভিসম্পাত দেয়া হবে। যে সময় আমি তোমাকে দুনিয়ায় পাঠাবো তখন মুক্তির সংবাদ বাহক হিসেবে পাঠাবো। তোমার কথা হবে সত্য। আসমান ও যমীন স্থানচ্যুত হবে কিন্তু তোমার দীন টলবে না। তাই তাঁর পবিত্র ও কল্যাণময় নাম 'মুহাম্মাদ' (স)।" (অধ্যায়—৯৭)

বার্নাবাস লিখছেন ঃ এক সময়ে হযরত ঈসা (আ) তাঁর শাগরিদদের সামনে বললেন ঃ আমার শাগরিদদেরই একজন (পরবর্তী সময়ে দেখা গেল ইয়াহুদা ইসকার ইউতি সেই শাগরিদ) ৩০টি মুদ্রার বিনিময়ে আমাকে শত্রুদের কাছে বিক্রি করে দেবে। তারপরে বললেন ঃ

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে আমাকে বিক্রি করবে এরপর সে-ই আমার নামে মারা যাবে। কেননা, খোদা আমাকে পৃথিবী থেকে উপরে উঠিয়ে নেবেন এবং সেই বিশ্বাসঘাতকের চেহারা এমনভাবে পরিবর্তিত করে দেবেন যে, সবাই মনে করবে সে-ই আমি। তথাপি সে যখন জঘন্য মৃত্যুবরণ করবে তখন একটা সময়-কাল পর্যন্ত লাঞ্ছনা আমারই হতে থাকবে। কিন্তু খোদার পবিত্র রাসূল মুহাম্মাদ যখন আসবেন তখন সেই বদনাম দূর করে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা তা এ জন্য করবেন যে, আমি সেই মাসীহর সত্যতা স্বীকার

করেছি। সেজন্য তিনি আমাকে এই পুরস্কার দেবেন। লোকে জানতে পারবে আমি বেঁচে আছি এবং সেই লাঞ্ছনাকর মৃত্যুর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" (অধ্যায়—১১৩)

"(হযরত ঈসা শাগরিদদের বললেন ঃ) আমি সন্দেহাতীতভাবে তোমাদের বলছি, যদি মূসার গ্রন্থের সত্যতা বিকৃত করা না হতো তাহলে খোদা আমাদের পিতা দাউদকে অন্য একখানি গ্রন্থ দিতেন না। আর দাউদের গ্রন্থের মধ্যে যদি বিকৃতি ঘটানো না হতো তাহলে খোদা আমাকে ইনযিল দিতেন না। কারণ, মহাপ্রভু আমাদের খোদা পরিবর্তিত হওয়ার নন। আর তিনি সব মানুষকে একই বাণী দিয়েছেন। তাই যখন আল্লাহর রাসূল আসবেন এ সব জিনিসকে পরিষ্কার করে দেয়ার জন্যই আসবেন যা দিয়ে খোদাহীন লোকেরা আমার কিতাবকে কলুষিত করে ফেলেছে।" (অধ্যায়—১২৪)

এসব সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত ভবিষ্যদ্বাণীতে শুধু তিনটি বিষয় এমন দেখা যায় যা আপাতঃ দৃষ্টিতে খটকা লাগায়। এক, এসব ভবিষ্যদ্বাণীতে এবং বার্নাবাসের ইনজীলের আরো কিছু বাক্যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজের মাসীহ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। দুই, শুধু ওপরে উদ্ধৃত বাক্যসমূহে নয় বরং এ সুসমাচারের বহুস্থানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মূল আরবী নাম 'মুহাম্মাদ' লেখা হয়েছে। অথচ পরবর্তীকালে আসবেন এমন কোন পবিত্র ব্যক্তি ও সত্তার মূল নাম উল্লেখ করা নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর সাধারণ নিয়ম বা রীতি নয়। তিন, এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'মাসীহ' বলা হয়েছে।

প্রথম সন্দেহের জবাব হলো, শুধু বার্নাবাসের সুসমাচারেই নয়, বরং লূক লিখিত সুসমাচারেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁকে 'মাসীহ' বলতে তাঁর শাগরিদদের নিষেধ করেছিলেন। লূকের ভাষা হলো ঃ "তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে? পিতর উত্তর করিয়া কহিলেন, ঈশ্বরের সেই খ্রীস্ট। তখন তিনি তাহাদিগকে দৃঢ়রূপে বলিয়া দিলেন ও আদেশ করিলেন, একথা কাহাকেও বলিও না।" (অধ্যায়—৯ পদ—২১ ও ২২) সম্ভবত এর কারণ ছিল এই যে, বনী ইসরাঈল জাতি যে মাসীহর আগমনের অপেক্ষায় ছিল তাঁর সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল, তিনি তরবারির জোরে ন্যায় ও সত্যের দুশমনদের পরাজিত করবেন।' তাই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছেন, আমি সেই 'মাসীহ' নই। তিনি আমার পরে আসবেন।

দ্বিতীয় সন্দেহের জবাব হলো, বার্নাবাসের সুসমাচারের যে ইটালিয়ান অনুবাদ বর্তমানে পাওয়া যায় তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম 'মুহাম্মাদ' লিখিত আছে। কিন্তু একথা কেউ-ই জানে না যে, এ গ্রন্থ কোন্ কোন্ ভাষার অনুবাদের অনুবাদ হয়ে অবশেষে ইটালিয়ান ভাষায় পৌঁছেছে। একথা সুস্পষ্ট যে, বার্নাবাসের মূল সুসমাচার গ্রন্থখানা সুরিয়ানী ভাষায়ই হওয়ার কথা। কারণ হযরত ঈসা (আ) এবং তার অনুসারীদের ভাষা ছিল সুরিয়ানী। সেই মূল গ্রন্থখানা পাওয়া গেলে জানা যেতো, তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নাম কি লেখা হয়েছিলো। এখন যতটুকু অনুমান করা যায় তা হলো, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম হয়তো মূল শব্দ ব্যবহার করেছিলেন "مُنْحَمَنَّا" (মুনহামান্না) যোহন লিখিত সুসমাচারের বরাত দিয়ে ইবনে ইসহাক যা বর্ণনা করেছেন। অতপর অনুবাদকারীরা হয়তো নিজ নিজ ভাষায় তার অনুবাদ করেছেন। এরপর কোন অনুবাদক হয়তো মনে করেছেন, ভবিষ্যদ্বাণীতে আগমনকারীর যে নাম বলা হয়েছে

তা পুরোপুরি 'মুহাম্মাদ' শব্দের সমার্থক। তাই তিনি নবীর (সা) পবিত্র এই নামটিই লিখে দিয়েছেন। অতএব, এ নামটির স্পষ্ট উল্লেখ থাকাই এরূপ সন্দেহ পোষণের জন্য মোটেই যথেষ্ট নয় যে, বার্নাবাসের গোটা সুসমাচারটাই কোন মুসলমানের নকল রচনা।

তৃতীয় সন্দেহের জবাব হলো, 'মাসীহ' শব্দটি মূলত একটি ইসরাঈলী পরিভাষা। কুরআন মজীদে কেবল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য এই পরিভাষাটি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, ইহুদীরা তাঁর 'মাসীহ' হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করতো। মূলত এটি কুরআন মজীদের কোন পরিভাষা নয়। আর কুরআন মজীদের কথাও এটিকে ইসরাঈলীদের পারিভাষিক অর্থে ব্যবহারও করা হয়নি। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যদি 'মাসীহ' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন আর কুরআনে তাঁর জন্য এ শব্দটি ব্যবহার না করা হয়ে থাকে তাহলে তার অর্থ এই নয় যে, বার্নাবাসের সুসমাচার তাঁর সাথে এমন কিছু সম্পর্কিত করছে যা কুরআন অস্বীকার করে। আসলে বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে একটা প্রথা চলে আসছিলো। প্রথমটি হলো, কোন বস্তু কিংবা ব্যক্তিকে যখন কোন পবিত্র উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করা হতো তখন সেই বস্তু বা ব্যক্তির মাথার ওপর তেল মেখে দিয়ে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই উদ্দেশ্যে নিবেদিত করা হতো। ইবরানী (ইব্রিয়) ভাষায় তেল মাখার এই কাজকে "মাস্হ" বলা হতো। আর যে বস্তু বা ব্যক্তির ওপর তা মেখে দেয়া হতো তাকে 'মাসীহ' বলা হতো। উপাসনালয়ের পাত্রসমূহ এভাবে মুছে বা মর্দন করে উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট করা হতো। যাজক ও পুরোহিতদের পৌরহিত্যের (Priesthood) আসনে সমাসীন করার সময়ও 'মাস্হ' করা হতো। বাদশাহ এবং নবীকেও যখন খোদার তরফ থেকে বাদশাহী বা নবুওয়াতের জন্য নিয়োগ করা হতো তখন 'মাসহ্' করা হতো। সুতরাং বাইবেলের বর্ণনা মতে বনী ইসরাঈল জাতির ইতিহাসে বহু 'মাসীহ'র সন্ধান পাওয়া যায়। পুরোহিত হিসেবে হযরত হারুন 'মাসীহ' ছিলেন। হযরত মূসা যাজক এবং নবী হিসেবে, তালূত বাদশাহ হিসেবে, হযরত দাউদ বাদশাহ এবং নবী হিসেবে, মালকে সাদাক বাদশাহ এবং যাজক হিসেবে এবং হযরত "আল–ইয়াসা" নবী হিসেবে "মাসীহ" ছিলেন। পরবর্তীকালে কাউকে তেল মেখে দিয়ে নিবেদিত করার প্রয়োজনও ছিল না। বরং আল্লাহর তরফ থেকে কারো আদিষ্ট হওয়াই 'মাসীহ' হওয়ার সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে রাজাবলী–১ এর ১৯ অধ্যায় দেখুন। এতে বলা হয়েছে যে, খোদা হযরত ইলিয়াসকে (এলিয়) আদেশ করলেন, তুমি ইসরায়েলকে 'মাসহ' কর, সে আরামের (দামেশক) বাদশাহ হিসেবে অভিষিক্ত হোক এবং নিমশির পুত্র যেহুকে ইসরাঈলের উপরে রাজপদে অভিষেক কর। আর তোমার স্থলাভিষিক্ত নবী হওয়ার জন্য ইলীশায়কে (আল ইয়াসা) অভিষেক কর। তাঁদের কারো মাথায়ই তেল মর্দন করা হয়নি। খোদার পক্ষ থেকে তাঁর আদিষ্ট হওয়ার সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেয়াই যেন তাঁকে 'মাসাহ' বা অভিষিক্ত করার শামিল ছিল। অতএব, ইসরাঈলী ধ্যান–ধারণা অনুসারে 'মাসীহ' শব্দটি মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হওয়ার সমার্থক ছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে শব্দটিকে এ অর্থেই ব্যবহার করেছিলেন। (ইসরাঈলীদের দৃষ্টিতে "মাসীহ" শব্দটির অর্থ কি তা বুঝার জন্য দেখুন ঃ সাইক্লোপেডিয়া অব বাইবেলিক্যাল লিটারেচার, শব্দ "মিস্ইয়াহ")

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে।[১০] অথচ তাকে শুধু ইসলামের (আল্লাহর আনুগত্য করার) দিকে আহবান করা হচ্ছে।[১১] আল্লাহ এ রকম জালেমদের হিদায়াত দেন না। এরা তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহর ফায়সালা হলো তিনি তার নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন। কাফেররা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন।[১২] তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত এবং 'দীনে হক' দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি এ দীনকে অন্য সকল দীনের ওপর বিজয়ী করেন, চাই তা মুশরিকদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন।[১৩]

৯. মূল আয়াতে سحر শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে سحر শব্দটি যাদু অর্থে নয়, বরং ধোঁকা ও প্রতারণা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় যাদু অর্থে এ শব্দটির ব্যবহার যেমন পরিচিত তেমনি ধোঁকা ও প্রতারণা অর্থে ব্যবহারও পরিচিত। যেমন ঃ আরবীতে বলা হয় سحره اى خدعه সে অমুক ব্যক্তিকে যাদু করেছে অর্থাৎ ধোঁকা দিয়েছে। যে দৃষ্টি ও চাহনি মন কেড়ে নেয় তাকে বলা হয় عين ساحرة যাদুময়ী চোখ। যে প্রান্তরে চারদিকে কেবল মরীচিকা আর মরীচিকাই চোখে পড়ে তাকে ارض ساحرة (বা যাদুর প্রান্তর) বলে। রৌপ্যকে পালিশ করে স্বর্ণের মত উজ্জল করা হলে তাকে বলা হয় سحرت الفضة । সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, যখন সেই নবী, যার আগমনের সুসংবাদ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দিয়েছিলেন স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আসলেন তখন বনী ইসরাঈল এবং হযরত ঈসার উম্মাতগণ তাঁর নবুওয়াতের দাবীকে খোলাখুলি প্রতারণা ও জালিয়াতি বলে ঘোষণা করল।

১০. অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত নবীকে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার বলে অভিহিত করা এবং নবীর ওপর আল্লাহর যে বাণী নাযিল হচ্ছে তাকে নবীর নিজের তৈরী কথা বলে ধরে নেয়া।

১১. অর্থাৎ আল্লাহর এই সত্য নবীকে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার বলাটাই কোন ছোট খাট জুলুম নয়। কিন্তু সেটা আরো বড় জুলুম হয়ে দাঁড়ায় যখন তিনি আল্লাহর দাসত্ব ও

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ
أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ
وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ
عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ
وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

২ রুকূ'

হে ঈমান আনয়নকারীগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের[১৪] সন্ধান দেবো যা তোমাদেরকে কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দেবে? তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের[১৫] প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করো এটাই তোমাদের জন্য অতিব কল্যাণকর যদি তোমরা তা জান।[১৬] আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমনসব বাগানে প্রবেশ করাবেন যার নীচে দিয়ে ঝর্ণাধারা বয়ে চলবে। আর চিরস্থায়ী বসবাসের জায়গা জান্নাতের মধ্যে তোমাদেরকে সর্বোত্তম ঘর দান করবেন। এটাই বড় সফলতা।[১৭] আর আরেক জিনিস যা তোমরা আকাংখা করো আল্লাহ তাও তোমাদের দেবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং অতি নিকটবর্তী সময়ে বিজয়।[১৮] হে নবী! ঈমানদারদেরকে এর সুসংবাদ দান করো।

আনুগত্যের প্রতি আহবান জানান আর জবাবে শ্রোতা তাঁকে গালি দিতে থাকে এবং তাঁর দাওয়াত ও আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য মিথ্যা কলঙ্ক লেপন ও অপবাদ আরোপের কৌশল অবলম্বন করে।

১২. স্মরণ রাখা দরকার যে, এ আয়াতটি ৩ হিজরী সনে ওহুদ যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছিল। সে সময় ইসলাম কেবল মদীনা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, মুসলমানদের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশী ছিল না এবং গোটা আরবভূমি দীন ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য পুরোপুরি সংকল্পবদ্ধ ছিল। ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছিল তার কারণে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ন হয়েছিল এবং আশেপাশের গোত্রসমূহ তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসী হয়ে উঠেছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে বলা হয়েছে, আল্লাহর

এই 'নূর' কারো নিভিয়ে দেয়াতে নিভবে না, বরং পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হবে এবং সারা পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে ক্ষান্ত হবে। এটা একটা স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী, যা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামের ভবিষ্যত কি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সেই সময় আর কে তা জানতো? মানুষ তো তখন দিব্যি দেখছিল, এটা একটা নিভু নিভু প্রদীপ যা নিভিয়ে ফেলার জন্য প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে।

১৩. 'মুশরিকদের জন্য অসহনীয় হলেও।' অর্থাৎ যারা আল্লাহর দাসত্বের সাথে অন্যদের দাসত্বও করে থাকে এবং আল্লাহর দীনের সাথে অন্য সব দীন ও বিধানকে সংমিশ্রিত করে, শুধু এক আল্লাহর আনুগত্য ও হিদায়াতের ওপর গোটা জীবনব্যবস্থা কায়েম হোক তারা তা চায় না। যারা ইচ্ছামত যে কোন প্রভু ও উপাস্যের দাসত্ব করতে সংকল্পবদ্ধ এবং যে কোন দর্শন ও মতবাদের ওপর নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা এবং তাহযীব তামাদ্দুনের ভিত্তিস্থাপন করতে প্রস্তুত এমনসব লোকের বিরোধিতার মুখেও বলা হচ্ছে যে, তাদের সাথে আপোষ করার জন্য আল্লাহর রসূলকে পাঠানো হয়নি। বরং তাকে পাঠানো হয়েছে এ জন্যে যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হিদায়াত ও জীবনব্যবস্থা এনেছেন তাকে গোটা জীবনের সব দিক ও বিভাগের ওপর বিজয়ী করে দেবেন। অবস্থা যাই হোক না কেন, তাঁকে এ কাজ করতেই হবে। কাফের ও মুশরিকরা তা মেনে নিক আর না নিক এবং এর বিরোধিতায় সর্বশক্তি নিয়োগ করলেও সর্বাবস্থায় রসূলের এ মিশন সফলকাম হবে এবং পূর্ণতা লাভ করবে। ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের আরো দু'টি স্থানে এ ঘোষণা এসেছে। এক, সূরা তাওবার ৩৩ আয়াতে। দুই, সূরা ফাতহের ২৮ আয়াতে। এ স্থানে তৃতীয়বারের মত এ ঘোষণার পুনরুক্তি করা হচ্ছে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন আত তাওবা, টীকা ৩২; সূরা আল ফাত্হ, টীকা ৫১ ।)

১৪. ব্যবসায় এমন জিনিস যাতে মানুষ তার অর্থ, সময়, শ্রম এবং মেধা ও যোগ্যতা নিয়োজিত করে মুনাফা অর্জনের জন্য। এ বিষয়টি বিবেচনা করেই এখানে ঈমান ও আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে ব্যবসায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই পথে নিজের সবকিছু নিয়োজিত করলে সেই মুনাফা তুমি অর্জন করতে পারবে যার কথা একটু পরেই বলা হচ্ছে। সূরা তাওবার ১১১ আয়াতে এই বিষয়টিই অন্য এক ভঙ্গিতে বলা হয়েছে ঃ (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আত্ তাওবা, টীকা ১০৬)।

১৫. যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে যখন বলা হয় ঈমান আনো তখন আপনা থেকেই তার অর্থ দাঁড়ায়, খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মুসলমান হও। ঈমানের মৌখিক দাবীই শুধু করো না, বরং যে বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছো তার জন্য সব রকম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।

১৬. অর্থাৎ এ ব্যবসায় তোমাদের জন্য দুনিয়ার সব ব্যবসায় থেকে অনেক বেশী উত্তম।

১৭. এটা সেই ব্যবসায়ের আসল মুনাফা। আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে এই মুনাফাই অর্জিত হবে। এক, আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া। দুই, গোনাহসমূহ মাফ হওয়া। তিন, আল্লাহর সেই জান্নাতে প্রবেশ করা যার নিয়ামতসমূহ চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর।

১৮. যদিও পৃথিবীতে বিজয় ও সফলতা লাভ করাও একটা বড় নিয়ামত। কিন্তু মু'মিনের নিকট প্রকৃত গুরুত্বের বিষয় এ পৃথিবীর সফলতা নয়, বরং আখেরাতের

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوٓا۟ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّـۧنَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۖ فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا۟ ظَـٰهِرِينَ ﴿١٤﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও। ঠিক তেমনি, যখন ঈসা ইবনে মারয়াম হাওয়ারীদের[১৯] উদ্দেশ করে বলেছিলেন : আল্লাহর দিকে (আহবান করার ক্ষেত্রে) কে আমার সাহায্যকারী? তখন হাওয়ারীরা জবাব দিয়েছিলো : আমরা আছি আল্লাহর সাহায্যকারী।[২০] সেই সময় বনী ইসরাঈল জাতির একটি দল ঈমান আনয়ন করেছিল এবং আরেকটি দল অস্বীকার করেছিল। অতপর আমি ঈমান আনয়নকারীদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি যোগালাম এবং তারাই বিজয়ী হয়ে গেল।[২১]

সফলতা। এ কারণেই দুনিয়ার এই জীবনে যে শুভ ফলাফল অর্জিত হবে তার উল্লেখ পরে করা হয়েছে আর আখেরাতে যে ফলাফল পাওয়া যাবে তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে।

১৯. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সংগীদের জন্য বাইবেলে সাধারণত 'শিষ্য' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে খৃস্টানদের মধ্যে তাদের জন্য রসূল (Apostles) পরিভাষাটি চালু হয়। তবে তারা আল্লাহর রসূল ছিল এ অর্থে তাদেরকে রসূল বলা হতো না, বরং তাদেরকে রসূল বলা হতো এ অর্থে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে ফিলিস্তিনের বিভিন্ন অঞ্চলে মুবাল্লিগ হিসেবে পাঠাতেন। যেসব লোককে হাইকলের জন্য চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পাঠানো হতো তাদের জন্য এ শব্দটির ব্যবহার ইহুদীদের মধ্যে পূর্ব থেকেই ছিল। পক্ষান্তরে কুরআন মজীদে এর পরিবর্তে হাওয়ারী পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে যা এ দু'টি খৃষ্টীয় পরিভাষা থেকে উত্তম। এ শব্দটির মূল হলো حور যার অর্থ শুভ্রতা। ধোপাকে حوارى (হাওয়ারী) বলা হয় এ জন্য যে, সে কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার ও সাদা করে দেয়। খাঁটি ও নিখাদ জিনিসকেও হাওয়ারী বলা হয়। চালুনি দিয়ে চেলে যে আটার ভূষি ও ছাল বের করে আলাদা করা হয়েছে তাকে حوارى (হুওয়ারা) বলে। এ অর্থে অকৃত্রিম বন্ধু ও নিঃস্বার্থ সাহায্যকারীকে বুঝাতেও এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ইবনে সাইয়েদ বলেন : যেসব ব্যক্তি কাউকে অধিক মাত্রায় সাহায্য করে তাকেও ঐ ব্যক্তির হাওয়ারী বলে। (লিসানুল আরব)

২০. যারা আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে আহবান জানায় এবং কুফরের মোকাবিলায় আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে কুরআন মজীদের যেসব জায়গায় তাদেরকে আল্লাহর সাহায্যকারী বলা হয়েছে এটি তার মধ্যে সর্বশেষ জায়গা। ইতিপূর্বে

সূরা আলে ইমরানের ৫২ আয়াত, সূরা হাজ্জের ৪০ আয়াত, সূরা মুহাম্মাদের ৭ আয়াত, সূরা হাদীদের ২৫ আয়াত এবং সূরা হাশরের ৮ আয়াতে এই একই বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাফহীমুল কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ৫০নং টীকা, সূরা হজ্জের ৮৪নং টীকা, সূরা মুহাম্মাদের ১২নং টীকা এবং সূরা হাদীদের ৪৭নং টীকায় আমরা এর ব্যাখ্যা পেশ করেছি। তাছাড়া সূরা মুহাম্মাদের ৯নং টীকায়ও এ বিষয়টির একটি দিক সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এসব সত্ত্বেও কারো কারো মনে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, সমস্ত সৃষ্টির কারো উপরই নির্ভরশীল নন, কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী তখন তাঁর কোন বান্দা কেমন করে তাঁর সাহায্যকারী হতে পারে? এই খটকা এবং সন্দেহ-সংশয় দূর করার জন্য আমরা বিষয়টির আরো কিছু ব্যাখ্যা এখানে পেশ করছি।

এসব লোককে আল্লাহর সাহায্যকারী মূলত এজন্য বলা হয়নি যে, কোন কাজের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর কোন সৃষ্টির মুখাপেক্ষী (নাউযুবিল্লাহ)। বরং তাদেরকে আল্লাহর সাহায্যকারী এ জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জীবনের যে গণ্ডিতে কুফর ও ঈমান এবং আনুগত্য ও নাফরমানীর যে স্বাধীনতা দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অজেয় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জোর করে মানুষকে মু'মিন ও অনুগত বানান না। বরং নবী-রসূল ও কিতাবের সাহায্যে তাদেরকে উপদেশ দেন, শিক্ষাদান করেন এবং বুঝিয়েসুজিয়ে সঠিক পথ দেখানোর পন্থা অবলম্বন করেন। যে ব্যক্তি এই উপদেশ ও শিক্ষাকে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে গ্রহণ করে সে মু'মিন; যে কাজে পরিণত করে সে মুসলিম, অনুগত ও আবেদ; যে আল্লাহভীতির নীতি অনুসরণ করে সে মুত্তাকী, যে নেকীর কাজে অগ্রগামী হয় সে 'মুহ্সিন' এবং এর থেকে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে যে এই উপদেশ ও শিক্ষার সাহায্যে আল্লাহর বান্দাদের সংস্কার ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে এবং কুফর ও পাপাচারের স্থলে আল্লাহর আনুগত্যের বিধান কায়েম করার জন্য কাজ করতে শুরু করে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর সাহায্যকারী বলে আখ্যায়িত করেন। যেমন উপরোক্ত আয়াতের কয়েকটি স্থানে স্পষ্ট ভাষায় এ কথাটিই বলা হয়েছে। যদি আল্লাহর সাহায্যকারী না বলে আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী বলা মূল উদ্দেশ্য হতো তাহলে انصار الله না বলে انصار دين الله বলা হতো, ينصرون الله না বলে ينصرون دين الله বলা হতো এবং ان تنصروا الله না বলে ان تنصروا دين الله বলা হতো। একটি বিষয় বলার জন্য আল্লাহ তা'আলা যখন কয়েকটি স্থানে একের পর এক একই বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করেছেন তখন তা স্পষ্টভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ ধরনের লোকদের আল্লাহর সাহায্যকারী বলাই এর মূল উদ্দেশ্য। তবে এই সাহায্য নাউযুবিল্লাহ এ অর্থে নয় যে, এসব লোক আল্লাহ তা'আলার এমন কোন প্রয়োজন পূরণ করছে যার তিনি মুখাপেক্ষী। বরং এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যে কাজ তাঁর জবরদস্ত শক্তির জোরে না করে তাঁর নবী-রসূল ও কিতাবের সাহায্যে করতে চান এসব লোক সেই কাজে অংশগ্রহণ করছে।

২১. ঈসা মাসীহর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী বলতে ইহুদী এবং ঈমান গ্রহণকারী বলতে খৃষ্টান ও মুসলমান উভয়কে বুঝানো হয়েছে আর এই দুই জাতিকেই আল্লাহ তা'আলা ঈসা মাসীহর অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। এখানে

একথাটি বলার উদ্দেশ্য মুসলমানদের এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দেয়া যে, হযরত ঈসার অনুসারীরা ইতিপূর্বেও যেভাবে তাঁর অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন এখনও তেমনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীরা তাঁর অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবেন।

আল জুম'আ

৬২

নামকরণ

৯নং আয়াতের إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ আয়াতাংশ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সূরার মধ্যে যদিও জুম'আর নামাযের আহকাম বা বিধি–বিধানও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু জুম'আ সামগ্রিকভাবে এর বিষয়বস্তুর শিরোনাম নয়। বরং অন্যান্য সূরার নামের মত এটিও এ সূরার প্রতিকী বা পরিচয়মূলক নাম।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ ৭ হিজরীতে সম্ভবত খায়বার বিজয়ের সময় অথবা তার নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়েছে। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইবনে জারীর হযরত আবু হুরাইরা বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, আমরা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে বসে থাকা অবস্থায় এ আয়াতটি নাযিল হয়। হযরত আবু হুরাইরা সম্পর্কে এ বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে এবং খায়বার বিজয়ের পূর্বে ঈমান এনেছিলেন। ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুসারে ৭ হিজরীর মুহাররাম মাসে আর ইবনে সা'দের বর্ণনা অনুসারে জমাদিউল উলা মাসে খায়বার বিজিত হয়েছিল। অতএব যুক্তির দাবী হলো, ইহুদীদের এই সর্বশেষ দুর্গটি বিজিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্বোধন করে এ আয়াতগুলো নাযিল করে থাকবেন কিংবা খায়বারের পরিণাম দেখে উত্তর হিজাযের সমস্ত ইহুদী জনপদ যখন ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত হয়ে গিয়েছিল তখন হয়তো এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল।

দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতগুলো হিজরাতের পরে অল্পদিনের মধ্যে নাযির হয়েছিল। কেননা নবী (সা) মদীনা পৌঁছার পর পঞ্চম দিনেই জুম'আর নামায কায়েম করেছিলেন। এই রুকূ'র শেষ আয়াতটিতে যে ঘটনার প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে তা স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, আয়াতটি জুম'আর নামায আদায় করার ব্যবস্থা হওয়ার পর এমন এক সময়ে নাযিল হয়ে থাকবে যখন মানুষ দীনী উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সমাবেশের আদব–কায়দা ও নিয়ম–কানুন সম্পর্কে তখনও পুরো প্রশিক্ষণ লাভ করেনি।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ওপরে আমরা একথা বলেছি যে, এ সূরার দু'টি রুকূ' দু'টি ভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। অতএব এর বিষয়বস্তু যেমন আলাদা তেমনি যাদের সম্বোধন করে নাযিল করা হয়েছে সে লোকজনও আলাদা। তবে এ দু'টি রুকূ'র আয়াতসমূহের মধ্যে এক প্রকার সাদৃশ্য আছে

এবং এ জন্য তা একই সূরাতে সন্নিবেশিত হয়েছে। সাদৃশ্য কি তা বুঝার আগে রুকূ' দু'টির বিষয়বস্তু আলাদাভাবে আমাদের বুঝে নেয়া উচিত।

ইসলামী আন্দোলনের পথ রোধ করার জন্য বিগত ছয় বছরে ইহুদীরা যেসব প্রচেষ্টা চালিয়েছে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এমনি এক সময় প্রথম রুকূ'র আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল। প্রথমত মদীনায় তাদের তিন তিনটি শক্তিশালী গোত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছিল। তারা এর ফল দেখতে পেল এই যে, একটি গোত্র সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল এবং অপর দু'টি গোত্রকে দেশান্তরিত হতে হলো। অতপর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা আরবের বহুসংখ্যক গোত্রকে মদীনার ওপর আক্রমণের জন্য নিয়ে আসল কিন্তু আহযাব যুদ্ধে তারা সবাই চপেটাঘাত খেল। এরপর তাদের সবচেয়ে বড় দুর্গ বা আখড়া রয়ে গিয়েছিল খায়বারে। মদীনা ত্যাগকারী ইহুদীদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যাও সেখানে সমবেত হয়েছিল। এসব আয়াত নাযিল হওয়ার সময় সেটিও অস্বাভাবিক রকমের কোন সংঘর্ষ ছাড়াই বিজিত হয় এবং মুসলমানদের ভূমি কর্ষণকারী হিসেবে থাকতে খোদ ইহুদীরাই আবেদন জানায়। সর্বশেষ এই পরাজয়ের পর আরবে ইহুদীদের শক্তি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ওয়াদিউল কুরা, ফাদাক, তায়মা, তাবুক সব একের পর এক আত্মসমর্পণ করতে থাকে। ইসলামের অস্তিত্ব বরদাশত করা তো দূরের কথা, তার নাম শুনতেও যারা পছন্দ করত না, আরবের সেইসব ইহুদীই শেষ পর্যন্ত সেই ইসলামের প্রজায় পরিণত হয়। এই পরিবেশ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা এই সূরার মধ্যে আরো একবার তাদেরকে সম্বোধন করলেন। তাদের উদ্দেশ্যে কুরআন মজীদে উল্লেখিত এটাই সম্ভবত সর্বশেষ বক্তব্য। এতে তাদের উদ্দেশ করে তিনটি কথা বলা হয়েছে ঃ

এক ঃ তোমরা এ রসূলকে মানতে অস্বীকার করছো এই কারণে যে, তিনি এমন এক কওমের মধ্যে প্রেরিত হয়েছেন যাদেরকে অবজ্ঞা ভরে তোমরা 'উম্মী' বলে থাক। তোমাদের ভ্রান্ত ধারণা এই যে, রসূলকে অবশ্যই তোমাদের নিজেদের কওমের মধ্যে থেকে হতে হবে। তোমরা এ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে ছিলে যে, তোমাদের কওমের বাইরে যে ব্যক্তিই রিসালাতের দাবী করবে সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী। কারণ এই পদমর্যাদা তোমাদের বংশের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং 'উম্মী'দের মধ্যে কখনো কোন রসূল আসতে পারেন না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সেই উম্মীদের মধ্যেই একজন রসূল সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের চোখের সামনেই যিনি তাঁর কিতাব শুনাচ্ছেন, মানুষকে পরিশুদ্ধ করছেন এবং সেই মানুষকে হিদায়াত দান করছেন তোমরা নিজেরাও যাদের গোমরাহীর অবস্থা জান। এটা আল্লাহর করুণা ও মেহেরবানী, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। তাঁর করুণা ও মেহেরবানীর ওপর তোমাদের কোন ইজারাদারী নেই যে, তোমরা যাকে তা দেয়াতে চাও তাকেই তিনি দিবেন আর তোমরা যাকে বঞ্চিত করতে চাও তাকে তিনি বঞ্চিত করবেন।

দুই ঃ তোমাদেরকে তাওরাতের বাহক বানানো হয়েছিল। কিন্তু তোমরা এর গুরুদায়িত্ব উপলব্ধিও করনি, পালনও করনি। তোমাদের অবস্থা সেই গাধার মত যার পিঠে বই পুস্তকের বোঝা চাপানো আছে কিন্তু সে কি বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তা জানে না। তোমাদের অবস্থা বরং ঐ গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট। গাধার তো কোন প্রকার বুদ্ধি-বিবেক নেই, কিন্তু তোমাদের বুদ্ধি-বিবেক আছে। তাছাড়া, তোমরা আল্লাহর কিতাবের বাহক

হওয়ার গুরুদায়িত্ব শুধু এড়িয়েই চলছো না, জেনে বুঝে আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলা থেকেও বিরত থাকছো না। এসব সত্ত্বেও তোমাদের ধারণা এই যে, তোমরা আল্লাহর অতি প্রিয় এবং রিসালাতের নিয়ামত চিরদিনের জন্য তোমাদের নামে লিখে দেয়া হয়েছে। তোমরা যেন মনে করে নিয়েছ, তোমরা আল্লাহর বাণীর হক আদায় করো আর না করো কোন অবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ছাড়া আর কাউকে তাঁর বাণীর বাহক বানাবেন না।

তিন ঃ সত্যিই যদি তোমরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে এবং এ বিশ্বাসও তোমাদের থাকতো যে, তাঁর কাছে তোমাদের জন্য অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার স্থান সংরক্ষিত আছে তাহলে মৃত্যুর এমন ভীতি তোমাদের মধ্যে থাকতো না যে, অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন গ্রহণীয় কিন্তু কোন অবস্থায়ই মৃত্যু গ্রহণীয় নয়। আর মৃত্যুর এই ভয়ের কারণেই তো বিগত কয়েক বছরে তোমরা পরাজয়ের পর পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছো। তোমাদের এই অবস্থা–ই প্রমাণ করে যে, তোমাদের অপকর্মসমূহ সম্পর্কে তোমরা নিজেরাই অবহিত। তোমাদের বিবেক ভাল করেই জানে যে, এসব অপকর্ম নিয়ে যদি মারা যাও তাহলে পৃথিবীতে যতটা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছো আল্লাহর কাছে তার চেয়ে অধিক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

এ হচ্ছে প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু। দ্বিতীয় রুকূ'টি এর কয়েক বছর আগে নাযিল হয়েছিল। দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াতগুলো এ সূরার অন্তরভুক্ত করার কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের 'সাবৃত' বা শনিবারের পরিবর্তে মুসলমানদেরকে 'জুম'আ' দান করেছেন। তাই তিনি মুসলমানদের সাবধান করে দিতে চান যে, ইহুদীরা 'সাবৃতে'র সাথে যে আচরণ করেছে তারা যেন জুম'আর সাথে সেই আচরণ না করে। একদিন ঠিক জুম'আর নামাযের সময় একটি বাণিজ্য কাফেলা আসলে তাদের ঢোল ও বাদ্যের শব্দ শুনে বারজন ছাড়া উপস্থিত সবাই মসজিদে নববী থেকে বেরিয়ে দৌড়িয়ে কাফেলার কাছে গিয়ে হাজির হয়। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন খোতবা দিচ্ছিলেন। তাই নির্দেশ দেয়া হয় যে, জুম'আর আযান হওয়ার পর সব রকম কেনাবেচা এবং অন্য সব রকম ব্যস্ততা হারাম। ঈমানদারদের কাজ হলো, এ সময় সব কাজ বন্ধ রেখে আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হবে। তবে নামায শেষ হওয়ার পর নিজেদের কারবার চালানোর জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার অধিকার অবশ্যই তাদের আছে। জুম'আর হুকুম আহকাম সম্পর্কিত এ রুকূ'টিকে একটি স্বতন্ত্র সূরাও বানান যেত কিংবা অন্য কোন সূরার অন্তরভুক্তও করা যেতে পারত। কিন্তু তা না করে এখানে যেসব আয়াতে ইহুদীদেরকে তাদের মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে বিশেষভাবে সেই সব আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এর অন্তরনিহিত উদ্দেশ্য তাই যা আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

আসমানে যা আছে এবং যমীনে যা আছে তার সবই আল্লাহর তাসবীহ করছে। তিনি বাদশাহ, অতি পবিত্র এবং মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।[১]

তিনিই মহান সত্তা যিনি উম্মীদের[২] মধ্যে তাদেরই একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছেন যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শুনায়, তাদের জীবনকে সজ্জিত ও সুন্দর করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়।[৩] অথচ ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।[৪] (এ রসূলের আগমন) তাদের অন্য লোকদের জন্যও যারা এখনো তাদের সাথে যোগ দেয়নি।[৫] আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।[৬]

১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা হাদীদের ১ ও ২নং টীকা, আল হাশরের ৩৬, ৩৭ ও ৪১ টীকা। পরবর্তী বিষয়ের সাথে এই প্রারম্ভিক কথাটির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। আরবের ইহুদীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তি সত্তা, গুণাবলী ও কার্যকলাপে রিসালাতের স্পষ্ট নিদর্শন চাক্ষুষ দেখা সত্ত্বেও এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর সম্পর্কে তাওরাতে স্পষ্ট ভাষায় যে সুসংবাদ দিয়েছিলেন তা যে তাঁর ছাড়া আর কারো জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না তা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও শুধু এজন্য তাঁকে অস্বীকার করছিল যে, নিজ জাতি ও বংশের বাইরের আর কারো রিসালাত মেনে নেয়া তাদের কাছে অত্যন্ত অপছন্দীয় ব্যাপার ছিল। তারা পরিষ্কার বলতো, আমাদের কাছে যাকিছু এসেছে আমরা কেবল তাই মানব। কোনো অইসরাঈলী নবীর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকেও কোনো শিক্ষা এসে থাকলে তা মেনে নিতে তারা আদৌ প্রস্তুতি ছিল না। এই আচরণের কারণে পরবর্তী আয়াতগুলোতে তাদেরকে তিরস্কার করা হচ্ছে। তাই এই

প্রারম্ভিক আয়াতাংশ দিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে। এতে প্রথম যে কথাটি বলা হয়েছে তাহলো, বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি বস্তু আল্লাহর তাসবীহ করছে। অর্থাৎ গোটা বিশ্ব-জাহান একথার সাক্ষ দিচ্ছে যে, যেসব অপূর্ণতা ও দুর্বলতার ভিত্তিতে ইহুদীরা তাদের বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা কায়েম ও বদ্ধমূল করে রেখেছে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি কারো আত্মীয় নন। তাঁর কাছে পক্ষপাতিত্বমূলক (Favouritism) কোনো কাজ নেই। তিনি নিজের সমস্ত সৃষ্টির সাথে সমানভাবে ইনসাফ, রহমত ও প্রতিপালক সুলভ আচরণ করেন। কোনো বিশেষ বংশধারা বা কওম তাঁর প্রিয় পাত্র নয় যে, তারা যাই করুক না কেন সর্বাবস্থায় তাঁর অনুগ্রহ তার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে এবং অন্য কোনো জাতি গোষ্ঠী বা কওমের সাথে তাঁর কোনো শত্রুতা নেই যে, তাদের মধ্যে সদগুণাবলী থাকা সত্ত্বেও তাঁর দান ও করুণা থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। এরপর বলা হয়েছে, তিনি বাদশাহ। অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের কোনো শক্তিই তার ক্ষমতা ও ইখতিয়ারকে সীমিত করতে পারে না। তোমরা তাঁর দাস এবং প্রজা। তোমাদের হিদায়াতের জন্য তিনি কাকে পয়গাম্বর বানাবেন আর কাকে বানাবেন না, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মত পদমর্যাদা তোমরা কবে থেকে লাভ করেছ? তারপর বলা হয়েছে, তিনি قدوس বা মহাপবিত্র। অর্থাৎ তাঁর সিদ্ধান্তে ভুল-ত্রুটির কোনো সম্ভাবনা থাকতে পারে না। তিনি ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র, তা থেকে অনেক উর্ধে। তোমাদের বুঝ ও উপলব্ধিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পারে, কিন্তু তার সিদ্ধান্তে ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পারে না। শেষ দিকে আল্লাহ তা'আলার আরো দু'টি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হলো, তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী। অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে কেউ জয়লাভ করতে পারে না। অপরটি হলো তিনি জ্ঞানময়, অর্থাৎ যাকিছু করেন বুদ্ধি, বিবেক ও প্রজ্ঞার দাবীও হুবহু তাই। আর তাঁর কৌশল ও ব্যবস্থাপনা এতই সুদৃঢ় হয়ে থাকে যে, বিশ্ব-জাহানের কেউই তা ব্যর্থ করতে পারে না।

২. এখানে 'উম্মী' শব্দটি ইহুদীদের পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম বিদ্রূপ বা তিরস্কার প্রচ্ছন্ন আছে। অর্থাৎ ইহুদীরা যাদেরকে অবজ্ঞা করে 'উম্মী' বলে থাকে এবং নিজেদের তুলনায় নগণ্য ও নীচু বলে মনে করে পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময় আল্লাহ তাদের মধ্যেই একজন রসূল সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজে রসূল হয়ে বসেননি, বরং তাঁকে পাঠিয়েছেন তিনিই যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের বাদশাহ, মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। তাঁর শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে এরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে তাঁর কোনো ক্ষতি করতে এরা আদৌ সক্ষম নয়।

জেনে রাখা দরকার যে, কুরআন মজীদে 'উম্মী' শব্দটি বেশ কটি স্থানে এসেছে। তবে সব জায়গায় শব্দটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং বিভিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও যাদের কাছে অনুসরণ করার জন্য কোনো আসমানী কিতাব নেই আহলে কিতাবদের বিপরীতে তাদেরকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছেঃ

قُلْ لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ -(ال عمران : ٢٠)

"আহলে কিতাব ও উম্মীদের জিজ্ঞেস কর ঃ তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছ ?"
–(সূরা আলে ইমরান ঃ ২০)

এখানে উম্মী বলতে আরবের মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে এবং তাদেরকে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানদের থেকে স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কোথাও এ শব্দটি আহলে কিতাবদেরই নিরক্ষর ও আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনবহিত লোকদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, বলা হয়েছে ঃ

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتٰبَ إِلَّا أَمَانِيَّ ـ(البقرة : ٧٨)

"এই ইহুদীদের কিছু লোক আছে 'উম্মী' কিতাবের কোনো জ্ঞান তাদের নেই। তারা কেবল নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনাকেই চিনে।"–(সূরা বাকারা ঃ ৭৮)

আবার কোথাও এ শব্দটি নিরেট ইহুদী পরিভাষা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে 'উম্মী' বলতে অ-ইহুদী সবাইকে বুঝানো হয়েছে।

যেমন, বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ـ(ال عمران : ٧٥)

"তাদের মধ্যে এ অসাধুতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হলো, তারা বলে ঃ উম্মীদের অর্থ-সম্পদ লুটেপুটে ও মেরে খাওয়ায় কোনো দোষ নেই।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৫)

আলোচ্য আয়াতে এই তৃতীয় অর্থটিই গ্রহণ করা হয়েছে। এ শব্দটি ইব্রিয় ভাষার "গোয়েম" শব্দের সমার্থক। ইংরেজী বাইবেলে এর অনুবাদ করা হয়েছে Gentiles এবং এর দ্বারা সমস্ত অ-ইহুদী বা অ-ইসরাঈলী লোককে বুঝানো হয়েছে।

কিন্তু শুধু এতটুকু ব্যাখ্যার সাহায্যে এ ইহুদী পরিভাষাটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা সম্ভব নয়। ইবরানী বা ইব্রিয় ভাষায় 'গোয়েম' শব্দটি প্রথমত কেবল জাতি বা কওমসমূহ অর্থে বলা হতো। কিন্তু ক্রমান্বয়ে ইহুদীরা এটিকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে শুরু করে। প্রথমে তারা এটিকে নিজেদের ছাড়া অন্যসব কওমের জন্য নির্দিষ্ট করে। পরে এ শব্দটির অর্থে এ ভাবধারাও সৃষ্টি করে যে, ইহুদীরা ছাড়া অন্য সব জাতিই অসভ্য ও অভদ্র, ধর্মের দিক থেকে নিকৃষ্ট, অপবিত্র এবং নীচ ও হীন। শেষ পর্যন্ত অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ শব্দটি একই উদ্দেশ্যে অগ্রীকদের জন্য গ্রীকদের ব্যবহৃত পরিভাষা Barbarian শব্দটিকেও ছাড়িয়ে যায়। রিব্বীদের সাহিত্যে 'গোয়েম'রা এমনই ঘৃণ্য মানুষ যে, তাদেরকে মানুষ হিসাবে ভাই বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না এবং তাদের সাথে সফরও করা যেতে পারে না। বরং তাদের কেউ যদি পানিতে ডুবে মরতে থাকে তাহলে তাকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টাও করা যেতে পারে না। ইহুদীরা বিশ্বাস করতো, মাসীহ এসে সমস্ত গোয়েমকে ধ্বংস করে জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলবেন।–(আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আলে ইমরান, টীকা ৬৪)।

৩. কুরআন মজীদের চারটি স্থানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রত্যেক স্থানেই বর্ণনা করার ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। সূরা বাকারার ১২৯ আয়াতে এসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে

আরববাসীদের একথা বলার জন্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবী হয়ে আসাকে তারা যে নিজেদের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত বলে মনে করছে, তা ঠিক নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে তা তাদের জন্য একটি বড় নিয়ামত। এটি লাভের জন্য হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম তাঁদের সন্তানদের জন্য দোয়া করতেন। সূরা বাকারার ১৫১ আয়াতে এসব গুণাবলী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানরা যেন নবীর (সা) মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবী বানানোর মাধ্যমে যে নিয়ামত তাঁদের দিয়েছেন তা থেকে পুরোপুরি উপকৃত হতে পারে। সূরা আলে ইমরানের ১৬৪ আয়াতে আবার এসব গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের মানুষগুলোকে একথা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে তাঁর রসূল পাঠিয়ে কত বড় ইহসান করেছেন। কিন্তু তারা এমনই অপদার্থ যে, তাঁকে কোনো মর্যাদাই দিচ্ছে না। চতুর্থবারের মত এ সূরাতে ঐসব গুণাবলী পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ইহুদীদের একথা জানিয়ে দেয়া যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের চোখের সামনে যেসব কাজ করেছেন তা স্পষ্টত একজন রসূলের কাজ। তিনি আল্লাহর আয়াত শুনাচ্ছেন। এসব আয়াতের ভাষা, বিষয়বস্তু, বর্ণনাভঙ্গি সবকিছুই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তা প্রকৃতই আল্লাহর আয়াত। তা মানুষের জীবনকে সুন্দর, পরিপাটি ও সুবিন্যস্ত করছে, তাদের নৈতিক চরিত্র, অভ্যাস ও রীতিনীতি এবং লেনদেন ও জীবনাচরণকে সব রকমের কলুষ-কালিমা থেকে পবিত্র করছে এবং উন্নতমানের নৈতিক মর্যাদায় ভূষিত করছে। এটা ঠিক সেই কাজ যা ইতিপূর্বে সমস্ত নবী-রসূলও করেছেন। তাছাড়া তিনি শুধু আয়াতসমূহ শুনানোকেই যথেষ্ট মনে করেন না, বরং সবসময় নিজের কথা ও কাজ দ্বারা নিজের বাস্তব জীবনের উদাহরণ দ্বারা মানুষকে আল্লাহর কিতাবের লক্ষ ও উদ্দেশ্য বুঝাচ্ছেন। তিনি তাদের এমন যুক্তি, বুদ্ধি ও জ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছেন যা কেবল নবী-রসূলগণ ছাড়া আর কেউ-ই শিক্ষা দেয়নি। এ ধরনের চরিত্র ও কাজ নবী-রসূলদের বিশেষ বৈশিষ্ট ও গুণ। এর সাহায্যেই তাঁদের চেনা যায়। সত্যিকার অর্থে নিজের কর্মকাণ্ড থেকে যার রসূল হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে তাঁকে তোমরা কেবল এজন্য অস্বীকার করছো যে, তাঁকে তোমাদের কওমের মধ্য থেকে না পাঠিয়ে এমন এক কওমের মধ্য থেকে পাঠানো হয়েছে যাদেরকে তোমরা 'উম্মী' বলে অবজ্ঞা করে থাকো।

৪. এটা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের আরো একটি প্রমাণ। ইহুদীদের সত্যোপলব্ধির জন্য এ প্রমাণটি পেশ করা হয়েছে। তারা শত শত বছর পূর্ব থেকে আরব ভূমিতে বসবাস করে আসছিল। আরবের অধিবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক এবং তামাদ্দুনিক জীবনের কোনো দিকই তাদের অজানা ছিল না। তাদের পূর্বতন এ অবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলা হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে এ জাতির চেহারা যেভাবে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে তা তোমরা নিজ চোখে দেখেছ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এসব লোক যে অবস্থার মধ্যে ডুবে ছিল তা তোমাদের জানা আছে। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের অবস্থা কি হয়েছে তাও তোমরা নিজ চোখে দেখছ। আর এ জাতির যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের অবস্থাও তোমরা দেখতে পাচ্ছ। একজন অন্ধও এই স্পষ্ট পার্থক্য দেখতে ও বুঝতে পারে। এটা কি তোমাদেরকে একথা বিশ্বাস করানোর জন্য যথেষ্ট নয় যে, একজন নবী ছাড়া এটা আর কারো কীর্তি হতে পারে না? বরং এর তুলনায় পূর্ববর্তী নবী-রসূলদের কীর্তিও ম্লান হয়ে গিয়েছে।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ④ مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ؕ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑤

এটা তাঁর মেহেরবানী, তিনি যাকে চান তা দান করেন। আল্লাহ মহাকরুণার অধিকারী।

যাদেরকে তাওরাতের বাহক বানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বহন করেনি[৭] তাদের উপমা সেইসব গাধা[৮] যা বই-পুস্তক বহন করে। এর চেয়েও নিকৃষ্ট উপমা সেইসব লোকের যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে।[৯] আল্লাহ এ রকম জালেমদের হিদায়াত দান করেন না।

৫. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত শুধু আরব জাতি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। তা সারা দুনিয়ার সেইসব জাতি ও বংশ-গোষ্ঠীর জন্য যারা এখনো ঈমানদারদের মধ্যে শামিল হয়নি, বরং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে। মূল আয়াতাংশ হলো ঃ وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ তাদের মধ্য থেকে আরো কিছু লোক যারা এখনো তাদের সাথে শামিল হয়নি। এ আয়াতের مِنْهُمْ (তাদের মধ্য থেকে) শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, সেই অন্যান্য লোকগুলো উম্মীদের মধ্যে থেকে, অর্থাৎ তারা হবে দুনিয়ার অ-ইসরাঈলী জাতি-গোষ্ঠীর লোক। দুই, তারা হবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণকারী। তবে এখনো ঈমানদারদের মধ্যে অন্তরভুক্ত হয়নি, কিন্তু পরে এসে শামিল হবে। এভাবে এ আয়াতটিও সেই সব আয়াতের অন্তরভুক্ত যাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত সমগ্র মানব জাতির জন্য এবং চিরদিনের জন্য। কুরআন মজীদের আর যেসব স্থানে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে তাহলো সূরা আল আন'আম, আয়াত ১৯, আল আরাফ ১৫৮, আল আম্বিয়া ১০৭, আল ফুরকান ১, সাবা ২৮ ; (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবা, টীকা ৪৭)।

৬. অর্থাৎ এটি তাঁর শক্তি-সামর্থ ও জ্ঞানের বিস্ময়কর দিক যে, তিনি এ ধরনের এক অশিষ্ট উম্মী কওমের মধ্য থেকে এমন মহান নবী সৃষ্টি করেছেন যাঁর শিক্ষা ও হিদায়াত এতটা বিপ্লবাত্মক ও এমন বিশ্বজনীন স্থায়ী নীতিমালার ধারক, যার ওপর ভিত্তি করে গোটা মানব জাতি একটি মাত্র জাতিতে পরিণত হতে পারে এবং এ নীতিমালা থেকে চিরদিন দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারে। যত চেষ্টাই করা হোক না কেন কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে কোনো মানুষই এই স্থান ও মর্যাদা লাভ করতে পারতো না। আরবদের মত

قُلْ يَآأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥٓ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌۢ بِالظَّٰلِمِينَ ﴿٧﴾ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

তুমি বল, হে ইহুদী হয়ে যাওয়া লোকগণ।[১০] তোমরা যদি ভেবে থাকো যে, অন্য সব মানুষ বাদ দিয়ে কেবল তোমরাই আল্লাহর প্রিয়পাত্র,[১১] আর তোমাদের এ ধারণার ক্ষেত্রে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো,[১২] তাহলে মৃত্যু চেয়ে নাও। কিন্তু যেসব অপকর্ম তারা করেছে[১৩] তার কারণে তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ এসব জালেমকে খুব ভালভাবেই জানেন। তাদের বলো, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছো তা তোমাদের কাছে আসবেই তারপর তোমাদেরকে সেই সত্তার সামনে পেশ করা হবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করছিলে।

পশ্চাদপদ জাতি তো দূরের কথা, দুনিয়ার কোন বড় জাতির সর্বাধিক মেধা–সম্পন্ন ব্যক্তিও এভাবে কোন জাতির চেহারা পুরোপুরি পাল্টে দিতে এবং গোটা মানব জাতিকে চিরদিনের জন্য একটি আদর্শ এবং একটি সংস্কৃতির বিশ্বজনীন ও সর্বাত্মক আদর্শ পরিচালনার যোগ্য হওয়ার মত একটা ব্যাপক নীতিমালা গোটা বিশ্বকে উপহার দিতে পারতো না। এটি আল্লাহর কুদরাতে সংঘটিত একটি মু'জিযা। আল্লাহ তাঁর কৌশল অনুসারে যে ব্যক্তি, যে দেশ এবং যে জাতিকে চেয়েছেন এ উদ্দেশ্যে বাছাই করে নিয়েছেন। এতে কোন নির্বোধ যদি মনে কষ্ট পায় তাহলে পেতে থাকুক।

৭. এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ। একটি সাধারণ অর্থ এবং অপরটি বিশেষ অর্থ। সাধারণ অর্থ হলো, যাদের ওপর তাওরাতের জ্ঞান অর্জন, তদনুযায়ী আমল এবং তাওরাত অনুসারে দুনিয়াকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, তারা তাদের এ দায়িত্ব বুঝেনি এবং তার হকও আদায় করেনি। বিশেষ অর্থ হলো, তাওরাতের ধারক ও বাহক গোষ্ঠী হওয়ার কারণে যাদের কাজ ছিল সবার আগে অগ্রসর হয়ে সেই রসূলকে সাহায্য–সহযোগিতা করা যার আগমনের সুসংবাদ তাওরাতে স্পষ্ট ভাষায় দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারাই তাঁর সবচেয়ে বেশী শত্রুতা ও বিরোধিতা করেছে এবং তাওরাতের শিক্ষার দাবী পূরণ করেনি।

৮. অর্থাৎ গাধার পিঠে বই–পুস্তকের বোঝা চাপানো থাকলেও পিঠের ওপর কি আছে সে যেমন তা জানে না। অনুরূপ এই তাওরাতের বোঝাও তাদের ওপর চাপানো আছে। কিন্তু তারা আদৌ জানে না, এই মহান গ্রন্থ কি জন্য এসেছে এবং তাদের কাছে কি দাবী করছে।

৯. অর্থাৎ তাদের অবস্থা গাধার চেয়েও নিকৃষ্টতর। গাধার কোন বিবেক–বুদ্ধি ও উপলব্ধি নেই বলে সে অক্ষম, কিন্তু এদের তো বিবেক–বুদ্ধি ও উপলব্ধি আছে। এরা নিজেরা তাওরাত পড়ে এবং অন্যদের পড়ায় তাই এর অর্থ তাদের অজানা নয়। এরপরও তারা জেনে শুনে এর হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ও উপেক্ষা করছে এবং সেই নবীকে মানতে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করছে যিনি তাওরাত অনুসারে অবিসম্বাদিতভাবে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এরা জানে না বা বুঝে না বলে দোষী নয়, বরং জেনে শুনে আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলার অপরাধে অপরাধী।

১০. এ বিষয়টি লক্ষণীয় যে, এখানে "হে ইহুদীরা" বলা হয়নি। বলা হয়েছে "হে ইহুদী হয়ে যাওয়া লোকগণ" অথবা "যারা ইহুদীবাদ গ্রহণ করেছো"। এর কারণ হলো, মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর আগের ও পরের নবী–রসূলগণ আসল যে দীন এনেছিলেন তা ছিল ইসলাম। এসব নবী–রসূলদের কেউই ইহুদী ছিলেন না এবং তাঁদের সময়ে ইহুদীবাদের সৃষ্টিও হয়েছিল না। এই নামে এ ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে বহু পরে। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের চতুর্থ পুত্র ইয়াহুদার বংশোদ্ভূত গোত্রটির নামানুসারে এ ধর্মের নামকরণ হয়েছে। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের পরে তাঁর সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলে এই গোত্রটি ইয়াহুদিয়া নামক রাষ্ট্রটির মালিক হয় এবং বনী ইসরাঈলের অন্যান্য গোত্রগুলো নিজেদের একটি আলাদা রাষ্ট্র কায়েম করে যা সামেরিয়া নামে খ্যাত হয়। পরবর্তীকালে আসিরীয়রা সামেরিয়াকে শুধু ধ্বংসই করেনি, বরং এই রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠাতা ইসরাঈলী গোত্রগুলোর নাম–নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দিয়েছে। এরপরে শুধু ইয়াহুদা এবং তার সাথে বিন ইয়ামীনের বংশ অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু তার ওপর ইয়াহুদা বংশের প্রভাব ও আধিপত্যের কারণে তাদের জন্য ইয়াহুদ শব্দটির প্রয়োগ হতে থাকে। ইহুদী ধর্মযাজক, রিব্বী এবং আহবাররা নিজেদের ধ্যান–ধারণা, মতবাদ ও ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ অনুযায়ী এই বংশের মধ্যে আকীদা–বিশ্বাস, আচার–অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় বিধি–বিধানের যে কাঠামো শত শত বছর ধরে নির্মাণ করেছে তার নাম ইহুদীবাদ। খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে এই কাঠামো নির্মাণ শুরু হয় এবং খৃস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত চলতে থাকে। আল্লাহর রসূলদের আনীত আল্লাহর হিদায়াতের উপাদান খুব সামান্যই এতে আছে এবং যা আছে তার চেহারাও অনেকখানি বিকৃত হয়েছে। এ কারণে কুরআন মজীদের অধিকাংশ স্থানে তাদেরকে الَّذِينَ هَادُوا বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই সব লোক যারা ইহুদী হয়ে গিয়েছে বা ইহুদীবাদ গ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যকার সবাই আবার ইসরাঈলী ছিল না। যেসব অইসরাঈলী ইহুদীবাদ গ্রহণ করেছিল তারাও এর মধ্যে ছিল। কুরআন মজীদে যেখানে বনী ইসরাঈল জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে "হে বনী ইসরাঈল" বলা হয়েছে। আর যেখানে ইহুদী ধর্মের অনুসারীদের সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে الَّذِينَ هَادُوا বলাহয়েছে।

১১. কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের এই দাবী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ঃ তারা বলেন, ইহুদীরা ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না (আল বাকারাহ, ১১১)। দোযখের আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না। আর আমাদেরকে যদি নিতান্তই শাস্তি দেয়া হয় তাহলে মাত্র কয়েক দিনের জন্য দেয়া হবে (আল বাকারাহ, ৮০; আলে ইমরান, ২৪)। আমরা আল্লাহর বেটা এবং তাঁর প্রিয়পাত্র (আল মায়েদা, ১৮)। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থসমূহেও এ ধরনের কিছু দাবী–দাওয়া দেখা যায়। সারা বিশ্ব অন্তত এতটুকু কথা জানে যে, তারা নিজেদেরকে আল্লাহর বাছাই করা সৃষ্টি (Chosen People) বলে থাকে। তারা এরূপ এক খোশ খেয়ালে মত্ত যে, তাদের সাথে খোদার একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে যা অন্য কোন মানব গোষ্ঠীর সংগে নেই।

১২. এখানে কুরআন মজীদে একথাটি দ্বিতীয়বারের মত ইহুদীদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। প্রথমে সূরা বাকারায় বলা হয়েছিল, এদের বলো, আল্লাহর কাছে সমস্ত মানুষকে বাদ দিয়ে আখেরাতের ঘর যদি কেবল তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট থেকে থাকে আর এ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে মৃত্যু কামনা করো। কিন্তু যেসব অপকর্ম তারা করেছে তার কারণে তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ জালেমদের খুব ভাল করেই জানেন। বরং তোমরা দেখবে তারা কোন না কোনভাবে বেঁচে থাকতে সমস্ত মানুষের চেয়ে এমনকি মুশরিকদের চেয়েও বেশী লালায়িত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আকাংখা করে হাজার বছর বেঁচে থাকার। অথচ দীর্ঘ আয়ু লাভ করলেও তা তাদেরকে এই আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তাদের সমস্ত কৃতকর্মই আল্লাহর দৃষ্টিতে আছে (আয়াত ৯৪—৯৬)। এ কথাটিই এখানে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এটা শুধু পুনরুক্তিই নয়। সূরা বাকারার আয়াতগুলোতে একথা বলা হয়েছিল তখন, যখন ইহুদিদের সাথে মুসলমানদের কোন যুদ্ধ হয়নি। কিন্তু এই সূরায় তার পুনরুক্তি করা হয়েছে এমন এক সময় যখন তাদের সাথে ইতিপূর্বে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর আরবভূমিতে চূড়ান্তভাবে তাদের শক্তি চূর্ণ করা হয়েছে। পূর্বে সূরা বাকারায় যে কথা বলা হয়েছিল এসব যুদ্ধ এবং তাদের পরিণাম অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ দুই ভাবেই তা প্রমাণ করে দিয়েছিল। মদীনা এবং খায়বারে সংখ্যার দিক দিয়ে ইহুদী শক্তি কোনভাবেই মুসলমানদের তুলনায় কম ছিল না এবং উপায়–উপকরণও তাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তাছাড়া আরবের মুশরিকরা এবং মদীনার মুনাফিকরাও তাদের সাহায্য–সহযোগিতা করছিল। কারণ মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য তারা বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু এই অসম মোকাবিলায় যে জিনিসটি মুসলমানদের বিজয়ী এবং ইহুদীদের পরাজিত করেছিল তা ছিল এই যে, মুসলমানগণ আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করতে ভীত হওয়া তো দূরের কথা বরং হৃদয়ের গভীর থেকে মৃত্যু কামনা করতো এবং মরণ পণ করে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তো। কারণ, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তারা আল্লাহর পথে লড়াই করছে। আর এ বিষয়েও পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, এ পথে শাহাদাত বরণকারীর জন্য রয়েছে জান্নাত। অপরদিকে ইহুদীদের অবস্থা ছিল এই যে, তারা কোন পথেই জান দিতে প্রস্তুত ছিল না; না খোদার পথে, না নিজের কওমের পথে এবং না নিজের জান, মাল ও ইজ্জত রক্ষার পথে। যে ধরনের জীবনই হোক না কেন তাদের প্রয়োজন ছিল কেবল বেঁচে থাকার। এ জিনিসটিই তাদেরকে ভীরু ও কাপুরুষ বানিয়ে দিয়েছিল।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

২ রুকূ'

হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছো, জুম'আর দিন[১৪] যখন নামাযের জন্য তোমাদের ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিকরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও।[১৫] এটাই তোমাদের জন্য বেশী ভাল যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে। তারপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো[১৬] এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো।[১৭] আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।[১৮]

১৩. অন্য কথায় মৃত্যু থেকে তাদের এই পালানো বিনা কারণে নয়। মুখে তারা যত বড় বড় কথাই বলুক না কেন, আল্লাহর দীনের সাথে তারা যে আচরণ করেছে এবং পৃথিবীতে তারা যা করছে আখেরাতে সেই সব আচরণ ও কাজকর্মের কিরূপ ফলাফল আশা করা যায় তাদের জ্ঞান ও বিবেক তা ভাল করেই জানতো। এ কারণে তাদের প্রবৃত্তি আল্লাহর আদালতের মুখোমুখি হতে টালবাহানা করে।

১৪. এ আয়াতে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ করার মত। প্রথমটি হলো, এতে নামাযের জন্য ঘোষণা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো, এমন একটি নামাযের জন্য ঘোষণা দেয়ার কথা আছে যা বিশেষভাবে শুধু জুমআর দিনেই পড়তে হবে। তৃতীয়টি হলো, এ দু'টি জিনিসের কথা এভাবে বলা হয়নি যে, তোমরা নামাযের জন্য ঘোষণা করো এবং জুমআর দিনে একটি বিশেষ নামায পড়। বরং বর্ণনাভঙ্গি ও পূর্বাপর বর্ণনা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, নামাযের ঘোষণা এবং জুমআর দিনের বিশেষ নামায উভয়টিই আগে থেকেই চালু ছিল। তবে মানুষ ভুল করতো এই যে, জুমআর নামাযের ঘোষণা শুনেও তারা নামাযের জন্য দ্রুত অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে গাফলতি করতো এবং কেনাবেচার কাজেই ব্যস্ত থাকতো। তাই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি শুধু এ উদ্দেশ্যে নাযিল করেছেন যে, মানুষ এই ঘোষণা এবং এই বিশেষ নামাযের গুরুত্ব উপলব্ধি করুক এবং ফরয মনে করে এ উদ্দেশ্যে দ্রুত অগ্রসর হোক। এ তিনটি বিষয়ে যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায় তাহলে তা থেকে এই মৌলিক বাস্তবতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন কিছু নির্দেশও দিতেন যা কুরআনের মধ্যে নেই। কিন্তু সেই সব নির্দেশ ও কুরআনের নির্দেশাবলীর মত অবশ্য পালনীয় ছিল। বর্তমানে গোটা পৃথিবীর প্রতিটি মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবার যে আযান দেয়া

হয় সেই আযানই নামাযের জন্য ঘোষণা। কিন্তু কুরআন মজীদের কোন স্থানে না এ আযানের ভাষা উল্লেখ করা হয়েছে, না মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, নামাযের জন্য এভাবে আহবান জানাও। এটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত জিনিস। কুরআন মজীদে শুধু দু'টি স্থানে একে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা হয়েছে। প্রথমত এই আয়াতে। দ্বিতীয়ত সূরা মায়েদার ৫৮ আয়াতে। অনুরূপ সারা দুনিয়ার মুসলমান আজ যে জুম'আর নামায পড়ে থাকে কুরআন মজীদে তারও কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি এবং পড়ার সময় ও নিয়ম–পদ্ধতিও বলে দেয়া হয়নি। এ নামায পড়ার নিয়ম–পদ্ধতিও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক চালু করা। কুরআনের এ আয়াতটি শুধু এর গুরুত্ব এবং অলংঘনীয়ভাবে পালন করার বিষয়টি বুঝানোর জন্যই নাযিল হয়েছে। স্পষ্ট এই দলীল থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বলে যে, শুধু কুরআনে বর্ণিত হুকুম–আহকামই শরয়ী হুকুম–আহকাম—সে প্রকৃতপক্ষে শুধু সুন্নাতকেই অস্বীকার করে না, কুরআনকেও অস্বীকার করে।

এ বিষয়ে আরো বক্তব্য পেশ করার পূর্বে জুম'আ সম্পর্কে আরো কয়েকটি বিষয়ও জেনে নেয়া দরকার।

জুম'আ কথাটি প্রকৃতপক্ষে একটি ইসলামী পরিভাষা। জাহেলী যুগে আরবের অধিবাসীরা একে 'ইয়াওমে আরূবা' বলত। ইসলামী যুগে এ দিনটিকে মুসলমানদের সমাবেশের দিন হিসেবে নির্ধারিত করে এর নাম দেয়া হয় জুম'আ। ঐতিহাসিকগণ যদিও বলেন যে, কা'ব ইবনে লুয়াই কিংবা কুসাই ইবনে কিলাবও এদিনটির জন্য এ নাম ব্যবহার করেছিল। কারণ এ দিনেই তারা কুরাইশদের লোকজনের সমাবেশ করতেন (ফাতহুল বারী)। কিন্তু তার এই কাজ দ্বারা প্রাচীন এই নামের কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং সাধারণ আরববাসী এ দিনটিকে 'আরূবা'ই বলত। সত্যিকার অর্থে নামের পরিবর্তন হয় তখন যখন ইসলামী যুগে এর নতুন নাম রাখা হয়।

ইসলাম–পূর্ব যুগে সপ্তাহে একটি দিনকে ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করা এবং তাকে জাতির প্রতীক হিসেবে নির্ধারিত করার রীতি আহলে কিতাবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইহুদীরা ঐ উদ্দেশ্যে 'সাব্তে'র (শনিবার) দিনটিকে নির্ধারিত করেছিল। কারণ আল্লাহ তা'আলা এ দিনেই বনী ইসরাঈল জাতিকে ফেরাউনের গোলামী থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। খৃষ্টানরা নিজেদেরকে ইহুদীদের থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্য রবিবার দিনকে তাদের জাতীয় প্রতীক হিসেবে নির্ধারিত করে। যদিও এ সম্পর্কিত কোন নির্দেশ না হযরত ঈসা দিয়েছিলেন না ইনজীল তথা বাইবেলে এর কোন উল্লেখ আছে। তবে খৃষ্টানদের বিশ্বাস হলো ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ উৎসর্গ করার পর এ দিনেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কবর থেকে বেরিয়ে আসমানের দিকে গিয়ে ছিলেন। এ কারণেই পরবর্তীকালের খৃষ্টানরা এ দিনটিকে তাদের উপাসনার দিন হিসেবে গ্রহণ করে। তারপর ৩২১ খৃষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্য একটি নির্দেশের দ্বারা এ দিনটিকে সাধারণ ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করে। এ দু'টি জাতি থেকে নিজ জাতিকে আলাদা করার জন্য ইসলাম এ দু'টি দিন বাদ দিয়ে জুম'আর দিনকে সামষ্টিক ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করেছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবু মাসউদ আনসারীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, হিজরাতের কিছুকাল পূর্বে পবিত্র মক্কাতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

ওপর জুম'আ ফরয হওয়ার বিধান নাযিল হয়। কিন্তু সে সময় তিনি এ নির্দেশের ওপর আমল করতে পারতেন না। কারণ মক্কায় সামষ্টিক কোন ইবাদাত করা সম্ভব ছিল না। তাই যেসব লোক নবীর (সা) আগে মদীনায় হিজরাত করেছিলেন তিনি তাঁদের নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে, তারা যেন সেখানে জুম'আ কায়েম করে। অতএব প্রথম দিকে হিজরাতকারীদের নেতা হযরত মুস'আব ইবনে উমায়ের ১২ জন লোক নিয়ে মদীনায় সর্বপ্রথম জুম'আর নামায আদায় করেন। (তাবারানী, দারু কুতনী)। হযরত কা'ব ইবনে মালেক এবং ইবনে সিরীনের বর্ণনা মতে এরও পূর্বে আনসারগণ আপনা থেকেই (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পৌছার পূর্বে) সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তারা সবাই মিলে সপ্তাহে একদিন সামষ্টিকভাবে ইবাদাত করবেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা ইহুদীদের সাব্‌ত এবং খৃষ্টানদের রবিবার বাদ দিয়ে জুম'আর দিনকে মনোনীত করেছিলেন এবং বনী বায়দা এলাকায় হযরত আস'আদ ইবনে যুরারা প্রথম জুম'আ পড়েছিলেন। এতে ৪০ ব্যক্তি শরীক হয়েছিল (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান, আবদ ইবনে হুমায়েদ, আবদুর রায্‌যাক, বায়হাকী)। এ থেকে জানা যায় ইসলামী জনতার আবেগ অনুভূতি তখন এমন একটি দিন থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিল যেদিন অধিক সংখ্যক মুসলমান একত্র হয়ে সামষ্টিকভাবে ইবাদাত করবে। তা শনিবার ও রবিবার থেকে আলাদা কোন দিন হওয়াটাও ইসলামী রুচি ও মেজাজ–প্রকৃতিরই দাবী ছিল। যাতে মুসলমানদের জাতীয় প্রতীক ইহুদী ও খৃষ্টানদের জাতীয় প্রতীক থেকে আলাদা থাকে। এটা সাহাবা কিরামের ইসলামী মানসিকতার একটি বিস্ময়কর কীর্তি। অনেক সময় নির্দেশ আসার পূর্বে তাদের এই রুচি ও মেজাজ–প্রকৃতিই বলে দিতো যে, ইসলামের মেজাজ ও প্রকৃতি অমুক জিনিসের দাবী করছে।

হিজরাত করার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম যে কাজগুলো করেন জুম'আর নামায কায়েম করা তার অন্যতম। পবিত্র মক্কা নগরী থেকে হিজরাত করে সোমবার দিন তিনি কুবায় উপনীত হন, চারদিন সেখানে অবস্থান করেন এবং পঞ্চম দিন জুম'আর দিনে সেখান থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে বনী সালেম ইবনে আওফের এলাকায় জুম'আর নামাযের সময় হয়। সেখানেই তিনি প্রথম জুম'আর নামায পড়েন। (ইবনে হিশাম)

এ নামাযের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার পরের সময় নির্দিষ্ট করেছিলেন অর্থাৎ ঠিক যোহরের নামাযের সময়। হিজরাতের পূর্বে হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরকে তিনি যে লিখিত নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন ঃ

فَاِذَا مَالَ النَّهَارُ عَنْ شَطْرِهِ عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَتَقَرَّبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِرَكْعَتَيْنِ - (دار قطنى)

"জুম'আর দিন সূর্য যখন মাথার ওপর থেকে পশ্চিম দিকে হেলে পড়বে তখন দুই রাকআত নামাযের সাহায্যে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর।" (দারু কুতনী)

হিজরাতের পরে তিনি মৌখিকভাবেও এ নির্দেশ দিয়েছেন এবং কার্যতও ঐ সময়ে জুম'আর নামায পড়াতেন। হযরত আনাস (রা) হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা),

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা), হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা), হযরত সাহল (রা) ইবনে সা'দ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আম্মার (রা) ইবনে ইয়াসির এবং হযরত বেলাল (রা) থেকে হাদীস গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। ঐ সব বর্ণনায় আছে সূর্য মাথার ওপর থেকে হেলে পড়ার পর নবী (সা) জুম'আর নামায পড়তেন। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ–কর্ম থেকে এ বিষয়টিও প্রমাণিত যে, জুম'আর দিন তিনি যোহরের নামাযের পরিবর্তে জুম'আর নামায পড়াতেন। এ নামায ছিল মাত্র দু' রাকআত। নামাযের আগে তিনি খুতবা দিতেন। এটা ছিল জুম'আর নামায এবং অন্যান্য দিনের যোহরের নামাযের মধ্যে পার্থক্যসূচক। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ

صَلٰوةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلٰوةُ الْفَجْرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلٰوةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اِنَّمَا قُصِرَتِ الْجُمُعَةُ لاَجْلِ الْخُطْبَةِ –

(احكام القران للجصاص)

"তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ নিসৃতবাণী অনুসারে মুসাফিরের নামায দুই রাকআত, ফজরের নামায দু' রাকআত এবং জুম'আর নামায দুই রাকআত। এটা কসর নয়, বরং পূর্ণ নামায। আর খোতবা থাকার কারণে জুম'আর নামায সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।"

এখানে যে আযানের উল্লেখ করা হয়েছে তা খোতবার বেশ আগে যে আযানের মাধ্যমে মানুষকে জুম'আর নামাযের সময় আরম্ভ হওয়ার বিষয়টি অবগত করা হয় সে আযান নয়, বরং খোতবার ঠিক আগে যে আযান দেয়া হয় সেই আযান। হযরত সায়েব (রা) ইবনে ইয়াযীদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাসের যুগে শুধু একটি আযান দেয়া হতো। আর তা দেয়া হতো ইমাম মিম্বরে উঠে বসার পর। হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমরের (রা) যুগেও এ কাজটিই করা হয়েছে। অতপর হযরত উসমানের (রা) সময়ে জনবসতি বৃদ্ধি পেলে তিনি আরো একটি আযান দেয়ানো শুরু করেন। মদীনার বাজারে অবস্থিত তাঁর যাওরা নামক বাড়ীতে এ আযান দেয়া হতো। (বুখারী, আবু দাউদ, নাসায়ী, তাবারানী)

১৫. এই নির্দেশের মধ্যে উল্লেখিত (যিক্‌র) শব্দের অর্থ হচ্ছে খোত্‌বা। কারণ, আযানের পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম যে কাজটি করতেন তা ছিল খোতবা। তিনি সবসময় খোতবার পরে নামায পড়তেন। হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "জুম'আর ফেরেশতাগণ নামাযের জন্য আগমনকারী ব্যক্তির নাম তাদের আগমনের পরম্পরা অনুসারে লিখতে থাকেন। অতপর اذا خرج الامام حضرت الملئكة يستمعون الذكر

ইমাম যখন খোতবার জন্য দাঁড়ান তখন তাঁর নাম লেখা বন্ধ করে দেন এবং যিকর (অর্থাৎ খোতবা) শুনতে মনোনিবেশ করেন" (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)। এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, যিকর অর্থ খোতবা। কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি থেকেও এ অর্থের ইংগিত পাওয়া যায়। কুরআনে প্রথমে বলা হয়েছেঃ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ "আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও।" পরে বলা হয়েছে ঃ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ "তারপর নামায শেষ হয়ে গেলে ভূ–পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ো।" এ থেকে জুম'আর দিনের কাজের যে পরম্পরা বুঝা যায় তা হচ্ছে, প্রথমে আল্লাহর যিকির এবং তারপর নামায। মুফাস্‌সিরগণও এ বিষয়ে একমত যে, যিকির অর্থ হয় খোতবা, নয়তো খোতবা ও নামায উভয়টিই।

খোতবার জন্য ذِكْرِ اللَّهِ (যিকরুল্লাহ—আল্লাহর যিকির) শব্দ ব্যবহার করায় আপনা থেকেই এ অর্থ প্রকাশ পায় যে, খোতবার মধ্যে এমন সব বিষয় থাকতে হবে যা আল্লাহর স্মরণের সাথে সম্পর্কিত। যেমন ঃ আল্লাহর তারিফ ও প্রশংসা, তাঁর রসূলের প্রতি দরুদ ও সালাত, তাঁর হুকুম আহকাম, তাঁর শরীয়াত অনুসারে আমলের শিক্ষা ও উপদেশ এবং তাঁকে ভয় করেন এমন সব নেক বান্দাদের প্রশংসা ইত্যাদি। এ কারণে যামাখশারী কাশ্‌শাফে লিখেছেন যে, খোতবায় জালেম শাসকদের তারিফ ও প্রশংসা করা কিংবা তাদের নামোল্লেখ করা এবং তাদের জন্য দোয়া করার "যিক্‌রুল্লাহ"র সাথে দূরতম সম্পর্কও নেই। বরং তা "যিকরুশ্‌ শাইতান"—শয়তানের যিকির হিসেবে পরিগণিত।

'আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও' অর্থ 'দৌড়িয়ে আস' নয়। বরং এর অর্থ হলো, তাড়াতাড়ি সেখানে পৌছার চেষ্টা করো। আমাদের ভাষায়ও আমরা এ ধরনের অনেক কথা বলে থাকি। এসব কথার অর্থ হয়ে থাকে তৎপরতা দেখানো। দৌড়ানো অর্থে তা ব্যবহার করা হয় না। অনুরূপ আরবীতেও سعى শব্দ দ্বারা শুধু দৌড়ানোই বুঝায় না। কুরআনের অধিকাংশ স্থানে سعى শব্দটি প্রচেষ্টা চালানো এবং চেষ্টা–সাধনা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ – وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا –

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ – وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا –

মুফাস্‌সিরগণও সর্বসম্মতভাবে এ শব্দটিকে গুরুত্ব আরোপ করা অর্থে গ্রহণ করেছেন তাঁদের মতে سعى অর্থ হলো, আযান শোনার পর মানুষ অবিলম্বে মসজিদে পৌছার চিন্তা করতে থাকবে। ব্যাপারটা শুধু এতটুকু নয়, বরং নামাযের জন্য দৌড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নামায শুরু হলে ধীরে সুস্থে ও স্থিরচিত্তে গাম্ভীর্যের সাথে নামাযে শরীক হওয়ার জন্য অগ্রসর হও, দৌড়িয়ে শরীক হয়ো না। এভাবে অগ্রসর হয়ে যতটা নামায পাবে তাতে শরীক হবে এবং যতটা ছুটে যাবে তা পরে পূরণ করে নেবে। (সিহাহ সিত্তাহ) হযরত আবু কাতাদা আনসারী (রা) বলেন ঃ একবার আমরা নবীর (সা) সাথে নামায পড়ছিলাম। হঠাৎ আমরা লোকজনের দৌড়াদৌড়ি করে চলার শব্দ শুনতে পেলাম। নামায শেষ করে নবী (সা) ঐ লোকগুলোকে জিজ্ঞেস

করলেন, এসব কিসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম? তারা বলল ঃ নামাযে শরীক হওয়ার জন্য আমরা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে আসছিলাম। তিনি বললেন ঃ এরূপ করবে না। যখনই নামাযে আসবে শান্তভাবে ও স্থিরচিত্তে আসবে। এভাবে ইমামের সাথে যতটা নামায পাওয়া যাবে পড়বে। আর যে অংশ ছুটে যাবে তা পরে পড়ে নেবে। (বুখারী, মুসলিম)।

'কেনা-বেচা পরিত্যাগ করো' কথাটার অর্থ শুধু কেনা-বেচাই পরিত্যাগ করা নয়, বরং নামাযের জন্য যাওয়ার চিন্তা ও ব্যবস্থা ছাড়া অন্য আর সব ব্যস্ততা পরিত্যাগ করা। বিশেষভাবে বেচা-কেনার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে শুধু এজন্য যে, জুম'আর দিন ব্যবসায় বাণিজ্য খুব জমে উঠতো। এই দিন আশেপাশের জনপদের লোকজন একস্থানে সমবেত হতো। ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যদ্রব্য নিয়ে সেখানে পৌছত। লোকজনও তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়তো। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা কেবল কেনা-বেচা পর্যন্তই সীমিত নয়, অন্যান্য সব ব্যস্ততাও এর অন্তরভুক্ত। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে ঐ সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তাই ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, জুম'আর আযানের পর কেনা-বেচা এবং অন্য সবরকমের কাজ কারবার হারাম।

এই নির্দেশটি থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে জুম'আর নামায ফরয। প্রথমত আযান শোনামাত্র জুম'আর নামাযের জন্য যাওয়ার তাগাদাই তার প্রমাণ। তাছাড়া জুম'আর নামাযের জন্য কেনা-বেচার মত একটা হালাল কাজ হারাম হয়ে যাওয়াও এর ফরয হওয়া প্রমাণ করে। উপরন্তু জুম'আর দিন যোহরের ফরয নামায রহিত হয়ে যাওয়া এবং তার পরিবর্তে জুম'আর নামায প্রতিষ্ঠিত হওয়াও এর ফরয হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। কারণ, কোন ফরয কেবল তখনই রহিত হয় যখন তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন ফরয তার স্থান পূরণ করে। বহু সংখ্যক হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এসব হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুম'আর নামাযের জন্য কঠোরভাবে তাকীদ করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় তাকে ফরয বলে ঘোষণা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার মন চায়, অন্য কাউকে আমার পরিবর্তে নামায পড়াতে দাঁড় করিয়ে দেই এবং নিজে গিয়ে সেসব লোকদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেই যারা জুম'আর নামায পড়তে আসে না (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী)। হযরত আবু হুরাইরা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, আমরা জুম'আর খোতবায় নবীকে (সা) একথা বলতে শুনেছি ঃ মানুষের জুম'আর নামায পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যথায় আল্লাহ তাদের মনের ওপর মোহর মেরে দেবেন এবং তারা গাফিল হয়ে যাবে। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম, নাসায়ী)। হযরত আবুল জা'দ (রা) দামরী, হযরত জাবের (রা) ইবনে আবদুল্লাহ ও হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইবনে আবী আওফার বর্ণিত হাদীসসমূহে নবীর (সা) যেসব বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, "যে ব্যক্তি প্রকৃত কোন কারণ ও সংগত ওযর ছাড়া শুধু বে-পরোয়া মানসিকতার কারণে পরপর তিনটি জুম'আ পরিত্যাগ করে আল্লাহ তার দিলের ওপর মোহর মেরে দেন। বরং একটি হাদীসে তো এতদূর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার দিলকে মুনাফিকের দিল বানিয়ে দেন" (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজা, দারেমী,

হাকেম, ইবনে হিব্বান, বায্যার, তাবারানী ফিল কাবীর) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আজ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ওপর জুম'আর নামায ফরয। যে ব্যক্তি তাকে মামুলি ব্যাপার মনে করে এবং তার গুরুত্ব স্বীকার না করে পরিত্যাগ করবে আল্লাহ যেন তার অবস্থা ভাল না করেন এবং তাকে কোন প্রকার বরকতও না দেন। কান পেতে শুনে নাও যতক্ষণ সে তাওবা না করবে তার নামায নামায নয়, তার যাকাত যাকাত নয়, তার হজ্জ হজ্জ নয়, তার রোযা রোযা নয়, তার কোন নেক কাজ নেক কাজ নয়। অতপর যে তাওবা করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমাকারী।" (ইবনে মাজা, বায্যার) প্রায় একই অর্থের একটি হাদীস তাবারানী তাঁর 'আওসাত' গ্রন্থে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও বহু সংখ্যক হাদীসে নবী (সা) স্পষ্ট ভাষায় জুম'আর নামাযকে ফরয এবং অবশ্য পালনীয় হক বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) ইবনে আস বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যারা আযান শুনতে পায় জুম'আর নামায তাদের ওপরই ফরয (আবু দাউদ, দারুকুতনী)। জাবের (রা) ইবনে আবদুল্লাহ ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ "জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের ওপর জুম'আর নামায ফরয করেছেন" (বায়হাকী)। তবে তিনি নারী, শিশু, ক্রীতদাস, অসুস্থ ব্যক্তি এবং মুসাফিরকে এ ফরয পালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। হযরত হাফসা বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ "জুম'আর নামাযের জন্য বের হওয়া প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব" (নাসায়ী)। হযরত তারেক ইবনে শিহাব বর্ণিত হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ ক্রীতদাস, নারী, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া জামায়াতের সাথে জুম'আ পড়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব (আবু দাউদ ও হাকেম)। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদীসে নবীর (সা) ভাষ্য হলো ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে তার ওপরে জুম'আ ফরয। তবে নারী, মুসাফির, ক্রীতদাস বা অসুস্থ ব্যক্তির ওপর ফরয নয় (দারু কুতনী, বায়হাকী)। কুরআন ও হাদীসের এই স্পষ্ট বক্তব্যের ভিত্তিতে জুম'আর নামায ফরয হওয়া সম্পর্কে গোটা মুসলিম উম্মাহ ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

১৬. একথার অর্থ এ নয় যে, জুম'আর নামায পড়ার পর ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়া বা রিযিকের অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে উঠা জরুরী। বরং এ নির্দেশ থেকে শুধু এ কাজ করার অনুমতি বুঝায়। যেহেতু জুম'আর আযান শোনার পর সব কাজ কর্ম পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাই বলা হয়েছে, নামায শেষ হওয়ার পর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার এবং যে কাজ–কর্ম করতে চাও তা করার অনুমতি তোমাদের জন্য আছে। এটা ঠিক ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ করার পর فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا "যখন ইহ্‌রাম খুলবে তখন শিকার করো" (আল মায়েদাহ, ৩) বলার মত। এ কথার অর্থ এটা নয় যে, ইহ্‌রাম খোলার পর অব্যশই শিকার করতে হবে। বরং এর অর্থ হলো, ইহ্‌রাম খোলার পর শিকার করার ব্যাপারে আর কোন বাধা নিষেধ থাকে না। কিংবা সূরা নিসাতে যেমন فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ আয়াতাংশে একাধিক বিয়ে করার অনুমিত দেয়া হয়েছে। এখানে যদিও নির্দেশসূচক শব্দ فَانْكِحُوا ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কেউ–ই একে নির্দেশ অর্থে গ্রহণ করেননি। এর থেকে মৌলিক একটি মাসয়ালার তথা সূত্র পাওয়া যায় যে, আদেশসূচক শব্দ দ্বারা সবসময় কোন জিনিস ওয়াজিব বা অবশ্য পালনীয় বলে

প্রমাণিত হয় না। বরং তা কখনো অনুমতি আবার কখনো কোন জিনিসকে তুলনামূলকভাবে বেশী পছন্দ করা অর্থ বুঝায়। এ ক্ষেত্রে কোথায় তা আদেশ অর্থে, কোথায় অনুমতি অর্থে এবং কোথায় আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে বিষয়টি আগের ও পরের প্রসংগ থেকে বুঝা যায়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই যে কাজটি ফরয বা ওয়াজিব সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এ আয়াতাংশের ঠিক পরের আয়াতাংশেই বলা হয়েছে وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا "আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করো।" এখানেও আদেশসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ শব্দ ওয়াজিব বা অবশ্য করণীয় অর্থ প্রকাশ করছে না, বরং "পছন্দনীয় হওয়া" অর্থ প্রকাশ করছে। এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখ্য যে, কুরআনে যদিও ইহুদীদের সাব্‌ত এবং খৃষ্টানদের রোববারের মত জুম'আর দিনকে সাধারণ ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়নি, কিন্তু একথা কেউ–ই অস্বীকার করতে পারে না যে, শনিবার ও রবিবার ইহুদী ও খৃষ্টানদের জাতির প্রতীক জুম'আও ঠিক তেমনি মুসলমানদের জাতির প্রতীক। সুতরাং তামাদ্দুনিক বা সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে যদি সপ্তাহের কোন দিনকে সাধারণ ছুটির জন্য মনোনীত করতে হয় তাহলে ইহুদীরা যেমন স্বাভাবিকভাবে শনিবারকে এবং খৃষ্টানরা রোববারকে বেছে নিয়েছে তেমনি এ উদ্দেশ্যে মুসলমানরাও (যদি তাদের মন–মানস ও স্বভাব প্রকৃতিতে লেশমাত্র ইসলামী অনুভূতি বিদ্যমান থেকে থাকে) জুম'আর দিনকেই বেছে নেবে। খৃষ্টানরা তো তাদের নিজের দেশ ছাড়া এমনসব দেশের ওপরও তাদের রোববার চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। যেখানে খৃষ্টানদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য ছিল। ইহুদীরা ফিলিস্তিনে তাদের ইসরাঈলী রাষ্ট্র কায়েম করলে সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছিল তা হচ্ছে রোববারের পরিবর্তে শনিবারকে ছুটির দিন হিসেবে নির্ধারিত করা। বিভাগ পূর্ব ভারতে বৃটিশ ভারত এবং মুসলিম দেশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নজরে পড়ত তাহচ্ছে দেশের এক অংশে রোববারে সাপ্তাহিক ছুটি হতো এবং অন্য অংশে জুম'আর দিনে ছুটি হতো। তবে যেসব জায়গায় মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী অনুভূতি ও ভাবধারা বর্তমান থাকত না সেখানে ক্ষমতা নিজেদের হাতে আসার পরও তারা রোববারকেই বুকে জড়িয়ে রাখে যা আমরা পাকিস্তানে দেখতে পাচ্ছি। আর চেতনাহীনতার মাত্রা এর চেয়েও অধিক হলে জুম'আর দিনের সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করে রোববার দিন সাপ্তাহিক ছুটি চালু করা হয়। মুস্তাফা কামাল তুরস্কে এ কাজটিই করেছেন।

১৭. অর্থাৎ নিজেদের কাজ–কর্ম ও ব্যবসায়–বাণিজ্যে ব্যস্ত হয়েও আল্লাহকে ভুলে যেও না। বরং সর্বাবস্থায় তাঁকে স্মরণে রাখো এবং তাঁকেই স্মরণ করতে থাকো। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাব, টীকা ৬৩)।

১৮. কুরআন মজীদে বেশ কিছু সংখ্যক জায়গায় একটি হিদায়াত বা দিক নির্দেশনা, কিংবা একটি উপদেশ অথবা একটি নির্দেশ দেয়ার পর لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (হয়তো তোমরা সফল হবে, কল্যাণ লাভ করবে) এবং لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (হয়ত তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে) বলা হয়েছে। এসব স্থানে "হয়ত" বা "সম্ভবত" শব্দ ব্যবহার করার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তা'আলার (মা'আযাল্লাহ) কোন সন্দেহ আছে। মূল ব্যাপার তা নয়। বরং এটি একটি রাজকীয় বর্ণনাভঙ্গি। এটা ঠিক তেমন যেন কোন দয়ালু মনিব তাঁর কর্মচারীকে বলছেন, তুমি অমুক কাজটি করো, হয়তো তোমার পদোন্নতি

হবে। এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম অদৃশ্য প্রতিশ্রুতি থাকে যার আশায় কর্মচারীটি মনযোগ দিয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে ঐ কাজটি আঞ্জাম দিতে থাকে। কোন বাদশাহর মুখ থেকে তার কোন কর্মচারীর উদ্দেশ্যে একথা উচ্চারিত হলে তার ঘরে খুশীর বন্যা বয়ে যায়।

এখানে যেহেতু জুম'আর নামাযের হুকুম-আহকাম বর্ণনা শেষ হয়ে গিয়েছে, তাই কুরআন, হাদীস, সাহাবীদের উক্তি এবং ইসলামের সাধারণ মূলনীতির আলোকে চারটি ফিক্‌হী মাযহাবে জুম'আর নামায সম্পর্কে যেসব হুকুম-আহকাম বের করে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে এখানে তার সারসংক্ষেপ বর্ণনা করা সমীচীন হবে বলে মনে হয়।

হানাফী মাযহাবের মতে যোহরের নামাযের সময়ই জুম'আর নামাযের সময়। জুম'আ এ সময়ের পূর্বেও পড়া যেতে পারে না, পরেও পড়া যেতে পারে না। প্রথম আযানের সময় থেকেই কেনা-বেচা হারাম হয়ে যায়, —ইমাম মিম্বারের ওপর বসার পর দ্বিতীয় আযান দেয়ার সময় থেকে নয়। কারণ, কুরআনে শুধু اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة কথাটি বলা হয়েছে। তাই সূর্য মাথার ওপর থেকে পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার পর যখন জুম'আর সময় শুরু হয় তখন জুম'আর নামাযের যে আযানটিই দেয়া হোক না কেন তা শোনার পর লোকদের কেনা-বেচা বন্ধ করে দেয়া কর্তব্য। তবে সেই সময় যদি কোন ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করে তবে সেই ক্রয় বিক্রয় অবৈধ বা বাতিল হবে না, বরং তা কেবল একটি গোনাহর কাজ হবে। জুম'আর নামায প্রতিটি জনপদেই অনুষ্ঠিত হবে না, বরং শুধু مصر جامع "মিসরে জামে"-তে অনুষ্ঠিত হতে পারবে। নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা অনুসারে 'মিসরে জামে' বলা হয় এমন শহরকে যেখানে বাজার আছে, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আছে এবং তার জনবসতিও এত যে, যাদের ওপর জুম'আর নামায ফরয তারা সবাই যদি ঐ শহরের সর্বাপেক্ষা বড় মসজিদে সমবেত হয় তাহলে সেখানে স্থান সংকুলান হবে না। যেসব লোক শহরের বাইরে বসবাস করেন তাদের জন্য শহরে এসে জুম'আর নামায পড়া কেবল তখনই ফরয যখন আযানের শব্দ তারা শুনতে পাবে কিংবা খুব বেশী হলে শহর থেকে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত হবে। নামায মসজিদেই হতে হবে তা জরুরী নয়। নামায খোলা মাঠেও হতে পারে। এমন মাঠেও জুম'আর নামায হতে পারে যা শহরের বাইরে অবস্থিত হলেও মূল শহরের একটি অংশ বলে বিবেচিত। যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির শরীক হওয়ার সাধারণ অনুমতি আছে শুধু সেখানেই জুম'আর নামায অনুষ্ঠিত হতে পারে। কোন বন্ধ জায়গায় যত মানুষই একত্রিত হোক না কেন, সেখানে সবারই আসার অনুমতি না থাকলে, জুম'আ সহীহ হবে না। জুম'আর নামায সহীহ হওয়ার জন্য জামায়াতে [আবু হানীফার (র) মতে] ইমাম ছাড়া কমপক্ষে তিন জন অথবা [আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদের মতে] ইমাম সহ দুইজন এমন লোক থাকতে হবে যাদের ওপর জুম'আ ফরয। যেসব ওজর থাকলে জুম'আ পড়া থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় তা হচ্ছে ঃ সফরে থাকা, অথবা এমন রুগ্ন হওয়া যে, নিজে হেঁটে মসজিদে আসার ক্ষমা নেই। অথবা দু'টি পা-ই অক্ষম অথবা অন্ধ, (কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদের (র) মতে অন্ধ ব্যক্তি কেবল তখনই জুম'আ পড়া থেকে অব্যাহতি পাবে যখন তাকে মসজিদে নিয়ে যাবার মত কোন লোক পাবে না)। অথবা কোন অত্যাচারীর পক্ষ থেকে তার জীবন ও মান-ইজ্জতহানির কিংবা সহ্যসীমা বহির্ভূত আর্থিক ক্ষতির আশংকা থাকে অথবা প্রচণ্ড বৃষ্টি অথবা কাদা পানি থাকে অথবা যদি সে বন্দী থাকে।

কয়েদী ও অক্ষমদের জন্য জুম'আর দিনে যোহরের নামায জামায়াতে পড়া মাকরূহ। যারা জুম'আর নামায পায়নি তাদের জন্যও যোহরের নামায জামায়াতে পড়া মাকরূহ। খোতবা জুম'আ সহীহ হওয়ার একটি শর্ত। কারণ, নবী কখনো খোতবা ছাড়া জুম'আর নামায পড়েননি। আর খোতবা অবশ্যই দু'টি হতে হবে এবং নামাযের আগে হতে হবে। ব্যক্তি যে স্থানে বসে আছে সে স্থান পর্যন্ত আওয়াজ পৌছুক আর না পৌছুক খোতবা দেয়ার জন্য ইমাম যখন মিম্বারের দিকে অগ্রসর হবেন তখন থেকে খোতবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবরকম কথাবার্তা নিষিদ্ধ। এই সময় নামাযও না পড়া উচিত। (হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া, উমদাতুল কারী)।

শাফেয়ী মাযহাবের মতে যোহরের নামাযের সময়ই জুম'আর নামাযের সময়। যখন দ্বিতীয় আযান (অর্থাৎ ইমাম মিম্বারের ওপর বসার পর যে আযান দেয়া) হবে তখন থেকে কেনা-বেচা হারাম ও নামাযের জন্য যাওয়া ওয়াজিব। তা সত্ত্বেও কেউ যদি এ সময় কেনা-বেচা করে তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে না। এমন প্রত্যেকটি জনপদেই জুম'আ অনুষ্ঠিত হতে পারবে যেখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে ৪০ জন লোক এমন আছে যাদের ওপর জুম'আর নামায ফরয। জনপদের বাইরের যেসব এলাকার লোক আযান শুনতে পায় তাদের জন্য জুম'আর নামাযে হাজির হওয়া অবশ্য কর্তব্য। জনবসতির অভ্যন্তরেই জুম'আর নামায অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। তবে জরুরী নয় যে, তা মসজিদেই পড়তে হবে। যারা মরু ভূমির মধ্যে তাঁবুতে অবস্থান করে তাদের ওপরে জুম'আ ফরয নয়। জুম'আ শুদ্ধ হওয়ার জন্য যাদের ওপর জুম'আ ফরয ইমাম সহ কমপক্ষে এ রকম ৪০ জন লোকের জামায়াতে উপস্থিত থাকা আবশ্যক। যেসব ওজর থাকার কারণে কোন ব্যক্তি জুম'আর নামায পড়া থেকে অব্যাহতি লাভ করে তা হচ্ছে ঃ সফরে থাকা অথবা কোন স্থানে চারদিন বা তার কম সময় অবস্থান করার ইচ্ছা করা, তবে সফর বৈধ হতে হবে। এমন বৃদ্ধ বা রুগ্ন যে সওয়ারীতে চড়েও জুম'আয় হাজির হতে অক্ষম। অন্ধ হওয়া এবং তাকে নামাযের জন্য মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মত কোন লোক না পাওয়া। প্রাণ, সম্পত্তি অথবা মান-ইজ্জতহানির আশংকা থাকা। বন্দী অবস্থায় থাকা। তবে এই বন্দিদশা তার নিজের কোন অপরাধের কারণে না হওয়া। নামাযের পূর্বে দু'টি খোতবা থাকতে হবে। খোতবার সময় চুপচাপ থাকা সুন্নাত, তবে কথা বলা হারাম নয়। যে ব্যক্তি ইমামের এতটা কাছে বসেছে যে, খোতবা শুনতে পায় তার জন্য কথাবার্তা বলা মাকরূহ। তবে সে সালামের জবাব দিতে পারে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামের উল্লেখ শুনে উচ্চস্বরে দরূদ পাঠ করতে পারে। (মুগনিউল মুহতাজ, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া)।

মালেকী মাযহাবের মতে জুম'আর নামাযের সময় হচ্ছে, সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার পর থেকে শুরু করে মাগরিবের এতটা পূর্ব পর্যন্ত যেন সূর্যাস্তের আগেই খোতবা ও নামায শেষ হয়ে যায়। কেনা-বেচা হারাম ও নামাযের জন্য যাওয়া ওয়াজিব হয় দ্বিতীয় আযান থেকে। এ সময়ের পর কোন কেনা-বেচা হলে তা অবৈধ ও বাতিল বলে গণ্য হবে। কেবল সেই সব জনপদেই জুম'আ অনুষ্ঠিত হতে পারে যেখানকার অধিবাসীগণ স্থায়ীভাবে সেখানে বাসস্থান তৈরি করে বসবাস করছে। শীত গ্রীষ্মে তারা অন্য কোন স্থানে চলে যায়

না। তারা ঐ জনপদেই তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুর সরবরাহ পেয়ে থাকে এবং সংখ্যার দিক দিয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে পারে। অস্থায়ী অবস্থানস্থলে যত লোকই থাক না কেন এবং তারা যতদিনই অবস্থান করুক না কেন সেখানে জুম'আ অনুষ্ঠিত হতে পারে না যে জনপদে জুম'আ অনুষ্ঠিত হয় তার তিন মাইল দূরত্বের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের ওপর জুম'আর নামাযে হাজির হওয়া ফরয। জুম'আর নামায কেবল এমন সব মসজিদেই অনুষ্ঠিত হতে পারে যা জনপদের ভিতরে বা সংলগ্নস্থানে অবস্থিত হবে এবং যার ইমারত জনপদের সাধারণ অধিবাসীদের ঘরের চেয়ে নিম্নমানের হবে না। এ ক্ষেত্রে কোন কোন মালেকী ফিকাহবিদ এরূপ শর্তও আরোপ করেছেন যে, মসজিদ ছাদ বিশিষ্ট হতে হবে এবং তাতে যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কিন্তু মালেকী মাযহাবের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত হলো, জুম'আ সহীহ হওয়ার জন্য মসজিদ ছাদ বিশিষ্ট হওয়া শর্ত নয়। এমন মসজিদেও জুম'আর নামায হতে পারে যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যবস্থা নেই—যা কেবল জুম'আর নামায পড়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। জুম'আর নামায সহীহ হওয়ার জন্য যাদের ওপর জুম'আর নামায ফরয ইমাম ছাড়া কমপক্ষে এ রকম ১২ জন লোকের জামায়াতে উপস্থিত থাকা জরুরী। যেসব ওজর বর্তমান থাকলে কোন ব্যক্তির ওপর থেকে জুম'আর নামায পড়ার নির্দেশ রহিত হয়ে যায় তা হচ্ছে ঃ সফরে থাকা অথবা সফর অবস্থায় কোন স্থানে চারদিনের কম সময় অবস্থানের নিয়ত করা। এমন রুগ্ন হওয়া যে, তার পক্ষে মসজিদে আসাই অসম্ভব। মা অথবা বাপ অথবা স্ত্রী অথবা সন্তান রুগ্ন ও অসুস্থ থাকা অথবা সে এমন কোন অপরিচিত রোগীর সেবা যত্ন করছে যার সেবা যত্ন করার মত আর কেউ নেই, অথবা তার কোন নিকটাত্মীয় কঠিন রোগে আক্রান্ত অথবা মরণাপন্ন। যে সম্পদের ক্ষতি সে বরদাশত করতে অক্ষম এমন সম্পদের ক্ষতির আশংকা থাকা। অথবা মারপিট ও বন্দীত্বের ভয়ে আত্মগোপন করে থাকা। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তাকে মজলুম বা অত্যাচারিতের পর্যায়ভুক্ত হতে হবে। প্রচণ্ড বৃষ্টি বা কাদা পানি থাকা কিংবা প্রচণ্ড গরম বা ঠাণ্ডা মসজিদ পর্যন্ত যেতে বাধা হয়ে দাঁড়ালে। নামাযের পূর্বে দু'টি খোতবা হওয়া অত্যাবশ্যক। এমনকি খোতবা যদি নামাযের পরে দেয়া হয় তাহলে নামায পুনরায় পড়া জরুরী। খোতবা মসজিদের ভিতরে হতে হবে। খোতবা দেয়ার জন্য ইমাম যখন মিম্বারের দিকে অগ্রসর হবেন সেই সময় নফল নামায পাড়া হারাম এবং খোতবা শুরু হলে তা শোনা না গেলেও কথাবার্তা বলাও হারাম। তবে খতীব যদি খোতবা বহির্ভূত কোন বাজে বা অপ্রয়োজনীয় কথা বলেন অথবা গালির উপযুক্ত নয় এমন কোন ব্যক্তিকে গালি দেন, অথবা এমন কোন ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুরু করেন যার প্রশংসা করা জায়েয নয়, অথবা খোতবার সাথে সম্পর্কহীন কোন কিছু পড়তে শুরু করেন তাহলে তার প্রতিবাদ করার অধিকার লোকজনের আছে। তাছাড়া জীবনের আশংকা না থাকলে বর্তমান বাদশাহ বা শাসকের জন্য খোতবার মধ্যে দোয়া করাও মাকরূহ। যিনি নামায পড়াবেন তাঁকেই খোতবা দিতে হবে। খতীব ছাড়া অন্য কেউ নামায পড়ালে সে নামায বাতিল হয়ে যাবে। (হাশিয়াতুদ দুসুকী আলাশ্ শারহিল কাবীর, আহকামুল কুরআন—ইবনে আরাবী, আল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া)।

হাম্বলী মাযহাবের মতে জুম'আর নামাযের সময় সকাল বেলা সূর্য কিছুটা ওপরে ওঠার পর থেকে আসরের সময় শুরু হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

আর যে সময় তারা ব্যবসায় ও খেল তামাশার উপকরণ দেখলো তখন তারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে[১৯] সেদিকে দৌড়ে গেল। তাদের বলো, আল্লাহর কাছে যা আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসায়ের চেয়ে উত্তম।[২০] আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।[২১]

আগে জুম'আর নামায পড়া শুধু জায়েয এবং পরে ওয়াজিব ও উত্তম। দ্বিতীয় আযান থেকে কেনা-বেচা হারাম এবং নামাযের জন্য প্রস্তুত হওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। এরপর কেনা-বেচা হলে তা কেনা-বেচা হয়েছে বলে ধরা হবে না। যাদের ওপর জুম'আর নামায ফরয এমন ৪০ জন লোক যে স্থানে আছে কেবল সেখানেই জুম'আ অনুষ্ঠিত হতে পারে। এসব লোকের স্থায়ীভাবে বাড়ীঘরে (তাঁবুতে নয়) বসবাসকারী হতে হবে। অর্থাৎ শীত বা গ্রীষ্মকালে তারা কোথাও স্থানান্তরিত হয় না। এ জন্য জনবসতির বাড়ী ঘর ও মহল্লাসমূহ পরস্পর সংলগ্ন হোক বা বিচ্ছিন্ন হোক তাতে কোন পার্থক্য হয় না। এই জনপদের বিভিন্ন অংশের মধ্যকার দূরত্ব কয়েক মাইল হলেও যদি তা সমষ্টিগতভাবে একটি নামে পরিচিত হয় তাহলে তা একটি জনপদ বলেই গণ্য হবে। এ ধরনের জনপদ থেকে যারা তিন মাইল দূরত্বের মধ্যে বসবাস করে তাদের জন্য জুম'আর নামায পড়তে মসজিদে আসা ফরয। জামায়াতে ইমাম সহ ৪০ ব্যক্তির উপস্থিত থাকা জরুরী। নামায মসজিদেই হতে হবে এমনটা জরুরী নয়। বরং খোলা মাঠেও নামায হতে পারে। যেসব কারণ বর্তমান থাকলে কোন ব্যক্তির ওপর জুম'আর নামায আর ফরয থাকে না তা হচ্ছে ঃ মুসাফির হওয়া, যে জনপদের লোকদের ওপর জুম'আ ফরয এমন জনপদে চারদিন বা তার কম সময় অবস্থানের ইচ্ছা করা, এমন রুগ্ন হওয়া যে সওয়ারীতে উঠে মসজিদে আসাও অসম্ভব, অন্ধ হওয়া—তবে সে নিজে যদি পথ হাতড়িয়ে আসতে পারে তাহলে আসবে। অন্য কোন লোকের সাহায্য নিয়ে অন্ধ ব্যক্তির জন্য মসজিদে আসা ওয়াজিব নয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা গরম অথবা প্রচণ্ড বৃষ্টি বা কাদা নামাযের স্থানে পৌছতে প্রতিবন্ধক হওয়া। কোন জালেমের জুলুম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আত্মগোপন করে থাকা। প্রাণ ও মান-ইজ্জতহানির আশংকা কিংবা এমন আর্থিক ক্ষতির আশংকা থাকা যা বরদাশত করা যাবে না। নামাযের আগে দু'টি খোতবা হতে হবে। খতীবের কথা শোনা যায়, যে ব্যক্তি খতীবের এতটা নিকটে আছে খোতবার সময় তাঁর জন্য কথাবার্তা বলা হারাম। তবে দূরে অবস্থিত লোক যার কাছে খতীবের আওয়াজ পৌছে না সে কথাবার্তা বলতে পারে। খতীব ন্যায়পরায়ণ হোক বা না হোক খোতবার সময় সবার চুপচাপ থাকা উচিত। জুম'আর দিনে ঈদ হলে যারা ঈদের নামায পড়বে তাদের জন্য জুম'আর নামায পড়া ফরয নয়। এ বিষয়ে হাম্বলী মযহাবের মত তিন ইমামের মত থেকে ভিন্ন (গায়াতুল মুনতাহা, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া)।

যে ব্যক্তির ওপর জুম'আ ফরয নয় সে যদি জুম'আর নামাযে শরীক হয় তাহলে তার নামায সহীহ হবে এবং তার ওপর যোহরের নামায আর ফরয থাকবে না। এ বিষয়ে সমস্ত ফিকাহবিদ একমত।

১৯. যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জুম'আর হুকুম-আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে এটিই সেই ঘটনা। হাদীস গ্রন্থসমূহে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত আবু মালেক এবং হযরত হাসান বসরী, ইবনে যায়েদ, কাতাদা এবং মুকাতিল ইবনে হাইয়ান থেকে ঘটনার যে বিবরণ বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে ঃ পবিত্র মদীনা নগরীতে সিরিয়া থেকে একটি বাণিজ্য কাফেলা ঠিক জুম'আর নামাযের সময়ে এসে পৌঁছলো এবং জনপদের লোকজন যাতে তাদের আগমনের খবর জানতে পারে সেজন্য ঢোল-বাদ্য বাজাতে শুরু করলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় খোতবা দিচ্ছিলেন। ঢোল ও বাদ্য যন্ত্রের শব্দ শুনে সব মানুষ অস্থির হয়ে উঠল এবং ১২ জন লোক ছাড়া সবাই 'বাকী' নামক স্থানে ছুঁটে গেল। বাণিজ্য কাফেলা এখানেই অবস্থান করছিল। এই ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। এর মধ্যে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর বর্ণনাটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। এ বর্ণনাটিকে ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু উওয়ানা, আব্দ ইবনে হুমাইদ, আবু ইয়ালা প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সময়ে বর্ণনা করেছেন। এসব বর্ণনার মধ্যে অসামঞ্জস্য শুধু এতটুকু যে, কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, ঘটনাটি নামাযরত অবস্থায় ঘটেছিল। আবার কোন বর্ণনাতে বলা হয়েছে যে, নবী (সা) যখন খোতবা দিচ্ছিলেন ঘটনাটি তখন ঘটেছিল। কিন্তু হযরত জাবের এবং অন্য সব সাহাবী ও তাবেয়ীদের সবগুলো বর্ণনা একসাথে বিচার করলে যে কথাটি সঠিক বলে মনে হয় তাহলো ঘটনাটি খোতবার সময় সংঘটিত হয়েছিল। যেখানে তিনি বলেছেন যে, ঘটনাটি জুম'আর নামাযের সময় ঘটেছিল সেখানে তিনি 'জুম'আর নামায' বলতে খোতবা ও নামায উভয়ের সমষ্টিকে বুঝিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় বলা হয়েছে, সে সময় ১২ জন পুরুষের সাথে সাত জন মহিলাও রয়ে গিয়েছিলেন। (ইবনে মারদুইয়া) কাতাদা বর্ণনা করেছেন যে, ১২ জন পুরুষের সাথে ১ জন মহিলাও ছিলেন (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম)। দারুকুতনীর একটি রেওয়ায়াতে ৪০ ব্যক্তি এবং আব্দ ইবনে হুমায়েদের রেওয়ায়াতে ৭ জনের কথা বলা হয়েছে। ফাররা, আটজনের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এগুলো সবই দুর্বল রেওয়ায়াত। কাতাদার এ রেওয়ায়াতও দুর্বল যে, এ ধরনের ঘটনা তিনবার ঘটেছিল (ইবনে জারীর)। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়াতটিই নির্ভরযোগ্য। এতে মসজিদে থেকে যাওয়া লোকের সংখ্যা ১২ জন বলা হয়েছে। আর কাতাদার একটি রেওয়ায়াত ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত সাহাবী ও তাবেয়ীদের বর্ণনাসমূহ এ বিষয়ে একমত যে, এ ঘটনা মাত্র একবারই ঘটেছে। মসজিদে থেকে যাওয়া লোকদের সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াত একত্রে বিচার করলে জানা যায়, তাদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আম্মার (রা)। ইবনে ইয়াসির, হুযায়ফার আযাদ কৃতদাস হযরত সালেম (রা) এবং হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ। হাফেস আবু ইয়া'লা হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর যে রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে।

লোকজন যখন এভাবে বের হয়ে চলে গেল এবং মাত্র ১২ জন অবশিষ্ট থাকলেন তখন নবী (সা) তাদের সম্বোধন করে বললেন ঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتّٰى لَمْ يَبْقَ مِنْكُمْ اَحَدٌ لَسَالَ بِكُمُ الْوَادِيْ نَارًا –

"তোমরা সবাই যদি চলে যেতে এবং একজনও অবশিষ্ট না থাকত তাহলে এ উপত্যকা আগুনের প্রবাহে প্লাবিত হয়ে যেত।"

ইবনে মারদুইয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এবং ইবনে জারীর কাতাদা থেকে প্রায় এর অনুরূপ বিষয় বর্ণনা করেছেন।

শিয়াগণ এ ঘটনাটিকেও সাহাবীদের (রা) প্রতি কটাক্ষ করার জন্য ব্যবহার করেছেন। তাঁরা বলেন ঃ এত বিপুল সংখ্যক সাহাবীর খোতবা এবং নামায ছেড়ে ব্যবসায়–বাণিজ্য ও খেল তামাশার দিকে ছুটে যাওয়া প্রমাণ করে, তারা দুনিয়াকে আখেরাতের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতেন। কিন্তু এটি এমন একটি কঠোর অমূলক দোষারোপ যা শুধু বাস্তব থেকে চোখ বন্ধ করেই করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনাটি ঘটেছিল হিজরাতের অব্যবহিত পরে। সে সময় একদিকে সাহাবীদের সামষ্টিক প্রশিক্ষণ ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে অন্যদিকে মক্কার কাফেররা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারা মদীনার অধিবাসীদের কঠোরভাবে অবরোধ করে রেখেছিল যার কারণে মদীনায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছিল। হযরত হাসান বসরী বলেন, সেই সময় মদীনায় মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছিল, কিন্তু জিনিসপত্রের দাম ছিল আকাশ ছোঁয়া (ইবনে জারীর)। ঠিক এই পরিস্থিতিতে মদীনায় একটি বাণিজ্য কাফেলা এসে হাজির হলে নামাযরত লোকজন এই ভেবে আশংকাবোধ করলো, আমরা নামায শেষ করতে করতে সব জিনিসপত্র বিক্রি না হয়ে যায়। এই ভয়ে তারা সেদিকে ছুটে গিয়েছিল। এটা ছিল এমন একটা ত্রুটি ও দুর্বলতা যা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব ও কঠোর পরিস্থিতির কারণে হঠাৎ করে সেই সময় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে এসব সাহাবী ইসলামের জন্য যেসব কুরবানী ও ত্যাগ–তিতিক্ষা দেখিয়েছেন তা যদি কেউ দেখে এবং ইবাদাত–বন্দেগী ও সামষ্টিক কাজ–কর্মে তাঁদের জীবন যে অতুলনীয় আল্লাহভীতির সাক্ষ দেয় তাও দেখে তাহলে সে একথা বলে তাদের ওপর দোষারোপ করার দুঃসাহস দেখাতে পারবে না যে, তাদের মধ্যে আখেরাতের চেয়ে দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যাধি ছিল। তবে তার নিজের হৃদয় মনে যদি সাহাবীদের প্রতি হিংসা–বিদ্বেষের ব্যাধি থেকে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

এ ঘটনা সাহাবীদের (রা) প্রতি কটাক্ষকারীদের যেমন সমর্থন করে না তেমনি সেসব লোকের ধ্যান–ধারণার প্রতিও সমর্থন জানায় না যারা সাহাবীদের প্রতি ভক্তি–শ্রদ্ধার আতিশয্যে দাবী করেন যে, তাদের দ্বারা কখনো কোন ভুল হয়নি, কিংবা হয়ে থাকলেও কখনো তা উল্লেখ করা উচিত নয়। কারণ তাঁদের ভুল–ত্রুটির উল্লেখ করা এবং তাকে ভুল–ত্রুটি বলা তাঁদের অপমান করার শামিল। এতে হৃদয় মনে তাদের প্রতি মর্যাদা ও শ্রদ্ধাবোধ অবশিষ্ট থাকে না। তাছাড়া তাঁদের ভুল–ত্রুটির উল্লেখ সেসব আয়াত ও হাদীসেরও পরিপন্থী যার মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় সাহাবীদের ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া আল্লাহর নিকট

প্রিয় হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এসব কথা স্পষ্ট বাড়াবাড়ি। এর সমর্থনে কুরআন ও হাদীসে কোন দলীল নেই। এখানে যে কেউ দেখতে পারেন, বিপুল সংখ্যক সাহাবীর (রা) একটি দল কর্তৃক যে ত্রুটি হয়েছিল আল্লাহ তা'আলা নিজে এখানে তাঁদের সেই ত্রুটির উল্লেখ করেছেন। এমন গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত উম্মাতকে পড়তে হবে। সেই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে গ্রন্থে তাঁদের ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া এবং আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার কথাও স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া হাদীস ও তাফসীরের সমস্ত গ্রন্থে সাহাবা কিরাম (রা) থেকে পরবর্তীকালের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বড় বড় মনীষীগণ পর্যন্ত তাঁদের এই ত্রুটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ কি এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মন থেকে ঐ সব সাহাবীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে ঐ ত্রুটির উল্লেখ করেছেন যা তিনি নিজেই মানুষের মনে কায়েম করতে চান? অথবা এর অর্থ কি এই যে, এসব অন্ধ ও গোঁড়া ভক্তগণ শরীয়াতের যে মাসয়ালাটি বলে থাকেন সাহাবায়ে কিরাম (রা), তাবেয়ীগণ, মুহাদ্দিসগণ এবং মুফাসসিরগণের সে মাসয়ালাটি জানা না থাকার কারণে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁরা উল্লেখ করেছেন? আর যারা সূরা জুম'আ পড়েন এবং তার তাফসীর অধ্যয়ন করেন তাদের মন থেকে কি সত্যি সত্যিই সাহাবা কিরামের (রা) প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা উধাও হয়ে গেছে? এ সব প্রশ্নের জবাব যদি নেতিবাচক হয়, আর নেতিবাচক তো অবশ্যই হবে তাহলে সাহাবায়ে কিরামের (রা) মর্যাদার নামে কিছু লোক যেসব অনর্থক এবং বাড়াবাড়ি, অতিরঞ্জিত ও অতিশয়োক্তিমূলক কথাবার্তা বলে থাকেন তা অবশ্যই ভ্রান্ত।

প্রকৃতপক্ষে সাহাবায়ে কিরাম কোন আসমানী মাখলুক ছিলেন না। বরং এই পৃথিবীতে জন্মলাভকারী মানুষ ছিলেন। তারা যা কিছু হয়েছিলেন তা হয়েছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার গুণে। তাঁদের এ শিক্ষা দেয়া হয়েছিল ক্রমান্বয়ে বছরের পর বছর ধরে। কুরআন ও হাদীসে আমরা এ শিক্ষার যে নিয়ম-পদ্ধতি দেখতে পাই, তা হচ্ছে, যখনই তাদের মধ্যে কোন দুর্বলতা দেখা দিয়েছে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল যথাসময়ে সেদিকে মনোনিবেশ করেছেন এবং দুর্বলতার সেই বিশেষ ক্ষেত্রে অনতিবিলম্বে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানের একটি কর্মসূচী শুরু করা হয়েছে। জুম'আর নামাযের এই ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে, বাণিজ্য কাফেলা সংক্রান্ত ঘটনাটি ঘটলে আল্লাহ তা'আলা সূরা জুম'আর এ রুকূ'র আয়াতসমূহ নাযিল করে এ বিষয়ে সতর্ক করলেন এবং জুম'আর নামাযের নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়দা অবহিত করলেন। তাছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুম'আর অনেকগুলো খোতবায় লোকজনের মনে জুম'আ ফরয হওয়ার গুরুত্ব বদ্ধমূল করে দিলেন এবং বিস্তারিতভাবে তাদেরকে জুম'আর নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়দা শিক্ষা দিলেন। আমরা বিভিন্ন হাদীস থেকে এসব হিদায়াত ও নির্দেশনা স্পষ্টভাবে পেয়ে থাকি। আমরা এ বিষয়ে ১৫ নং টীকায় উল্লেখ করেছি। হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জুম'আর দিন প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য গোসল করা, দাঁত পরিষ্কার করা, যে উত্তম পোশাক তার আছে তা পরিধান করা এবং যদি সম্ভব হয় সুগন্ধি ব্যবহার করা। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী) হযরত সালমান ফারসী বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ যে মুসলমান জুম'আর দিনে গোসল করবে এবং সাধ্যমত নিজেকে বেশী করে পাক পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে, মাথায় তেল দেবে, ঘরে যে

খোশবুই থাক না কেন ব্যবহার করবে, তারপর মসজিদে যাবে এবং দুই জন মানুষকে সরিয়ে দিয়ে তাদের মাঝে বসবে না, তারপর আল্লাহর দেয়া সামর্থ অনুসারে নামায (নফল) পড়বে এবং ইমাম যখন খোতবা দিবেন তখন চুপ থাকবে, এক জুম'আ থেকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত তার কৃত অপরাধসমূহ মাফ হয়ে যায়। (বুখারী, মুসনাদে আহমাদ) হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা), হযরত আবু হুরাইরা (রা) এবং হযরত নুবাইশাতুল হুযালী (রা)–ও তাঁদের বর্ণনায় নবী (সা) থেকে প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছেন (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, তাবারানী)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ ইমাম যখন খোতবা দেন, তখন যে ব্যক্তি কথা বলে সে এমন গাধার মত যার পিঠে বই পুস্তকের বোঝা চাপানো আছে। আর যে ব্যক্তি তাকে বলে ঃ চুপ কর তারও কোন জুম'আ হয়নি (মুসনাদে আহমদ) হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ জুম'আর দিন খোতবার সময় যে ব্যক্তি কথা বলে তাকে যদি তোমরা বলো, "চুপ কর" তাহলে তোমরাও অর্থহীন কাজ করলে (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী, আবু দাউদ)। ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও তাবারানী হযরত আলী (রা) ও হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে প্রায় অনুরূপ কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে নবী (সা) খতীবদেরকেও দীর্ঘ খোতবা দিয়ে মানুষকে বিরক্ত ও অতিষ্ট না করতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি নিজে জুম'আর দিন সংক্ষিপ্ত খোতবা দিতেন এবং নামাযও খুব দীর্ঘ করে পড়াতেন না। হযরত জাবের (রা) ইবনে সামুরা বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) খোতবা দীর্ঘায়িত করতেন না। তাঁর খোতবা হতো কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথার সমষ্টি (আবু দাউদ)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোতবা নামাযের তুলনায় সংক্ষিপ্ত হতো এবং নামায খোতবার চেয়ে দীর্ঘ হতো (নাসায়ী)। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির নামায দীর্ঘ হওয়া এবং খোতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রমাণ করে সে দীনের ব্যাপারে জ্ঞানের অধিকারী (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম)। বায্যার আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) লোকজনকে কিভাবে জুম'আর নামাযের নিয়ম–কানুন ও আদব–কায়দা শিখাতেন এসব হাদীসের ভাষ্য থেকে তা অনুমান করা যায়। এভাবে এ নামাযের এমন একটি মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার নজীর পৃথিবীর কোন জাতির সামষ্টিক ইবাদাতে দেখা যায় না।

২০. সাহাবীদের যে ত্রুটি হয়েছিল তা কি ধরনের ত্রুটি ছিল এ আয়াতাংশ থেকে তা বুঝা যায় (নাউযুবিল্লাহ)। যদি ঈমানের দুর্বলতা ও জেনে শুনে আখেরাতের ওপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া এর কারণ হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ, শাসানি এবং তিরস্কারের ধরন হতো ভিন্ন। কিন্তু এ ধরনের কোন অপরাধ যেহেতু সেখানে হয়নি, বরং যা হয়েছিল তা প্রশিক্ষণের অভাবে হয়েছিল। তাই প্রথমে শিক্ষকসুলভ ভঙ্গিতে জুম'আর নিয়ম–কানুন ও আদব–কায়দা শেখানো হয়েছে। তারপর তাদের ত্রুটির কথা উল্লেখ করে মুরুব্বিয়ানাভঙ্গিতে বুঝানো হয়েছে যে, জুম'আর খোতবা শোনা এবং নামায পড়ার জন্য আল্লাহর নিকট থেকে তোমরা যা লাভ করবে তা এই দুনিয়ার ব্যবসায়–বাণিজ্য ও খেল তামাশার চেয়ে উত্তম।

২১. অর্থাৎ এ পৃথিবীতে রিযিকদানের পরোক্ষ মাধ্যম যে বা যাই হোক না কেন তাদের সবার চেয়ে উত্তম রিযিকদাতা হলেন আল্লাহ তা'আলা। কুরআন মজীদের বহু সংখ্যকস্থানে এ ধরনের কথা বলা হয়েছে। কোথাও আল্লাহ তা'আলাকে احسن الخالقين "সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা", কোথাও خير الغافرين "সর্বোত্তম ক্ষমাকারী", কোথাও خير الحاكمين "সর্বোত্তম বিচারক", خير الراحمين কোথাও "সর্বোত্তম দয়ালু" এবং কোথাও خير الناصرين "সর্বোত্তম সাহায্যকারী" বলা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সৃষ্টি বা মাখলুকের সাথে রিযিক দেয়া, সৃষ্টি করা, দয়া করা এবং সাহায্য করার যে সম্পর্ক তা রূপক বা পরোক্ষ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যারাই তোমাদেরকে বেতন, পারিশ্রমিক বা খাদ্য দিচ্ছে বলে দেখা যায়, যাদেরকেই তাদের শিল্প ও কারিগরী দক্ষতা দিয়ে কিছু তৈরী করতে দেখা যায় অথবা যাদেরকেই অন্যদের অপরাধ ক্ষমা করতে, দয়া করতে এবং সাহায্য করতে দেখা যায় আল্লাহ তাদের সবার চেয়ে বড় রিযিকদাতা, বড় সৃষ্টিকর্তা, বড় দয়ালু, বড় ক্ষমাকারী এবং বড় সাহায্যকারী।

আল মুনাফিকুন

৬৩

নামকরণ

প্রথম আয়াতের إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ অংশ থেকে এ সূরার নাম গ্রহণ করা হয়েছে। এটি এ সূরার নাম এবং এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কারণ এ সূরায় মুনাফিকদের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বনী মুসতালিক যুদ্ধাভিযান থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে অথবা মদীনায় পৌছার অব্যবহিত পরে এ সূরা নাযিল হয়েছিল। ৬ হিজরীর শা'বান মাসে বনী মুসতালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল একথা আমরা সূরা নূরের ভূমিকায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বর্ণনা করেছি। এভাবে এর নাযিল হওয়ার সময় সঠিকভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়ে আমরা পরে আরো আলোচনা করব।

ঐতিহাসিক পটভূমি

যে বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরা নাযিল হয়েছিল তা আলোচনার পূর্বে মদীনার মুনাফিকদের ইতিহাসের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। কারণ ঐ সময় যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তা আদৌ কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ছিল না। বরং তার পেছনে ছিল একটি পুরো ধারাবাহিক ঘটনা প্রবাহ যা পরিশেষে এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

পবিত্র মদীনা নগরীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে আওস ও খাযরাজ গোত্র দু'টি পারস্পরিক গৃহযুদ্ধে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে এক ব্যক্তির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নিতে প্রায় ঐকমত্যে পৌছেছিল। তারা যথারীতি তাকে বাদশাহ বানিয়ে তার অভিষেক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিও শুরু করেছিল। এমন কি তার জন্য রাজ মুকুটও তৈরী করা হয়েছিল। এ ব্যক্তি ছিল খাযরাজ গোত্রের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, খাযরাজ গোত্রে তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সর্বসম্মত এবং আওস ও খাযরাজ ইতিপূর্বে আর কখনো একযোগে এক ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে নেয়নি। (ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৪)

এই পরিস্থিতিতে ইসলামের বাণী মদীনায় পৌছে এবং এই দু'টি গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। হিজরাতের আগে আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন মদীনায় আগমনের জন্য আহবান

জানানো হচ্ছিল তখন হযরত আব্বাস ইবনে উবাদা ইবনে নাদলা (রা) আনসারী এ আহবান জানাতে শুধু এ কারণে দেরী করতে চাচ্ছিলেন যাতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও বইয়াত ও দাওয়াতে শামিল হয় এবং এভাবে মদীনা যেন সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু যে প্রতিনিধি দল বাইয়াতের জন্য হাজির হয়েছিল তারা এই যুক্তি ও কৌশলকে কোন গুরুত্বই দিলেন না এবং এতে অংশগ্রহণকারী দুই গোত্রের ৭৫ ব্যক্তি সব রকম বিপদ মাথা পেতে নিয়ে নবী (সা)–কে দাওয়াত দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। (ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৯) আমরা সূরা আনফালের ভূমিকায় এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছি।

এরপর নবী (সা) যখন মদীনায় পৌঁছলেন তখন আনসারদের ঘরে ঘরে ইসলাম এতটা প্রসার লাভ করেছিল যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নিরূপায় হয়ে পড়েছিল। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য তার নিজের জন্য ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তাই সে তার বহু সংখ্যক সহযোগী ও সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এদের মধ্যে ছিল উভয় গোত্রের প্রবীণ ও নেতৃ পর্যায়ের লোকেরা। অথচ তাদের সবার অন্তর জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের অন্তরজ্বালা ও দুঃখ ছিল অত্যন্ত তীব্র। কারণ সে মনে করতো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রাজত্ব ও বাদশাহী ছিনিয়ে নিয়েছেন। তার এই মুনাফেকীপূর্ণ ঈমান এবং নেতৃত্ব হারানোর দুঃখ কয়েক বছর ধরে বিচিত্র ভঙ্গিতে প্রকাশ পেতে থাকল। একদিকে তার অবস্থা ছিল এই যে, প্রতি জুম'আর দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খোতবা দেয়ার জন্য মিম্বারে উঠে বসতেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই উঠে বলতো, "ভাইসব, আল্লাহর রসূল আপনাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাঁর কারণে আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। তাই আপনারা সবাই তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা করুন, তিনি যা বলেন গভীর মনযোগ সহকারে তা শুনুন এবং তাঁর আনুগত্য করুন।" (ইবনে হিশাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১) অপরদিকে অবস্থা ছিল এই যে, প্রতিদিনই তার মুনাফেকীর মুখোশ খুলে পড়ছিল এবং সৎ ও নিষ্ঠবান মুসলমানদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল যে, সে ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা ইসলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা পোষণ করে।

একবার নবী (সা) কোন এক পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় পথে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাঁর সাথে অভদ্র আচরণ করে। তিনি হযরত সা'দ ইবনে উবাদাকে বিষয়টি জানালে সা'দ বললেন, "হে আল্লাহর রসূল, আপনি এ ব্যক্তির প্রতি একটু নম্রতা দেখান। আপনার আগমনের পূর্বে আমরা তার জন্য রাজমুকুট তৈরী করেছিলাম। এখন সে মনে করে, আপনি তার নিকট থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন।" (ইবনে হিশাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৭, ২৩৮)

বদর যুদ্ধের পর বনী কাইনুকা গোত্রের ইহুদীরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও অকারণে বিদ্রোহ করলে রসূলুল্লাহ (সা) তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তখন এই ব্যক্তি তাদের সমর্থনে কোমর বেঁধে কাজ শুরু করে। সে নবীর (সা) বর্ম ধরে বলতে লাগলো, এই গোত্রটির সাতশত বীরপুরুষ যোদ্ধা শত্রুর মোকাবেলায় সবসময় আমাকে সাহায্য করেছে, আজ একদিনেই আপনি তাদের হত্যা করতে চাচ্ছেন? আল্লাহর শপথ, আপনি যতক্ষণ

আমার এই মিত্রদের ক্ষমা না করবেন আমি ততক্ষণ আপনাকে ছাড়বো না। (ইবনে হিশাম, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১—৫২)

উহুদ যুদ্ধের সময় এই ব্যক্তি খোলাখুলি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে তার তিনশত সঙ্গী–সাথীকে নিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসেছে। কি সাংঘাতিক নাযুক মুহূর্তে সে এই আচরণ করেছে তা এই একটি বিষয় থেকেই অনুমান করা যায় যে, কুরাইশরা তিন হাজার লোকের একটি বাহিনী নিয়ে মদীনার ওপরে চড়াও হয়েছিল আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র এক হাজার লোক নিয়ে তাদের মোকাবিলা ও প্রতিরোধের জন্য বেরিয়েছিলেন। এক হাজার লোকের মধ্যে থেকেও এই মুনাফিক তিনশত লোককে আলাদা করে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল এবং নবী (সা)–কে শুধু সাতশত লোকের একটি বাহিনী নিয়ে তিন হাজার শত্রুর মোকাবিলা করতে হলো।

এ ঘটনার পর মদীনার সব মুসলমান নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলো যে, এ লোকটি কট্টর মুনাফিক। তার যেসব সংগীসাথী এই মুনাফিকীতে তার সাথে শরীক ছিল তাদেরকেও তারা চিনে নিল। এ কারণে উহুদ যুদ্ধের পর প্রথম জুম'আর দিনে নবীর (সা) খোতবা দেয়ার পূর্বে এ ব্যক্তি যখন বক্তৃতা করতে দাঁড়ালো তখন লোকজন তার জামা টেনে ধরে বলল ঃ "তুমি বসো, তুমি একথা বলার উপযুক্ত নও।" মদীনাতে এই প্রথমবারের মত প্রকাশ্যে এ ব্যক্তিকে অপমানিত করা হলো। এতে সে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হলো এবং মানুষের ঘাড় ও মাথার ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেল। মসজিদের দরজার কাছে কিছু সংখ্যক আনসার তাকে বললেন, "তুমি একি আচরণ করছো? ফিরে চলো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করো।" এতে সে ক্রোধে ফেটে পড়লো এবং বললো! "তাকে দিয়ে আমি কোন প্রকার ক্ষমা প্রার্থনা করাতে চাই না।" (ইবনে হিশাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১)।

হিজরী ৪ সনে বনু নাযীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই সময় এই ব্যক্তি ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা আরো খোলাখুলিভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে ইসলামের শত্রুদের সাহায্য সহযোগিতা দান করে। একদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর জান কবুল সাহাবীগণ এসব ইহুদী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। অপরদিকে এই মুনাফিকরা গোপনে গোপনে ইহুদীদের কাছে খবর পাঠাচ্ছিল যে, তোমরা রুখে দাঁড়াও। আমরা তোমাদের সাথে আছি। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করা হলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাব। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই গোপন গাঁটছড়া বাঁধার বিষয়টি প্রকাশ করে দিলেন। সূরা হাশরের দ্বিতীয় রুকূ'তে এ বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু তার ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের মুখোশ খুলে পড়ার পরও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কার্যকলাপ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। কারণ মুনাফিকদের একটি বড় দল তার সহযোগী ছিল। আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের বহু সংখ্যক নেতা তার সাহায্যকারী ছিল। কম করে হলেও মদীনার গোটা জনবসতির এক তৃতীয়াংশ ছিল তার সাঙ্গপাঙ্গ। উহুদ যুদ্ধের সময় এ বিষয়টিই প্রকাশ পেয়েছিল। এই

পরিস্থিতিতে বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ শত্রুর সাথেও যুদ্ধের ঝুঁকি নেয়া কোন অবস্থায়ই সমীচীন ছিল না। এ কারণে তাদের মুনাফিকী সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও নবী (সা) দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাহ্যিকভাবে ঈমানের দাবী অনুসারেই তাদের সাথে আচরণ করেছেন। অপরদিকে এসব লোকেরও এতটা শক্তি ও সাহস ছিল না যে, তারা প্রকাশ্যে কাফের হয়ে ঈমানদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করত অথবা খোলাখুলি কোন হামলাকারী শত্রুর সাথে মিলিত হয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হতো। বাহ্যত তারা নিজেদের একটা মজবুত গোষ্ঠী তৈরী করে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে বহু দুর্বলতা ছিল। সূরা হাশরের ১২ থেকে ১৪ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে সেইসব দুর্বলতার কথাই তুলে ধরেছেন। তাই তারা মনে করতো, মুসলমান সেজে থাকার মধ্যেই তাদের কল্যাণ নিহিত। তারা মসজিদে আসত, নামায পড়তো এবং যাকাতও দিতো। তাছাড়া মুখে ঈমানের লম্বা চওড়া দাবী করতো, সত্যিকার মুসলমানের যা করার আদৌ কোন প্রয়োজন পড়তো না। নিজেদের প্রতিটি মুনাফিকী আচরণের পক্ষে হাজারটা মিথ্যা যুক্তি তাদের কাছে ছিল। এসব কাজ দ্বারা তারা নিজেদের স্বগোত্রীয় আনসারদেরকে এই মর্মে মিথ্যা আশ্বাস দিত যে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি। আনসারদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তাদের অনেক ক্ষতি হতো। এসব কৌশল অবলম্বন করে তারা সেসব ক্ষতি থেকে নিজেদের রক্ষা করছিল। তাছাড়া তাদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থেকে মুসলমানদের ভেতরে কলহ কোন্দল ও ফাসাদ সৃষ্টির এমন সব সুযোগও তারা কাজে লাগাচ্ছিল যা অন্য কোন জায়গায় থেকে লাভ করতে পারত না।

এসব কারণে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বনী মুসতালিক যুদ্ধাভিযানে শরীক হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিল এবং এই সুযোগে একই সাথে এমন দু'টি মহাফিতনা সৃষ্টি করেছিল যা মুসলমানদের সংহতি ও ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারত। কিন্তু পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সাহচর্য থেকে ঈমানদারগণ যে সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন তার কল্যাণে যথা সময়ে এ ফিতনার মূল্যোৎপাটন হয়ে যায় এবং এসব মুনাফিক নিজেরাই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। এ দু'টি ফিতনার মধ্যে একটির উল্লেখ করা হয়েছে সূরা নূরে। আর অপর ফিতনাটির উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য এই সূরাটিতে।

বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, নাসায়ী, তিরমিযী, বায়হাকী, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, আবদুর রায্যাক, ইবনে জারীর, তাবারী, ইবনে সা'দ এবং মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বহু সংখ্যক সনদসূত্রে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। যে অভিযানের সময় এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল কিছু সংখ্যক রেওয়ায়াতে তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। আবার কোন কোন রেওয়ায়াতে তাবুক যুদ্ধের সময়কার ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মাগাযী (যুদ্ধ বিষয়ক ইতিহাস) ও সীরাত (নবী জীবন) বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে একমত যে, এ ঘটনা বনী মুসতালিক যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়াত একত্রিত করলে ঘটনার যে বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় তা হচ্ছে ঃ

বনী মুসতালিক গোত্রকে পরাস্ত করার পর ইসলামী সেনাবাহিনী তখনও মুরাইসী নামক কূপের আশেপাশের জনবসতিতে অবস্থান করছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ পানি নিয়ে দুই

ব্যক্তির মধ্যে বচসা হয়। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল জাহ্‌জাহ্‌ ইবনে মাসউদ গিফারী। তিনি ছিলেন হযরত উমরের (রা) কর্মচারী। তিনি তাঁর ঘোড়ার দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করতেন। অন্যজন ছিলেন সিনান ইবনে ওয়াবার আল জুহানী।[১] তাঁর গোত্র খাযরাজ গোত্রের মিত্র ছিল। মৌখিক বাদানুবাদ শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিতে পরিণত হয় এবং জাহ্‌জাহ্‌ সিনানকে একটি লাথি মারে। প্রাচীন ইয়ামনী ঐতিহ্য অনুসারে আনসারগণ এ ধরনের আচরণকে অত্যন্ত অপমানজনক ও লাঞ্ছনাকর মনে করতেন। এতে সিনান সাহায্যের জন্য আনসারদেরকে আহবান জানায় এবং জাহ্‌জাহও মুহাজিরদের আহবান জানায়। এই ঝগড়ার খবর শোনামাত্র আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের উত্তেজিত করতে শুরু করে। সে চিৎকার করে বলতে থাকে দ্রুত এসো, নিজের মিত্রদের সাহায্য করো। অপরদিক থেকে কিছু সংখ্যক মুজাহিরও এগিয়ে আসেন। বিষয়টি আরো অনেক দূর পর্যন্ত গড়াতে পারতো। ফলে আনসার ও মুহাজিরগণ সম্মিলিতভাবে সবেমাত্র যে স্থানটিতে এক দুশমন গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের পরাজিত করেছিলেন এবং তখনও তাদের এলাকাতেই অবস্থান করছিলেন সে স্থানটিতেই পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু শোরগোল শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

ما بال دعوى الجاهلية ؟ مالكم ولدعوة الجاهلية ؟ دعوها فانها منتنة –

"কি ব্যাপার! জাহেলিয়াতের আহবান শুনতে পাচ্ছি কেন? জাহেলিয়াতের আহবানের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? এসব ছেড়ে দাও, এগুলো দুর্গন্ধময় নোংরা জিনিস।[২] এতে উভয়পক্ষের সৎ ও নেক্কার লোকজন অগ্রসর হয়ে ব্যাপারটি মিটমাট করে দিলেন এবং সিনান জাহ্‌জাহকে মাফ করে আপোষ করে নিলেন।

১. বিভিন্ন রেওয়ায়াতে উভয়ের বিভিন্ন নাম বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা ইবনে হিশামের বর্ণনা থেকে এ নাম গ্রহণ করেছি।

২. এই সময় নবীর (সা) বলা একথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের সঠিক মর্মবাণীকে বুঝতে হলে একথাটি যথাযথভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন। ইসলামের নীতি হচ্ছে, দুই ব্যক্তি যদি তাদের বিবাদের ব্যাপারে সাহায্যের জন্য মানুষকে আহবান জানাতে চায় তাহলে সে বলবে, মুসলমান ভাইয়েরা, এগিয়ে এসো, আমাদের সাহায্য করো। অথবা বলবে, হে লোকেরা, আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আস। কিন্তু তাদের প্রত্যেকে যদি নিজ গোত্র, স্বজন, বংশ ও বর্ণ অথবা অঞ্চলের নাম নিয়ে আহবান জানায় তাহলে তা জাহেলিয়াতের আহবান হয়ে দাঁড়ায়। এ আহবানে সাড়া দিয়ে আগমনকারী যদি কে অত্যাচারী আর কে অত্যাচারিত তা না দেখে এবং হক ও ইনসাফের ভিত্তিতে অত্যাচারিতকে সাহায্য করার পরিবর্তে নিজ নিজ গোষ্ঠীর লোককে সাহায্য করার জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তাহলে তা একটি জাহেলিয়াতপূর্ণ কাজ। এ ধরনের কাজ দ্বারা দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে নোংরা ও ঘৃণিত জিনিস বলে আখ্যায়িত করে মুসলমানদের বলেছেন যে, এরূপ জাহেলিয়াতের আহবানের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? তোমরা ইসলামের ভিত্তিতে একটি জাতি হয়েছিলে। এখন আনসার ও মুজাহিরদের নাম দিয়ে তোমাদের কি করে আহবান জানানো হচ্ছে, আর সেই আহবান শুনে তোমরা কোথায় ছুটে যাচ্ছ? আল্লামা সুহাইলী

কিন্তু যাদের অন্তরে মুনাফিকী ছিল তারা সবাই এরপর আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাছে সমবেত হয়ে তাকে বললো ঃ "এতদিন আমরা তোমার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তুমি প্রতিরোধও করে আসছিলে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তুমি আমাদের বিরুদ্ধে এসব কাঙাল ও নিস্বদের[১] সাহায্যকারী হয়ে গিয়েছো।" আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আগে থেকেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। একথা শুনে সে আরো জ্বলে উঠল। সে বলতে শুরু করল ঃ এসব তোমাদের নিজেদেরই কাজের ফল। তোমরা এসব লোককে নিজের দেশে আশ্রয় দিয়েছো, নিজেদের অর্থ–সম্পদ তাদের বন্টন করে দিয়েছো। এখন তারা ফুলেফেঁপে উঠেছে এবং আমাদেরই প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এবং কুরাইশদের এই কাঙালদের বা মুহাম্মাদের (সা) (সঙ্গীসাথীদের) অবস্থা বুঝাতে একটি উপমা হুবহু প্রযোজ্য। উপমাটি হলো, তুমি নিজের কুকুরকে খাইয়েদাইয়ে মোটা তাজা করো, যাতে তা একদিন তোমাকেই ছিঁড়ে ফেড়ে খেতে পারে। তোমরা যদি তাদের থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নাও তাহলে তারা কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আল্লাহর শপথ, মদীনা ফিরে গিয়ে আমাদের মধ্যে যারা মর্যাদাবান লোক তারা হীন ও লাঞ্ছিত লোকদের বের করে দেবে।"

এ বৈঠকে ঘটনাক্রমে হযরত যায়েদ ইবনে আরকামও উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি একজন কম বয়স্ক বালক ছিলেন। এসব কথা শোনার পর তিনি তাঁর চাচার কাছে তা বলে দেন। তাঁর চাচা ছিলেন আনসারদের একজন নেতা। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে সব বলে দেন। নবী (সা) যায়েদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি যা শুনেছিলেন তা আদ্যপান্ত খুলে বললেন।[২] নবী (সা) বললেন ঃ তুমি বোধ হয় ইবনে উবাইয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট। সম্ভবত তোমার শুনতে ভুল হয়েছে। ইবনে উবাই একথা বলছে বলে হয়তো তোমার সন্দেহ হয়েছে। কিন্তু যায়েদ বললেন, হে আল্লাহর রসূল, তা নয়। আল্লাহর শপথ আমি নিজে তাকে এসব কথা বলতে শুনেছি। অতপর নবী (সা) ইবনে উবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে সরাসরি অস্বীকার করলো। সে বারবারের

"রাওদুল উনুফ" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ কোন ঝগড়া–বিবাদ বা মতানৈক্যের ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতপূর্ণ আহবান জানানোকে ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণ রীতিমত ফৌজদারী অপরাধ বলে চিহ্নিত করেছেন। একদল আইনবিদের মতে এর শাস্তি পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত এবং আরেক দলের মতে দশটি। তৃতীয় আরেক দলের মতে, তাকে অবস্থার আলোকে শাস্তি দেয়া দরকার। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু তিরস্কার ও শাসানিই যথেষ্ট। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের আহবান উচ্চারণকারীকে বন্দী করা উচিত। সে যদি বেশী দুষ্কর্মশীল হয় তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে।

১. যারা ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় চলে আসছিল মদীনার মুনাফিকরা তাদের সবাইকে 'جلابيب' বলে আখ্যায়িত করতো। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কম্বল বা মোটা বস্ত্র পরিধানকারী। কিন্তু গরীব মুহাজিরদেরকে হেয় ও অবজ্ঞা করার জন্যই তারা এ শব্দটি ব্যবহার করতো। যে অর্থ বুঝাতে তারা শব্দটি বলত 'কাঙাল' শব্দ দ্বারা তা অধিকতর বিশুদ্ধভাবে ব্যক্ত হয়।

২. এ ঘটনা থেকে ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, ধর্মীয়, নৈতিক ও জাতীয় স্বার্থের খাতিরে কেউ যদি কারো ক্ষতিকর কথা অন্য কারো কাছে বলে তা হলে চোখলখুরীর পর্যায়ে পড়ে না। ফিতনা–ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে যে চোখলখুরী করা হয় সেই চোখলখুরীকে ইসলামী শরীয়াত হারাম ঘোষণা করেছে।

শপথ করে বলতে লাগলো, আমি একথা কখনো বলি নাই। আনসারদের লোকজনও বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী, এতো একজন ছেলে মানুষের কথা, হয়তো তার ভুল হয়েছে। তিনি আমাদের নেতা ও সম্মানিত ব্যক্তি। তার কথার চেয়ে একজন বালকের কথার প্রতি বেশী আস্থাশীল হবেন না। বিভিন্ন গোত্রের প্রবীণ ও বৃদ্ধ ব্যক্তিরাও যায়েদকে তিরস্কার করলো। বেচারা যায়েদ এতে দুঃখিত ও মনঃক্ষুণ্ন হয়ে নিজের জায়গায় চুপচাপ বসে থাকলেন। কিন্তু নবী (সা) যায়েদ ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই উভয়কেই জানতেন। তাই প্রকৃত ব্যাপার কি তা তিনি ঠিকই উপলব্ধি করতে পারলেন।

হযরত 'উমর এ বিষয়টি জানতে পেরে নবীর (সা) কাছে এসে বললেন ঃ "আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। অথবা এরূপ অনুমতি দেয়া যদি সমীচীন মনে না করেন তাহলে আনসারদের নিজেদের মধ্যে থেকে মুআয ইবনে জাবাল অথবা আববাদ ইবনে বিশর, অথবা সা'দ ইবনে মু'আয, অথবা মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে নির্দেশ দিন[১] সে তাকে হত্যা করুক।" কিন্তু নবী (সা) বললেন ঃ "এ কাজ করো না। লোকে বলবে, মুহাম্মাদ (সা) নিজের সংগী–সাথীদেরকেই হত্যা করছে।" এরপর নবী (সা) তৎক্ষণাৎ যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিয়ে দিলেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বাভাবিক রীতি ও অভ্যাস অনুসারে তা যাত্রার সময় ছিল না। ক্রমাগত ৩০ ঘন্টা পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত থাকলো। এমন কি লোকজন ক্লান্তিতে নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে পড়লো। তখন তিনি একস্থানে তাঁবু করে অবস্থান করলেন। ক্লান্ত শ্রান্ত লোকজন মাটিতে পিঠ ঠেকানো মাত্র সবাই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এ কাজ তিনি এ জন্য করলেন যাতে, মুরাইসী কূপের পাশে যে ঘটনা ঘটেছিল মানুষের মন–মগজ থেকে তা মুছে যায়। পথিমধ্যে আনসারদের একজন নেতা হযরত উসাইদ ইবনে হুদায়ের তাঁর কাছে গিয়ে বললেন ঃ "হে আল্লাহর রসূল, আজ আপনি এমন সময় যাত্রার নির্দেশ দিয়েছেন যা সফরের জন্য উপযুক্ত নয়। আপনি তো এ রকম সময়ে কখনো সফর শুরু করতেন না?" নবী (সা) বললেন ঃ তোমাদের সেই লোকটি কি কথা প্রচার করেছে তাকি তুমি শোন নাই? তিনি জিজ্ঞেস করলেন কোন লোকটি? তিনি বললেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। উসাইদ জিজ্ঞেস করলেন ঃ সে কি বলেছে? তিনি বললেন ঃ "সে বলেছে, মদীনায় পৌঁছার পর সম্মানী লোকেরা হীন ও নীচ লোকদের বহিষ্কার করবে। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল। সম্মানিত ও মর্যাদাবান তো আপনি। আর হীন ও নীচ তো সে নিজে। আপনি যখন ইচ্ছা তাকে বহিষ্কার করতে পারেন।"

কথাটা আস্তে আস্তে আনসারদের সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এবং ইবনে উবাইয়ের বিরুদ্ধে তাদের মনে ভীষণ ক্রোধের সৃষ্টি হলো। লোকজন ইবনে উবাইকে বললো, তুমি গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ক্ষমা চাও। কিন্তু সে ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিল ঃ তোমরা বললে তার প্রতি ঈমান আন। আমি ঈমান আনলাম। তোমরা বললে, অর্থ–সম্পদের যাকাত দাও। আমি যাকাতও দিয়ে দিলাম। এখন তো শুধু মুহাম্মাদকে

১ বিভিন্ন রেওয়ায়াতে আনসারদের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নাম উল্লেখিত হয়েছে। হযরত উমর (রা) নবীর (সা) কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন "আমি মুহাজির হওয়ার কারণে আমার হাতে সে নিহত হলে ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকলে এসব লোকদের মধ্য থেকে কোন একজনকে দিয়ে এ কাজ করিয়ে নিন।"

আমার সিজদা করা বাকী আছে। এসব কথা শুনে তার প্রতি ঈমানদার আনসারদের অসন্তুষ্টি আরো বৃদ্ধি পেল এবং চারদিক থেকে তার প্রতি ধিক্কার ও তিরস্কার বর্ষিত হতে থাকলো। যে সময় এ কাফেলা মদীনায় প্রবেশ করছিল তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্র (তার নামও) আবদুল্লাহ খোলা তরবারি হাতে পিতার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ "আপনিই তো বলেছেন, মদীনায় ফিরে গিয়ে সম্মানিত ব্যক্তিরা হীন ও নীচ লোকদের সেখান থেকে বহিষ্কার করবে। এখন আপনি জানতে পারবেন সম্মান আপনার, না আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের। আল্লাহর কসম। যতক্ষণ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি না দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেন না।" এতে ইবনে উবাই চিৎকার করে বলে উঠল "হে খাযরাজ গোত্রের লোকজন, দেখো, আমার নিজের ছেলেই আমাকে মদীনায় প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে।" লোকজন গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ খবর দিলে তিনি বললেন ঃ "আব্দুল্লাহকে গিয়ে বলো, তার পিতাকে যেন নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করতে দেয়।" তখন আবদুল্লাহ বললেন ঃ "নবী (সা) অনুমতি দিয়েছেন তাই এখন আপনি প্রবেশ করতে পারেন।" এই সময় নবী (সা) হযরত উমরকে (রা) বললেন ঃ "হে উমর, এখন তোমার মতামত কি? যে সময় তুমি বলেছিলে, আমাকে তাকে হত্যা করার অনুমতি দিন, সে সময় তুমি যদি তাকে হত্যা করতে তাহলে অনেকেই নাক সিটকাতো এবং নানা রকম কথা বলতো। কিন্তু আজ যদি আমি তার হত্যার আদেশ দেই তাহলে তাকে হত্যা পর্যন্ত করা যেতে পারে।" হযরত উমর বললেন ঃ "আল্লহর শপথ, এখন আমি বুঝতে পেরেছি আল্লাহর রসূলের কথা আমার কথার চেয়ে অধিক যুক্তিসঙ্গত ছিল।"[১] এই পরিস্থিতি ও পটভূমিতে অভিযান শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় পৌছার পর এ সূরাটি নাযিল হয়।

১. এ থেকে শরীয়াতের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানা যায়। এক, ইবনে উবাই যে কর্মনীতি গ্রহণ করেছিল এবং যে ধরনের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল মুসলিম মিল্লাতের অন্তরভুক্ত থেকে কেউ যদি এ ধরনে আচরণ করে তাহলে সে হত্যাযোগ্য অপরাধী। দুই, শুধু আইনের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি হত্যার উপযুক্ত হলেই যে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে তা জরুরী নয়। এরূপ কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে দেখতে হবে, তাকে হত্যা করার ফলে কোন বড় ধরনের ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে কিনা। পরিবেশ–পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে অন্ধভাবে আইনের প্রয়োগ কোন কোন সময় আইন প্রয়োগের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ফলাফল নিয়ে আসে। যদি একজন মুনাফিক ও ফিতনাবাজের পেছনে কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক শক্তি থাকে তাহলে তাকে শাস্তি দিয়ে আরো বেশী ফিতনাকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ দেয়ার চেয়ে উত্তম হচ্ছে, যে রাজনৈতিক শক্তির জোরে সে দুষ্কর্ম করছে কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তার মূল্যোৎপাটন করা। এই সুদূর প্রসারী লক্ষেই নবী (সা) তখনো আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে শাস্তি দেননি যখন তিনি তাকে শাস্তি দিতে সক্ষম ছিলেন। বরং তার সাথে সবসময় নম্র আচরণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত দুই তিন বছরের মধ্যেই মদীনায় মুনাফিকদের শক্তি চিরদিনের জন্য নির্মূল হয়ে গেল।

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ① اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ② ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ③

হে নবী, এ মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ জানেন, তুমি অবশ্যই তাঁর রসূল। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।[১] তারা নিজেদের শপথসমূহকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে।[২] এভাবে তারা নিজেরা আল্লাহর পথ থেকে বিরত থাকছে এবং অন্যদেরও বিরত রাখছে।[৩] এরা যা করছে তা কত মন্দ কাজ! এ সবের কারণ এই যে, তারা ঈমান আনার পর আবার কুফরী করেছে। তাই তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। এখন তারা কিছুই বুঝে না।[৪]

১. অর্থাৎ যে কথা তারা মুখে বলছে তা আসলে সত্য। কিন্তু তারা মুখে যা প্রকাশ করছে নিজেরা যেহেতু তা বিশ্বাস করে না, তাই তাঁর রসূল হওয়ার যে সাক্ষ্য তারা দেয় সে ব্যাপারে তারা মিথ্যাবাদী। এখানে একথাটি ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, দু'টি জিনিসের সমন্বয়ের নাম সাক্ষ। এক, যে মূল বিষয়টির সাক্ষ দেয়া হয় সেটি। দুই, সেই বিষয়টি সম্পর্কে সাক্ষদানকারীর বিশ্বাস। এখন বিষয়টি যদি আসলে সত্য হয় এবং সাক্ষ দানকারী মুখে যা বলছে তার বিশ্বাসও যদি তাই হয়, তাহলে সে সবদিক দিয়েই সত্যবাদী হবে। আর বিষয়টা যদি মিথ্যা হয়, কিন্তু সাক্ষদাতা সেটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে তাহলে একদিক দিয়ে আমরা তাকে সত্যবাদী বলবো। কেননা, সে তার বিশ্বাসকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সত্যবাদী। কিন্তু আরেক দিক দিয়ে তাকে মিথ্যাবাদী বলব। কেননা, সে যে বিষয়ের সাক্ষ দিচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে ভুল। অপরদিকে বিষয়টি যদি সত্য হয় কিন্তু সাক্ষদাতার বিশ্বাস তার পরিপন্থী হয় তাহলে সঠিক বিষয়টির সাক্ষ দেয়ার কারণে আমরা তাকে সত্যবাদী বলব। কিন্তু সে মুখে যা প্রকাশ করছে তার বিশ্বাস তা না হওয়ার কারণে

আমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলব। যেমন কোন ঈমানদার ব্যক্তি যদি ইসলামকে সত্য বলে তাহলে সে সবদিক দিয়ে সত্যবাদী। কিন্তু একজন ইহুদী যদি ইহুদী ধর্মের ওপর বিশ্বাসী থেকে ইসলামকে সত্য বলে তাহলে তার কথা সত্য কিন্তু তার সাক্ষ মিথ্যা বলে গণ্য করা হবে। কেননা, সে তার বিশ্বাসের পরিপন্থী সাক্ষ দিচ্ছে। আর সে যদি ইসলামকে বাতিল বা মিথ্যা বলে তাহলে আমরা তার একথাকে মিথ্যা বলবো। কিন্তু সে যে সাক্ষ দিচ্ছে তা তার নিজের বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

২. অর্থাৎ নিজেরা মুসলমান ও ঈমানদার এ কথা বিশ্বাস করানোর জন্য তারা যেসব শপথ করে সেগুলোকে তারা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যাতে মুসলমানদের ক্রোধ থেকে রক্ষা পায় এবং প্রকাশ্য শত্রুর সাথে মুসলমানগণ যে আচরণ করে থাকে তাদের সাথে তা করতে না পারে।

এসব শপথ দ্বারা ঐ সব শপথও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে যা সাধারণত তারা নিজেদের ঈমানের বিষয়টি বিশ্বাস করানোর জন্য করতো। তাদের মুনাফিকী আচরণ ধরা পড়ার পর যেসব শপথ করে তারা মুসলমানদের বুঝাতে চাইতো যে, তা তারা মুনাফিকীর কারণে করেনি সেসব শপথও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। আবার যায়েদ ইবনে আরকামের দেয়া খবর মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যে শপথ করেছিল তাও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। এসব সম্ভাবনার সাথে আরো একটি সম্ভাবনা আছে। তা হলো, "আমরা সাক্ষ দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রসূল" তাদের এ কথাটিকে আল্লাহ তা'আলা শপথ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই সম্ভাবনার ভিত্তিতে ফিকাহবিদদের মধ্যে একটি বিষয়ে বিতর্কের সূত্রপাত্র হয়েছে। বিষয়টি হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যদি "আমি সাক্ষ দিচ্ছি" বলে কোন কথা বর্ণনা করে তাহলে তা শপথ বা হলফ (Oath) বলে বিবেচিত হবে কিনা। ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর সঙ্গীগণ (ইমাম যুফার ছাড়া) এবং ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম আওযায়ী একে শপথ (শরীয়াতের পরিভাষা ইয়ামীন) বলে মনে করেন। ইমাম যুফার বলেন ঃ এটা শপথ নয়। ইমাম মালেক থেকে দু'টি মত বর্ণিত হয়েছে, একটি হচ্ছে, এটা নিছক শপথ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, "সাক্ষ দিচ্ছি" বলার সময় সে যদি এরূপ নিয়ত করে যে, "আল্লাহর শপথ আমি সাক্ষ দিচ্ছি" অথবা "আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি" তাহলে সে ক্ষেত্রে এটা শপথমূলক বর্ণনা হবে। অন্যথায় হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বক্তব্য পেশকারী ব্যক্তি যদি এ কথাও বলে যে, "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে সাক্ষ দিচ্ছি" তবুও তা তার শপথমূলক বক্তব্য বলে গণ্য হবে না। কিন্তু সে যদি এরূপ কথা শপথের নিয়তেই বলে থাকে তাহলে তা শপথ বলে গণ্য হবে। (আহকামুল কুরআন—জাস্সাস, আহকামুল কুরআন—ইবনুল আরাবী)।

৩. আরবী ভাষায় صد শব্দটি সকর্মক এবং অকর্মক এই উভয় প্রকার ক্রিয়া হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। এ কারণে صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ আয়াতাংশের অর্থ "তারা নিজেরা আল্লাহর পথ থেকে বিরত থাকে" যেমন হয়, তেমনি "তারা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে"ও হয়। তাই অনুবাদে আমরা দু'টি অর্থই উল্লেখ করেছি। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে আয়াতাংশের অর্থ হবে এসব শপথের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করে নেয়ার পর ঈমানের দাবী পূরণ না করার এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য থেকে পাশ কাটিয়ে চলার ব্যাপারে সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়।

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ④

তুমি যখন এদের প্রতি তাকিয়ে দেখ, তখন তাদের দেহাবয়ব তোমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়। আর যখন কথা বলে তখন তাদের কথা তোমার শুনতেই ইচ্ছা করে।[৫] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা দেয়ালের গায়ে খাড়া করে রাখা কাঠের গুড়ির মত।[৬] যে কোন জোরদার আওয়াজকে এরা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে।[৭] এরাই কট্টর দুশমন।[৮] এদের ব্যাপারে সাবধান থাক।[৯] এদের ওপর আল্লাহর গযব।[১০] এদেরকে উল্টো কোন্‌দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?[১১]

দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে আয়াতাংশের অর্থ হবে, এসব মিথ্যা শপথের আড়ালে তারা শিকারের সন্ধানে থাকে, মুসলমান সেজে থেকে ভিতর থেকেই মুসলমানদের জামায়াতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে। মুসলমানদের গোপনীয় বিষয়সমূহ জেনে নিয়ে তা শত্রুদের জানিয়ে দেয়, ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের মধ্যে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করতে এবং সহজ সরল মুসলমানদের মনে সন্দেহ–সংশয় ও দ্বিধা–দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে তারা এমন সব কৌশল অবলম্বন করে যা কেবল মুসলমান সেজে থাকা একজন মুনাফিকের পক্ষেই সম্ভব। ইসলামের প্রকাশ্য শত্রুরা ঐ সব কৌশল কাজে লাগাতে পারে না।

৪. এ আয়াতে ঈমান আনার অর্থ বুঝানো হয়েছে ঈমানের স্বীকৃতি দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে শামিল হওয়াকে আর কুফরের অর্থ বুঝানো হয়েছে আন্তরিকভাবে ঈমান না আনা এবং মৌখিকভাবে ঈমান আনার পূর্বে যে কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকাকে। কথাটির প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, তারা যখন খুব ভালভাবে বুঝে শুনে সোজাসুজি ঈমানের পথ অবলম্বন অথবা পরিষ্কারভাবে কুফরের পথ গ্রহণের পরিবর্তে মুনাফিকীর এই নীতি ও পন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের অন্তরের ওপর মোহর মেরে দেয়া হলো এবং একজন সত্যবাদী, নিষ্কলুষ, সৎ ও ভদ্র মানুষের মত নীতি ও পন্থা অবলম্বন করার সামর্থ ও শুভবুদ্ধিই আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে ছিনিয়ে নিলেন। এখন তাদের জ্ঞান ও উপলব্ধির যোগ্যতাই হারিয়ে গিয়েছে এবং নৈতিক অনুভূতির মৃত্যু ঘটেছে। রাতদিনের এই মিথ্যা, প্রতি মুহূর্তের এই প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি এবং কথা ও কাজের এই স্থায়ী বৈপরীত্য—যার মধ্যে তারা নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলেছে—তা যে কত হীন ও লাঞ্ছনাকর অবস্থা, সে উপলব্ধিটুকু পর্যন্ত এখন তাদের আসে না।

আল্লাহর পক্ষ থেকে কারো অন্তরে মোহর মেরে দেয়ার অর্থ কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি তার একটি। এসব মুনাফিকের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা মোহর মেরে দেয়ার কারণে ঈমান তাদের অন্তরে

প্রবেশ করতে পারেনি এবং তারা বাধ্য হয়ে মুনাফিক রয়ে গিয়েছে—ব্যাপারটি তা নয়। বরং বাহ্যিকভাবে ঈমান প্রকাশ করা সত্ত্বেও যখন তারা কুফরির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। এ সময়ই তাদের থেকে নির্ভেজাল ঈমান ও তা থেকে জন্মলাভকারী নৈতিক আচরণ করার সামর্থ ও শুভবুদ্ধি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তারা নিজেদের জন্য যে মুনাফিকী ও মুনাফিকী চরিত্র পছন্দ করেছিল তার সামর্থ ও বুদ্ধিই তাদের দান করা হয়েছে।

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অত্যন্ত সুঠাম দেহী, সুস্থ, সুদর্শন ও বাকপটু ব্যক্তি ছিল। তার সাঙ্গপাঙ্গদের অনেকেও তাই ছিল। এরা সবাই ছিল মদীনার নেতৃস্থানীয় লোক। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে যখন আসতো তখন দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসতো এবং রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা বলতো। তাদের দেহাবয়ব ও চেহারা-আকৃতি দেখে আর কথাবার্তা শুনে কেউ কল্পনাও করতে পারতো না যে, সমাজের এসব সম্মানিত লোকেরা চরিত্রের দিক দিয়ে এত নীচ ও জঘন্য হতে পারে।

৬. অর্থাৎ এরা যারা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে তারা মানুষ নয়, বরং কাঠের গুড়ি। তাদেরকে কাষ্ঠখণ্ডের সাথে তুলনা করে বুঝানো হয়েছে যে, নৈতিক চরিত্র মানুষের মূল প্রাণসত্তা, সেই প্রাণসত্তাই তাদের মধ্যে নেই। তারপর তাদেরকে দেয়ালগাত্রে হেলান দিয়ে খাড়া করা কাষ্ঠখণ্ডের সাথে তুলনা করে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, তা একেবারেই অকেজো, অপদার্থ। কেননা, কাঠ কেবল তখনই উপকারে আসে যদি তা ছাদে অথবা দরজায় বা আসবাব তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়। দেয়াল গাত্রে হেলান দিয়ে রাখা কাষ্ঠখণ্ড কোন উপকারেই আসে না।

৭. ছোট্ট এই আয়াতাংশে তাদের অপরাধী বিবেকের চিত্র অংকন করা হয়েছে। ঈমানের বাহ্যিক পর্দার আড়ালে মুনাফিকীর যে খেলা তারা খেলছিল তা নিজেরা যেহেতু ভাল করেই জানতো, তাই সবসময় তারা ভীতসন্ত্রস্ত থাকতো যে কখন যেন তাদের অপরাধের গোপনীয়তা প্রকাশ পেয়ে যায়, অথবা তাদের আচরণের ব্যাপারে ঈমানদারদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হয়। জনপদের কোন স্থান থেকে কোন বড় আওয়াজ শোনা গেলে অথবা কোথাও কোন শোরগোল উত্থিত হলে তারা ভয়ে জড়ষড় হয়ে যেত এবং মনে করত, আমার দুর্ভাগ্য বোধ হয় এসেই পড়ল।

৮. অন্য কথায় প্রকাশ্য দুশমনের তুলনায় ছদ্মবেশী এসব দুশমন অনেক বেশী ভয়ংকর।

৯. অর্থাৎ তাদের বাহ্যিক চালচলন ও আচার আচরণ দেখে প্রতারিত হয়ো না। এ ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকো যে, এরা যে কোন সময় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

১০. এটা বদদোয়া নয়, বরং তারা যে আল্লাহর গযবের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছে এবং সে গযব যে অবশ্যই নাযিল হবে—এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তারই ঘোষণা। এও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা এ বাক্যাংশটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করেননি বরং আরবী বাকরীতি অনুসারে, অভিশাপ ও তিরস্কার অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমাদের নিজস্ব ভাষায় আমরা যেমন বলি ঃ ওর সর্বনাশ হোক, কি জঘন্য মানুষ সে। এখানে "সর্বনাশ" শব্দটি দ্বারা তার জঘন্যতার তীব্রতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, বদদোয়া করা নয়।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾

যখন তাদের বলা হয়, এসো আল্লাহর রসূল যাতে তোমাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন তখন তারা মাথা ঝাঁকুনি দেয় আর তুমি দেখবে যে, তারা অহমিকা ভরে আসতে বিরত থাকে।[১২] হে নবী, তুমি তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া কর বা না কর, উভয় অবস্থাই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ কখনো তাদের মাফ করবেন না।[১৩] আল্লাহ ফাসিকদের কখনো হিদায়াত দান করেন না।[১৪]

১১. তাদেরকে ঈমানের পথ থেকে মুনাফিকীর পথে কে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা বলা হয়নি। একথাটি স্পষ্ট করে না বলার কারণে আপনা থেকেই যে অর্থ প্রকাশ পায় তা হলো, তাদের এই এলোপাতাড়ি ও অস্বাভাবিক আচরণের চালিকাশক্তি একটি নয়, বরং বহু সংখ্যক চালিকাশক্তি এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে। তাদের পেছনে এই চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে শয়তান, অসৎ বন্ধু–বান্ধব এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির আকাংখাসমূহ। কারো স্ত্রী, কারো সন্তান–সন্তুতি, কারো নিজ গোত্র ও গোষ্ঠীর অসৎলোকজন তাকে এ পথে চলতে বাধ্য করছে। আবার কাউকে তার হিংসা, বিদ্বেষ ও অহমিকা এ পথে তাড়িত করেছে।

১২. অর্থাৎ তারা ইসতিগফারের জন্য রসূলের কাছে আসে না শুধু তাই নয়, বরং এ কথা শুনে অহংকার ও গর্ব ভরে মাথা ঝাঁকুনি দেয়। রসূলের কাছে আসা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করাকে নিজেদের জন্য অপমানজনক ও মর্যাদাহানিকর মনে করে আপন অবস্থানে অনড় থাকে। তারা যে ঈমানদার নয় এটা তার স্পষ্ট প্রমাণ।

১৩. একথাটি সূরা তাওবাতে (যা সূরা মুনাফিকূনের তিন বছর পর নাযিল হয়) আরো অধিক জোর দিয়ে বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না করো, এমনকি যদি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ কখনো তাদেরকে মাফ করবেন না। কারণ, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে। আল্লাহ ফাসিকদের হিদায়াত দান করেন না।" (আত তাওবা, আয়াত ৮০) পরে আরো বলা হয়েছে ঃ তাদের কেউ মারা গেলে তুমি কখনো তার জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না। এরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং ফাসেক অবস্থায় মারা গেছে। (আত তাওবা, আয়াত ৮৪)

১৪. এ আয়াতটিতে দু'টি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এক, মাগফিরাতের জন্য দোয়া শুধু হিদায়াত প্রাপ্ত লোকদের জন্যই ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর হতে পারে। যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথ থেকে সরে গিয়েছে এবং যে ব্যক্তি আনুগত্যের পরিবর্তে গোনাহ ও

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۝ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

এরাই তো সেই সব লোক যারা বলে, আল্লাহর রসূলের সাথীদের জন্য খরচ করা বন্ধ করে দাও যাতে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ আসমান ও যমীনের সমস্ত ধন ভাণ্ডারের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। কিন্তু এই মুনাফিকরা তা বুঝে না। এরা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে যেতে পারলে যে সম্মানিত সে হীন ও নীচদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে।[১৫] অথচ সম্মান ও মর্যাদা তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের জন্য।[১৬] কিন্তু এসব মুনাফিক তা জানে না।

অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করেছে তার জন্য কোন সাধারণ মানুষের দোয়া তো দূরের কথা আল্লাহর রসূল নিজেও যদি তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন তবুও তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে না। দুই, যারা আল্লাহর হিদায়াত পেতে আগ্রহী নয় তাদের হিদায়াত দান করা আল্লাহর নীতি নয়। কোন ব্যক্তি নিজেই যদি আল্লাহর হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকে বরং তাকে হিদায়াতের দিকে আহবান জানালে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে অহংকার ভরে সে আহবান প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আল্লাহর কি প্রয়োজন পড়েছে যে, তার পিছনে পিছনে নিজের হিদায়াতের ফেরি করে বেড়াবেন এবং তোষামোদ করে তাকে সত্যপথে নিয়ে আসবেন।

১৫. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম বলেন ঃ আমি যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের এ কথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম এবং সে এসে শপথ করে পরিষ্কার ভাষায় তা অস্বীকার করলো তখন আনসারদের প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ লোকজন এবং আমার আপন চাচা আমাকে অনেক তিরস্কার করলেন। এমনকি আমার মনে হলো নবীও (সা) আমাকে মিথ্যাবাদী এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে সত্যবাদী মনে করেছেন। এতে আমার এত দুঃখ ও মনঃকষ্ট হলো যা সারা জীবনে কখনো হয়নি। আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে নিজের জায়গায় বসে পড়লাম। পরে এ আয়াতগুলো নাযিল হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডেকে হাসতে হাসতে আমার কান ধরে বললেনঃ ছোকরাটার কান ঠিকই শুনেছিল। আল্লাহ নিজে তা সত্য বলে ঘোষণা করেছেন। (ইবনে জারীর। এ বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা তিরমিযীতেও আছে)

১৬. অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদা মূলত আল্লাহর সত্তার জন্য নির্দিষ্ট আর রসূলের মর্যাদা রিসালাতের কারণে এবং ঈমানদারদের মর্যাদা তাদের ঈমানের কারণে। এরপর থাকে

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

২ রুকূ'

হে[১৭] সেই সব লোক যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে না দেয়।[১৮] যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে। আমি তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় আসার পূর্বেই তা থেকে খরচ করো। সে সময় সে বলবে ঃ হে আমার রব, তুমি আমাকে আরো কিছুটা অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি দান করতাম এবং নেককার লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম। অথচ যখন কারো কাজের অবকাশ পূর্ণ হয়ে যাওয়ার সময় এসে যায় তখন আল্লাহ তাকে আর কোন অবকাশ মোটেই দেন না। তোমরা যা কিছু কর সে বিষয়ে আল্লাহ পুরোপুরি অবহিত।

কাফের, ফাসেক ও মুনাফিকদের মর্যাদার ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদায় তাদের কোন অংশ নেই।

১৭. যেসব লোক ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করেছে, তারা সত্যিকার ঈমানদার হোক বা শুধু ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতিদানকারী হোক, তাদের সবাইকে সম্বোধন করে একটি উপদেশ দেয়া হচ্ছে। এর আগে আমরা কয়েকবার এ কথাটি বলেছি যে, কুরআন মজীদে الَّذِينَ آمَنُوا (যারা ঈমান এনেছো) কথাটি বলে কোন সময় সাচ্চা ঈমানদারকে সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কখনো মুনাফিকদের সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তারাও মৌখিকভাবে ঈমানের স্বীকৃতি দেয়। আবার কখনো সাধারণভাবে সব শ্রেণীর মুসলমানদের সম্বোধন করা বুঝানো হয়। কোথায় কোন শ্রেণীর লোককে একথা দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে তা পরিবেশ-পরিস্থিতি ও পূর্বাপর অবস্থাই নির্দেশ করে দেয়।

১৮. বিশেষভাবে অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মানুষ এসব স্বার্থের কারণে ঈমানের দাবী পূরণ না করে মুনাফিকী অথবা ঈমানের দুর্বলতা অথবা পাপাচার ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তবে মূলত

এখানে দুনিয়ার এমন প্রতিটি জিনিসকে বুঝানো হয়েছে যা মানুষকে এমনভাবে নিমগ্ন করে রাখে যে, সে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে যায়। আর আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে যাওয়াটাই সমস্ত অকল্যাণের উৎস। মানুষ যদি একথা স্মরণ রাখে যে, সে স্বাধীন নয়, বরং এক আল্লাহর বান্দা। আর সে আল্লাহ তার সমস্ত কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত, একদিন তাঁর সামনে হাজির হয়ে নিজের সব কাজ–কর্মের জবাবদিহি তাকে করতে হবে, তাহলে সে কখনো কোন খারাপ কাজ বা গোমরাহীতে লিপ্ত হতে পারবে না। মানবিক দুর্বলতার কারণে কোন সময় তার পদস্খলন যদি ঘটেও তাহলে সম্বিত ফিরে পাওয়ামাত্র সে সংযত ও সংশোধিত হয়ে যাবে।

আত তাগাবুন

৬৪

নামকরণ

সূরার ৯নং আয়াতের ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ কথাটির التَّغَابُنِ শব্দটিকে নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে التَّغَابُنِ শব্দটি আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

মুকাতিল এবং কালবী বলেন, সূরাটির কিছু অংশ মক্কায় এবং কিছু অংশ মদীনায় অবতীর্ণ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আতা ইবনে ইয়াসির বলেন ঃ প্রথম থেকে ১৩ আয়াত পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ এবং ১৪ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত মদীনায় অবতীর্ণ। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে সম্পূর্ণ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ। যদিও সূরার মধ্যে এমন কোন ইশারা-ইংগিত পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। তবে এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে অনুমিত হয় যে, সম্ভবত সূরাটি মাদানী যুগের প্রথমদিকে নাযিল হয়ে থাকবে। এ কারণে সূরাটিতে কিছুটা মক্কী সূরার বৈশিষ্ট এবং কিছুটা মাদানী সূরার বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে ঈমান ও আনুগত্যের দাওয়াত এবং উত্তম নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয়া। বক্তব্যের ধারাক্রম হচ্ছে ঃ প্রথম চার আয়াতে গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। ৫ থেকে ১০ আয়াতে যারা কুরআনের দাওয়াত মানে না তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং যারা কুরআনের এ দাওয়াতকে মেনে নিয়েছে ১১ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলোতে তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্য দ্বারা গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করে চারটি মূল সত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। প্রথমত বলা হয়েছে, এই বিশ্ব-জাহান যেখানে তোমরা বসবাস করছো তা আল্লাহহীন নয়। বরং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এমন এক আল্লাহ এর স্রষ্টা, মালিক ও শাসক যিনি যে কোন বিচারে পূর্ণাঙ্গ এবং দোষত্রুটি ও কলুষ-কালিমাহীন। এ বিশ্ব-জাহানের সবকিছুই তাঁর সে পূর্ণতা, দোষ-ত্রুটিহীনতা এবং কলুষ-কালিমাহীনতার সাক্ষ দিচ্ছে।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, এই বিশ্ব-জাহানকে উদ্দেশ্যহীন ও অযৌক্তিকভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। এর সৃষ্টিকর্তা একে সরাসরি সত্য, ন্যায় ও যুক্তির ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। এখানে

এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত থেকো না যে, এই বিশ্ব–জাহান অর্থহীন এক তামাশা, উদ্দেশ্যহীনভাবে এর সূচনা হয়েছে এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে তা শেষ হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সর্বোত্তম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং কুফর ও ঈমান গ্রহণ করা বা না করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। এটা কোন নিষ্ফল ও অর্থহীন ব্যাপার নয় যে, তোমরা কুফরী অবলম্বন করো আর ঈমান অবলম্বন করো কোন অবস্থাতেই এর কোন ফলাফল প্রকাশ পাবে না। তোমরা তোমাদের এই ইখতিয়ার ও স্বাধীনতাকে কিভাবে কাজে লাগাও আল্লাহ তা দেখছেন।

চতুর্থত বলা হয়েছে, তোমরা দায়িত্বহীন নও বা জবাবদিহির দায়–দায়িত্ব থেকে মুক্ত নও। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে হবে এবং সেই সত্তার সম্মুখীন হতে হবে যিনি বিশ্ব–জাহানের সবকিছু সম্পর্কেই অবহিত। তোমাদের কোন কথাই তাঁর কাছে গোপন নয়, মনের গহনে লুক্কায়িত ধ্যান–ধারণা পর্যন্ত তাঁর কাছে সমুজ্জল ও সুস্পষ্ট।

বিশ্ব–জাহান এবং মানুষের প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে এই চারটি মৌলিক কথা বর্ণনা করার পর বক্তব্যের মোড় সেই সব লোকদের প্রতি ঘুরে গিয়েছে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে। ইতিহাসের সেই দৃশ্যপটের প্রতি তাদের মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা মানব ইতিহাসে একের পর এক দেখা যায়। অর্থাৎ এক জাতির পতনের পর আরেক জাতির উত্থান ঘটে এবং অবশেষে সে জাতিও ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ তার বিবেক–বুদ্ধির মাপকাঠিতে ইতিহাসের এ দৃশ্যপটের হাজারো কারণ উল্লেখ করে আসছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর পেছনে কার্যকর প্রকৃত সত্য তুলে ধরেছেন। তা হচ্ছে, জাতিসমূহের ধ্বংসের মৌলিক কারণ শুধু দু'টিঃ

একটি কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের হিদায়াতের জন্য যেসব রসূল পাঠিয়েছিলেন তারা তাঁদের কথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ফল হয়েছে এই যে, আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তারা নানা রকম দার্শনিক তত্ত্ব রচনা করে একটি গোমরাহী ও বিভ্রান্তি থেকে আরেকটি গোমরাহী ও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছে।

দুই ঃ তারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারটিও প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজেদের ধ্যান–ধারণা অনুসারে মনে করে নিয়েছে যে, এই দুনিয়ার জীবনই সবকিছু। এ জীবন ছাড়া এমন আর কোন জীবন নেই যেখানে আল্লাহর সামনে আমাদের সব কাজের জবাবদিহি করতে হবে। এই ধ্যান–ধারণা ও বিশ্বাস তাদের জীবনের সমস্ত আচার–আচরণকে বিকৃত করে দিয়েছে। তাদের নৈতিক চরিত্র, কর্মের কলুষতা ও নোংরামি এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আযাব এসে তাদের অস্তিত্ব থেকে দুনিয়াকে পবিত্র ও ক্লেদমুক্ত করেছে। মানব ইতিহাসের এ দুটি শিক্ষামূলক বাস্তব সত্যকে তুলে ধরে ন্যায় ও সত্য অস্বীকারকারীদের আহবান জানানো হচ্ছে যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। আর তারা যদি অতীত জাতিসমূহের অনুরূপ পরিণামের সম্মুখীন হতে না চায় তাহলে আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং কুরআন মজীদ আকারে হিদায়াতের যে আলোকবর্তিকা আল্লাহ দিয়েছেন তার প্রতি যেন ঈমান আনে। সাথে সাথে তাদেরকে এ বিষয়ে সাবধান

করা হয়েছে যে, সেদিন অবশ্যই আসবে যখন আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে এবং তোমাদের প্রত্যেকের হার-জিতের বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তারপর কে ঈমান ও সৎকাজের পথ অবলম্বন করেছিল আর কে কুফর ও মিথ্যার পথ অনুসরণ করেছিল তার ভিত্তিতেই সমস্ত মানুষের ভাগ্যের চূড়ান্ত ফায়সালা করা হবে। প্রথম দলটি চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী হবে এবং দ্বিতীয় দলটির ভাগে পড়বে স্থায়ী জাহান্নাম।

এরপর ঈমানের পথ অনুসরণকারীদের উদ্দেশ করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে ঃ

এক ঃ দুনিয়াতে যে বিপদ-মুসিবত আসে তা আল্লাহর অনুমতি ও অনুমোদনক্রমেই আসে। এরূপ পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি ঈমানের ওপর অবিচল থাকে আল্লাহ তার দিলকে হিদায়াত দান করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অস্থির ও ক্রোধান্বিত হয়ে ঈমানের পথ থেকে সরে যাবে, তার বিপদ-মুসিবত তো মূলত আল্লাহর অনুমতি ও অনুমোদন ছাড়া দূরীভূত হবে না; তবে সে আরো একটি বড় মুসিবত ডেকে আনবে। তাহলো, তার মন আল্লাহর হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

দুই ঃ শুধু ঈমান গ্রহণ করাই মু'মিনের কাজ নয়। বরং ঈমান গ্রহণ করার পর তার উচিত কার্যত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা। সে যদি আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিজের ক্ষতির জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কেননা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য বিধান পৌঁছিয়ে দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গিয়েছেন।

তিন ঃ এক মু'মিন বান্দার ভরসা ও নির্ভরতা নিজের শক্তি অথবা পৃথিবীর অন্য কোন শক্তির ওপর না হয়ে কেবল আল্লাহর ওপর হতে হবে।

চার ঃ মু'মিনের জন্য তার অর্থ-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি একটা বড় পরীক্ষা। কারণ ঐগুলোর ভালবাসাই মানুষকে ঈমান ও আনুগত্যের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। সে জন্য ঈমানদার ব্যক্তিকে তার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে যাতে তারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কোনভাবেই তাদের জন্য আল্লাহর পথের ডাকাত ও লুটেরা হয়ে না বসে। তাছাড়া তাদের উচিত অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করা যাতে তাদের মন-মানসিকতা অর্থ পূজার ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকে।

পাঁচ ঃ প্রত্যেক মানুষ তার সাধ্যানুসারে শরীয়াতের বিধি-বিধান পালনের জন্য আদিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাছে তার শক্তি ও সামর্থের অধিক কিছু করার দাবী করেন না। তবে একজন মু'মিনের যা করা উচিত তাহলো, সে তার সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করতে কোন ত্রুটি করবে না এবং তার কথা, কাজ ও আচার-আচরণ তার নিজের ত্রুটি ও অসাবধানতার জন্য যেন আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ অতিক্রম না করে।

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর তাসবীহ করছে।[১] তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী[২] এবং সব প্রশংসাও তারই।[৩] তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।[৪] তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতপর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কাফের এবং কেউ মু'মিন।[৫] তোমরা যা করছো আল্লাহ তা দেখছেন।[৬]

১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হাদীদ, টীকা ১। এ আয়াতাংশ দিয়ে বক্তব্য শুরু করার কারণ পরবর্তী বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে আপনা থেকেই বোধগম্য হয়। পরবর্তী আয়াতসমূহে বিশ্ব–জাহান এবং মানুষ সৃষ্টির যে তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, এর স্রষ্টা, মালিক ও শাসক একমাত্র আল্লাহ। তিনি এই বিশ্ব–জাহানকে অযৌক্তিক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। তাছাড়া মানুষকে এখানে দায়িত্বহীন বানিয়েও ছেড়ে দেয়া হয়নি যে, সে যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াবে অথচ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কেউ থাকবে না। এই বিশ্ব–জাহানের শাসক এমন কোন বেখবর বাদশাহও নন যে, তাঁর সাম্রাজ্যে যা কিছু ঘটছে তা তাঁর আদৌ জানা থাকবে না। এ ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণনা করার জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সূচনা কথা বা ভূমিকা যা হতে পারতো সংক্ষিপ্ত এ আয়াতাংশে তাই বলা হয়েছে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে এই ভূমিকা বা সূচনা কথার অর্থ হলো, পৃথিবী থেকে শুরু করে মহাকাশের সর্বশেষ বিস্তৃতি পর্যন্ত যেদিকেই তাকাও না কেন যদি তোমরা বিবেক–বুদ্ধিহীন না হয়ে থাক তাহলে পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে, পরমাণু থেকে নিয়ে বিশাল ছায়াপথ পর্যন্ত সবকিছুই শুধুমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষই দিচ্ছে না বরং তিনি যে সব রকম দোষ–ত্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা এবং ভুল–ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র সে সাক্ষও দিচ্ছে। তার সত্তা ও গুণাবলী এবং তাঁর কাজকর্ম ও আদেশ–নিষেধসমূহে যদি কোন প্রকার কলুষ–কালিমা ও ভুল–ত্রুটি কিংবা কোন দুর্বলতা ও অপূর্ণতার নামমাত্র সম্ভাবনাও থাকতো তাহলে চরম

পূর্ণতাপ্রাপ্ত এই যুক্তিভিত্তিক ও জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থা আদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত এই অলংঘনীয় ও অবিচল পন্থায় চলা তো দূরের কথা অস্তিত্ব লাভ করতেও পারতো না।

২. অর্থাৎ এ গোটা বিশ্ব–জাহান তাঁরই সাম্রাজ্য। তিনি একে সৃষ্টি করে এবং একবার চালু করে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনিই এর ওপর কার্যত সার্বক্ষণিক শাসন পরিচালনা করছেন। এই শাসন ও কর্তৃত্বে অন্য কারো আদৌ কোন অংশ বা অধিকার নেই। এই বিশ্ব–জাহানের কোন জায়গায় কেউ যদি সাময়িকভাবে সীমিত পর্যায়ে ক্ষমতা কিংবা মালিকানা অথবা শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে থাকে তাহলে তা তার নিজের শক্তিতে অর্জিত ক্ষমতা ও ইখতিয়ার নয় বরং আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা ও ইখতিয়ার। আল্লাহ যতদিন চান ততদিন তা তার অধিকারে থাকে এবং যখনই চান তা তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেন।

৩. অন্য কথায় তিনি একাই কেবল প্রশংসার যোগ্য। অন্য আর যার মধ্যেই প্রশংসার যোগ্য কোন গুণ বা সৌন্দর্য আছে তা তারই দেয়া। আর حمد শব্দকে যদি শোকর বা কৃতজ্ঞতা অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে শোকর ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার প্রকৃত অধিকারীও কেবল তিনিই। কারণ সমস্ত নিয়ামত তাঁরই সৃষ্টি এবং সমস্ত সৃষ্টিরও প্রকৃত উপকারী ও কল্যাণদাতাও তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন উপকারের জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তা করি এই জন্য যে, ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিয়ামত আমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছেন। অন্যথায় সে যেমন এই নিয়ামতের স্রষ্টা নয়, তেমনি আল্লাহর দেয়া তাওফীক ও সামর্থ ছাড়া সে ঐ নিয়ামত আমাদের কাছে পৌছাতেও সক্ষম হতো না।

৪. অর্থাৎ তিনি চূড়ান্ত ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম। তাঁর ক্ষমতা ও সামর্থকে সীমিত করার মত কোন শক্তি নেই।

৫. একথাটির চারটি অর্থ এবং চারটি অর্থই যথাস্থানে সঠিক ঃ

এক ঃ তিনিই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ তাঁর সৃষ্টিকর্তা হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার আর কেউ এ সত্যটিকে স্বীকার করে। আয়াতের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ এক সাথে মিলিয়ে পড়লে সর্বপ্রথম এ অর্থটিই বোধগম্য হয়।

দুই ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে কুফরীর পথ অবলম্বন করতে পার আবার ইচ্ছা করলে ঈমানও গ্রহণ করতে পার। এভাবে তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। ঈমান ও কুফরীর দু'টি পথের কোনটি গ্রহণ করতেই তিনি তোমাদের বাধ্য করেননি। তাই নিজেদের ঈমান ও কুফরীর ব্যাপারে তোমরা নিজেরাই দায়ী। পরবর্তী আয়াতাংশ "তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তা সবই দেখছেন" এ অর্থ সমর্থন করে। অর্থাৎ এই স্বাধীনতা ও ইখতিয়ার দিয়ে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। এই ইখতিয়ার ও স্বাধীনতাকে তোমরা কিভাবে কাজে লাগাও তিনি তা দেখছেন।

তিন ঃ তিনি তো তোমাদেরকে সুস্থ বিবেক–বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই সুস্থ বিবেক–বুদ্ধির দাবী হলো, তোমরা সবাই ঈমানের পথ অবলম্বন করবে। কিন্তু এই সুস্থ প্রকৃতির ওপর জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের জন্মগত স্বভাব–প্রকৃতির পরিপন্থী কুফরীর পথ অনুসরণ করেছে। আবার কেউ কেউ তাদের

জন্মগত স্বভাব–প্রকৃতির অনুকূল ঈমানের পথ অনুসরণ করেছে। এ আয়াতটিকে সূরা রূমের ৩০নং আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়লে এ অর্থটিই বোধগম্য হয়। সূরা রূমের ঐ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "তুমি একাগ্র ও একনিষ্ঠ হয়ে নিজের লক্ষ ও মনযোগকে দীনের দিকে করে দাও এবং যে প্রকৃতির ওপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সেই প্রকৃতির ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর বানানো স্বভাব–প্রকৃতি বদলানো যাবে না। এটিই পুরোপুরি সত্য ও সঠিক দীন।" কিছু সংখ্যক হাদীস এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছে। এসব হাদীসে নবী (সা) বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষ সঠিক প্রকৃতির ওপর জন্মলাভ করে থাকে। কিন্তু পরে বাইরে থেকে কুফরী, শিরক ও গোমরাহী তার ওপর চড়াও হয়। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূর, টীকা ৪২ থেকে ৪৭)। এখানে এ বিষয়টি বিশেষ উল্লেখ্য যে, জন্মগতভাবে মানুষের পাপী হওয়ার ধারণাকে খৃস্টবাদ দেড় হাজার বছর ধরে তাদের মৌলিক ধর্মীয় বিশ্বাস বানিয়ে রেখেছে। অথচ আসমানী কিতাবসমূহ মানুষের জন্মগতভাবে পাপী হওয়ার ধারণা কখনো পেশ করেনি। বর্তমানে ক্যাথলিক পণ্ডিত পুরোহিতগণ নিজেরাই বলতে শুরু করেছেন যে, এই ধর্মবিশ্বাসের কোন ভিত্তিই বাইবেলে নেই। বাইবেলের একজন বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত রিভারেণ্ড হার্বার্ট হগ (Haag) তাঁর "Is Original Sin In Scripture" গ্রন্থে লিখছেন, প্রথম যুগের খৃস্টানদের মধ্যে অন্তত তৃতীয় শতক পর্যন্ত এই ধর্মীয় বিশ্বাসের কোন অস্তিত্বই ছিল না যে, মানুষ জন্মগতভাবে পাপী। এই ধ্যান–ধারণা যখন বিস্তার লাভ করতে শুরু করে তখন থেকে পরবর্তী দুইশত বছর পর্যন্ত খৃস্টান পণ্ডিতগণ তার প্রতিবাদ করেছেন। পরবর্তী সময়ে পঞ্চম শতকে সেন্ট অগাস্টাইন যুক্তি ও কূটতর্কের জোরে এ বিশ্বাসটিকে খৃস্টবাদের মূল ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তরভুক্ত করে দেয়। অর্থাৎ "মানবজাতি উত্তরাধিকার সূত্রে আদমের পাপের বোঝা লাভ করেছে। তাই ঈসা মাসীহর কাফ্‌ফারা বা প্রায়শ্চিত্তের সুবাদে মুক্তি লাভ করা ছাড়া মানুষের মুক্তি লাভের আর কোন উপায় নেই।"

চার ঃ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এক সময় তোমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তারপর তোমরা অস্তিত্ব লাভ করেছ। এটি এমন একটি ব্যাপার যে, তা নিয়ে তোমরা যদি সহজ সরলভাবে চিন্তা–ভাবনা করতে তাহলে উপলব্ধি করতে পারতে যে, এই অস্তিত্বই প্রকৃতপক্ষে সেই আসল নিয়ামত যার সাহায্যে তোমরা অন্যসব নিয়ামত ভোগ করতে সক্ষম হচ্ছো। এই উপলব্ধি থাকলে তোমাদের কেউই তার স্রষ্টার সাথে কুফরী ও বিদ্রোহের আচরণ করতে পারতে না। কিন্তু তোমাদের অনেকে এ বিষয়ে চিন্তা–ভাবনা করেনি, কিংবা করে থাকলেও ভ্রান্ত পন্থায় চিন্তা–ভাবনা করেছে এবং কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে। অনেকে আবার সঠিক ও নির্ভুল চিন্তা–ভাবনার দাবী ঈমানের পথটিই অনুসরণ করেছে।

৬. এ আয়াতাংশে যে দেখার কথা বলা হয়েছে তার অর্থ শুধু দেখাই নয়, বরং আপনা থেকেই এর এই অর্থ প্রকাশ পায় যে, তোমাদের আমল অনুপাতে তোমাদের প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে। এটা ঠিক এরূপ যেন কোন শাসক কাউকে তার অধীনে চাকরিতে নিয়োগ করে বলছে যে, তুমি কিভাবে কাজ করো তা আমি দেখবো। এ ক্ষেত্রে এ ধরনের কথার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যদি ঠিকমত কাজ করো তাহলে পুরস্কার ও উন্নতি দান করবো। আর অন্যথা হলে কঠোরভাবে পাকড়াও করবো।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

তিনি আসমান ও যমীনকে যথাযথরূপে সৃষ্টি করেছেন তিনি তোমাদেরকে আকার–আকৃতি দান করেছেন এবং অতি উত্তম আকার–আকৃতি দান করেছেন। অবশেষে তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।[৭] আসমান ও যমীনের সবকিছু সম্পর্কেই তিনি জানেন। আর তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো তাও তিনি জানেন।[৮] মানুষের অন্তরের কথাও তিনি খুব ভাল করে জানেন।[৯]

৭. এই আয়াতে গভীর যৌক্তিক সম্পর্কের পারম্পর্য ও ক্রমানুসারে তিনটি কথা বলা হয়েছে ঃ

প্রথম কথাটি বলা হয়েছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা এই বিশ্ব–জাহানকে যথাযথ ও যৌক্তিক পরিণতির জন্য সৃষ্টি করেছেন। بالحق শব্দটি যখন কোন খবর সম্পর্কে বলা হয় তখন তার অর্থ হয় সত্য খবর। হুকুম বা নির্দেশের জন্য বলা হলে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক হুকুম বা নির্দেশ, কথার ব্যাপারে বলা হলে তার অর্থ হয় সত্য ও সঠিক কথা এবং কোন কাজ সম্পর্কে ব্যবহৃত হলে তার অর্থ হয় এমন কাজ যা বিজ্ঞোচিত ও যুক্তিসংগত, অনর্থক ও অযথা কাজ নয়। এটা স্পষ্ট যে, خلق বা সৃষ্টি করা একটি কাজ। তাই বিশ্ব–জাহান সৃষ্টি করাকে যথাযথ ও যৌক্তিক বলার অনিবার্য অর্থ এই যে, এই বিশ্ব–জাহানকে খেল–তামাশার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এটি একজন বিজ্ঞ স্রষ্টার একান্ত সুচিন্তিত কাজ। এর প্রতিটি বস্তুর পেছনে একটি যুক্তিসংগত উদ্দেশ্য আছে। এসব সৃষ্টির মধ্যে এই উদ্দেশ্যবাদ এতই সুস্পষ্ট যে, বিবেক–বুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষ যদি এর কোনটির রূপ প্রকৃতি ভালভাবে বুঝতে পারে তাহলে ঐ জিনিস সৃষ্টির যৌক্তিক ও বিজ্ঞোচিত উদ্দেশ্য কি হতে পারে তা জানা তার জন্য কঠিন কাজ নয়। পৃথিবীতে মানুষের সমস্ত বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাক্ষ দিচ্ছে যে, গভীর চিন্তা–ভাবনা, গবেষণা এবং অনুসন্ধান দ্বারা মানুষ যে জিনিসেরই রূপ–প্রকৃতি বুঝাতে সক্ষম হয়েছে শেষ পর্যন্ত ঐ জিনিস সম্পর্কে সে একথাও জানতে পেরেছে যে, তা কোন্ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে আর সেই উদ্দেশ্যকে জানা ও বুঝার পরই সে এমন অসংখ্য জিনিস আবিষ্কার করেছে যা বর্তমানে মানব সভ্যতার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ বিশ্ব–জাহান যদি কোন ক্রীড়ামোদীর খেলার উপকরণ হতো এবং এর মধ্যে কোন যুক্তি ও উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল না থাকতো তাহলে এসব আবিষ্কার উদ্ভাবন কখনো সম্ভব হতো না। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনয়াম, টীকা ৪৬; ইউনুস, টীকা ১১; ইবরাহীম, টীকা ২৬; আন নাহল্, টীকা ৬; আল আম্বিয়া, টীকা ১৫—১৬; আল মু'মিনূন, টীকা ১০২; আল আনকাবূত, টীকা ৭৫; আর রূম, টীকা ৬; আদ্ দুখান, টীকা ৩৪; আল জাসিয়া, টীকা ২৮)।

দ্বিতীয় কথাটি বলা হয়েছে এই-যে, আল্লাহ এই বিশ্ব–জাহানে মানুষকে সর্বোত্তম আকার আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আকার আকৃতি অর্থ শুধু মানুষের চেহারা নয়। বরং এর অর্থ তার গোটা দৈহিক কাঠামো এবং দুনিয়াতে কাজ করার জন্য তাকে দেয়া সব রকম শক্তি ও যোগ্যতাও এর মধ্যে অন্তরভুক্ত। এই দু'টি দিক দিয়ে মানুষকে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এ কারণেই সে পৃথিবী ও তার আশেপাশের সমস্ত সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব করার যোগ্য হয়েছে। তাকে দীর্ঘ দেহ কাঠামো দেয়া হয়েছে, চলাফেরার জন্য উপযুক্ত পা দেয়া হয়েছে এবং কাজ–কর্ম করার জন্য উপযুক্ত হাত দেয়া হয়েছে। তাকে এমন সব ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান আহরণ যন্ত্র দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে সে সব রকম তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। তাকে চিন্তা–ভাবনা করার, বুঝার এবং বিভিন্ন তথ্য একত্র করে তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মত উন্নত পর্যায়ের একটি মস্তিষ্ক ও চিন্তা শক্তি দেয়া হয়েছে। তাকে একটি নৈতিক বোধ ও অনুভূতি এবং ভালমন্দ ও ভুল শুদ্ধ নিরূপক শক্তি দেয়া হয়েছে। তাকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী শক্তি দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে সে নিজেই তার চলার পথ বেছে নেয় এবং কোন পথে সে তার চেষ্টা–সাধনা নিয়োজিত করবে আর কোন পথে করবে না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাকে এতটা স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে তার স্রষ্টাকে মানতে এবং তাঁর আনুগত্য ও দাসত্ব করতে পারে, কিংবা তাঁকে অস্বীকার করতে পারে কিংবা যাদেরকে ইচ্ছা সে তার খোদা বানিয়ে নিতে পারে অথবা যাকে সে খোদা বলে স্বীকার করে ইচ্ছা করলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করতে পারে। এসব শক্তি এবং ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। আর কার্যত সে এ ক্ষমতা প্রয়োগও করছে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মু'মিন, টীকা ৯১)

ওপরে বর্ণিত এ দু'টি কথার যৌক্তিক ফলাফল হিসেবে এই আয়াতের তৃতীয় অংশে বর্ণিত কথাটি আপনা থেকেই এসে পড়ে। আয়াতটির এই অংশে বলা হয়েছে ঃ "অবশেষে তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।" একথা স্পষ্ট যে, এরূপ একটি যুক্তিসঙ্গত ও উদ্দেশ্যমূলক বিশ্ব–ব্যবস্থায় এমন স্বাধীন একটি সৃষ্টিকে যখন সৃষ্টি করা হয়েছে তখন যুক্তির দাবী কখনো এটা হতে পারে না যে, তাকে এখানে দায়িত্বহীন বানিয়ে লাগামহীন উটের মত ছেড়ে দেয়া হবে। বরং এর অনিবার্য দাবী হবে যিনি তাকে ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও স্বাধীনতা দিয়ে তাঁর সৃষ্ট জগতে এই মর্যাদা ও অবস্থান দিয়েছেন তাঁর সামনে সে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। এই আয়াতে উল্লেখিত "ফিরে যাওয়া" এর অর্থ নিছক ফিরে যাওয়া নয়, বরং এর অর্থ জবাবদিহির জন্য ফিরে যাওয়া। পরবর্তী আয়াতসমূহে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এই ফিরে যাওয়াটা পার্থিব এই জীবনে হবে না বরং মৃত্যুর পরের আরেকটি জীবনে হবে। গোটা মানব জাতিকে পুনরায় জীবিত করে হিসেব–নিকেশ গ্রহণের জন্য যখন এক সাথে একই সময়ে জড়ো করা হবে, সেটি হবে এর প্রকৃত সময়। আর সেই হিসেব–নিকেশের ফলাফল স্বরূপ পুরস্কার ও শাস্তির ভিত্তি হবে মানুষ আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা ও ইখতিয়ারকে সঠিক পন্থায় কাজে লাগিয়েছে, না ভুল পন্থায় কাজে লাগিয়েছে তার ওপর। এখন প্রশ্ন হলো, জবাবদিহির এই কাজটি দুনিয়ার বর্তমান এই জীবনে হওয়া সম্ভব নয় কেন? আর এর প্রকৃত সময় মৃত্যুর পরের জীবনই বা কেন? তাছাড়া এ পৃথিবীর গোটা মানব জাতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আগের ও পরের সব

মানুষকে যে সময় পুনরায় জীবিত করে জড়ো করা হবে সে সময়টিই বা এর প্রকৃত সময় হবে কেন? মানুষ যদি বিবেক–বুদ্ধিকে কিছুটা কাজে লাগায় তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, এ সবই যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার। সে এ কথাও বুঝতে পারবে যে, জ্ঞান ও বিবেক–বুদ্ধির দাবী হলো, মানুষের হিসেব–নিকেশ ও জবাবদিহির কাজটি মৃত্যুর পরের জীবনেই হওয়া দরকার এবং সমস্ত মানুষের এক সাথে হওয়া দরকার। এর প্রথম কারণ হচ্ছে, মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে তার গোটা জীবনের কাজকর্মের জন্য। তাই তার জীবনের সমস্ত কাজকর্ম ও দায়িত্ব–কর্তব্যের জন্য জবাবদিহির সঠিক ও অনিবার্য সময় সেটিই হওয়া উচিত যখন তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, মানুষের কাজ–কর্মের ফলাফল, প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব তার মৃত্যুর পরপরই শেষ হয়ে যায় না। তা যেমন অন্য মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে এবং প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সৃষ্টি করে, তেমনি তার মৃত্যুর পরেও তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। এসব ফলাফল, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার জন্য সে–ই দায়ী। তাই সঠিক জবাবদিহি ও হিসেব–নিকেশ কেবল তখনই হতে পারে যখন গোটা মানব জাতির জীবন কর্মের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবে এবং আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে একই সময়ে একত্রিত করা হবে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৩০; ইউনুস, টীকা ১০—১১; হূদ, টীকা ১০৫; আন নাহ্‌ল, টীকা ৩৫; আল হাজ্জ, টীকা ৯; আন নামল, টীকা ২৭; আর রূম, টীকা ৫—৬; সোয়াদ, টীকা ২৯—৩০; আল মু'মিন, টীকা ৮০; আল জাসিয়া, টীকা ২৭ থেকে ২৯)।

৮. এর আরেকটি অনুবাদ হতে পারে "যা তোমরা গোপনে করো এবং যা তোমরা প্রকাশ্যে করো।"

৯. অর্থাৎ তিনি শুধু সেই সব কাজ–কর্ম সম্পর্কেই অবগত নন যা মানুষের গোচরে আসে বরং সেই সব কাজ–কর্ম সম্পর্কেও তিনি অবহিত যা সবার কাছেই গোপন থাকে। তাছাড়াও তিনি শুধু কাজ–কর্মের বাহ্যিক রূপটাই দেখেন না বরং মানুষের প্রতিটি কাজের পেছনে কি ধরনের ইচ্ছা–আকাংখা এবং উদ্দেশ্য সক্রিয়া ছিল, সে যা করেছে তা কি নিয়তে করেছে এবং কি বুঝে করেছে তাও তিনি জানেন। এটা এমন এক সত্য, যে বিষয়ে চিন্তা করলে মানুষ বুঝতে পারবে যে, ইনসাফ ও সুবিচার কেবল আখেরাতেই হতে পারে এবং শুধু আল্লাহ তা'আলার আদালতেই ইনসাফ হওয়া সম্ভব। মানুষের বিবেক–বুদ্ধিও দাবী করে যে, মানুষের তার প্রতিটি অপরাধের জন্য শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু কে না জানে যে, কৃত অপরাধের বেশীর ভাগই দুনিয়াতে হয় গোপন থাকে নয়তো প্রয়োজনীয় সাক্ষ প্রমাণ না পাওয়ার কারণে অপরাধী নিষ্কৃতি পেয়ে যায়। কিংবা অপরাধ প্রকাশ পেয়ে গেলেও অপরাধী এমন প্রভাবশালী ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে যে, তাকে শাস্তি দেয়া সম্ভব হয় না। মানুষের বিবেক–বুদ্ধি এও দাবী করে যে, কোন ব্যক্তির কাজের ধরন ও প্রকৃতি শুধু অপরাধমূলক কাজের মত হলেই তার শাস্তি না পাওয়া উচিত। বরং এই মর্মে তার অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা হওয়া উচিত যে, যে কাজ সে করেছে তা ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে বুঝে করেছে কিনা। এ অনুসন্ধান এবং পর্যালোচনাও হওয়া উচিত যে, ঐ কাজ করার সময় সে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবেই তা করছিল। অপরাধ সংঘটনই তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল এবং সে এ কথাও জানতো যে, সে যা করছে তা অপরাধ। এ কারণে দুনিয়ার বিচারালয়সমূহ মামলা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করার ব্যাপারে এসব

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا ۚ وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

এরপূর্বে যেসব মানুষ কুফরী করেছে এবং নিজেদের অপকর্মের পরিণামও ভোগ করেছে তাদের খবর কি তোমাদের কাছে পৌছেনি? তাদের জন্য নির্দিষ্ট আছে অতীব কষ্টদায়ক শাস্তি।[১০] তারা এরূপ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে এ কারণে যে, তাদের কাছে যেসব রসূল এসেছেন তাঁরা স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে তাদের কাছে এসেছিলেন।[১১] কিন্তু তারা বলেছিল ঃ মানুষ কি আমাদের হিদায়াত দান করবে?[১২] এভাবে তারা মানতে অস্বীকৃতি জানালো এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। তখন আল্লাহও তাদের তোয়াক্কা করলেন না। আল্লাহ তো আদৌ কারো মুখাপেক্ষীই নন। তিনি আপন সত্তায় প্রশংসিত।[১৩]

বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে থাকে এবং এসব বিষয়ের অনুসন্ধানকে সুবিচার নীতির দাবী বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এই পৃথিবীতে সত্যি সত্যিই কি এমন কোন উপায়-উপকরণ আছে যার সাহায্যে এ বিষয়ে এমন ন্যায়ানুগ অনুসন্ধান হতে পারে যা সব রকম সংশয়ের উর্ধে? এদিক দিয়ে বিচার করলে এ আয়াতটিও আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর সাথে গভীর যৌক্তিক সম্পর্ক বিদ্যমান যাতে বলা হয়েছে ঃ "তিনি আসমান ও যমীনকে যৌক্তিক পরিণামের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" যৌক্তিক পরিণামের জন্য সৃষ্টি করার অনিবার্য দাবী হলো, এই বিশ্ব-জাহানে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ন্যায়বিচার থাকবে। এ ধরনের ন্যায়বিচার কেবল তখনই কায়েম হতে পারে যখন ন্যায়বিচারকারীর দৃষ্টি থেকে মানুষের মত দায়িত্বশীল সৃষ্টির কোন কাজ শুধু গোপন থাকবে না তাই নয়, বরং যে নিয়ত ও উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কোন কাজ করেছে তাও তাঁর থেকে গোপন থাকবে না। এ কথা স্পষ্ট যে, বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ছাড়া আর কোন সত্তা এমন হতে পারে না যার দ্বারা এরূপ ন্যায়বিচার কায়েম হতে পারে। এমন কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ ও আখেরাতকে অস্বীকার করে তা হলে সে যেন প্রকারান্তরে এ দাবীই করছে যে, আমরা এমন বিশ্ব-জাহানে বাস করছি যেখানে বাস্তবে কোন ইনসাফ নেই, এমনকি ইনসাফের কোন সম্ভাবনাই নেই। এরূপ আহম্মকি ও নির্বুদ্ধিতামূলক ধ্যান-ধারণায় যে ব্যক্তির জ্ঞানবুদ্ধি এবং মন ও বিবেক সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত সে যদি নিজেকে প্রগতিবাদী ও যুক্তিবাদী মনে করে এবং বিশ্ব-জাহান সম্পর্কে কুরআনের পেশকৃত এই চরম যুক্তিগ্রাহ্য ধারণাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা বলে মনে করে তাহলে তার মত চরম নির্লজ্জ ও বেহায়া আর কেউই নেই।

১০. অর্থাৎ তারা নিজেদের কৃতকর্মের যে শাস্তি পৃথিবীতে ভোগ করেছে তা তাদের অপরাধসমূহের উপযুক্ত শাস্তি যেমন নয় তেমনি পুরো শাস্তিও নয়। পূর্ণাঙ্গ ও যথোপযুক্ত

শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হবে আখেরাতে। তবে তাদের ওপর পৃথিবীতে যে আযাব এসেছে তা থেকে মানুষ এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যে, যে জাতিই তাদের রবের সাথে কুফরীর আচরণ করেছে, তারা কেমন করে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কেমন পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৫—৬; হূদ, টীকা ১০৫)।

১১. মূল আয়াতে 'বাইয়েনাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আরবী ভাষায় بَيِّن বলা হয় এমন জিনিসকে যা প্রকাশ্য ও স্পষ্ট। নবী–রসূলগণ بَيِّنَات নিয়ে আসতেন এ কথার অর্থ প্রথমত এই যে, তাঁরা এমনসব স্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন নিয়ে আসতেন যা সরাসরি প্রমাণ করতো, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট। দ্বিতীয়ত, তাঁরা যেসব কথা পেশ করতেন তা খুবই যুক্তিসঙ্গতভাবে ও উজ্জ্বল দলীল–প্রমাণাদিসহ পেশ করতেন। তৃতীয়ত, তাঁদের শিক্ষায় কোন অস্পষ্টতা ছিল না, বরং হক কি এবং বাতিল কি, জায়েয কি এবং নাজায়েয কি এবং কোন পথে মানুষের চলা উচিত আর কোন পথে চলা উচিত নয় তা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় তাঁরা বলে দিতেন।

১২. এটা ছিল তাদের ধ্বংসের প্রাথমিক ও মূল কারণ। স্রষ্টা কর্তৃক সঠিক জ্ঞান দেয়া ছাড়া মানুষের পক্ষে দুনিয়ায় সঠিক কর্মপন্থা বেছে নেয়া সম্ভব ছিল না। আর স্রষ্টার পক্ষ থেকে মানুষের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোককে জ্ঞান দান করে অন্যদের কাছে তা পৌছানোর দায়িত্ব অর্পণ করা ছাড়া মানুষকে জ্ঞান দানের আর কোন বাস্তব পন্থাও হতে পারতো না। এ উদ্দেশ্যেই তিনি بَيِّنَات সহ নবী–রসূলদের পাঠিয়েছেন যাতে তাঁদের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ মানুষের কাছে না থাকে। কিন্তু মানুষ আল্লাহর রসূল হতে পারে এ কথা তারা আদৌ মানতে রাজি হলো না, বরং অস্বীকৃতি জানিয়ে বসলো। এরপর তাদের হিদায়াত পাওয়ার আর কোর উপায়ই রইল না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইয়াসীন, টীকা ১১)। এ ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট মানুষদের মূর্খতা ও জ্ঞানহীনতার যে বিস্ময়কর বিষয়টি আমাদের কাছে ধরা পড়ে তা হলো, মানুষের দিকনির্দেশনা মেনে নিতে তো তারা কোন সময়ই দ্বিধা করেনি। এমন কি মানুষের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করেই তারা কাঠ ও পাথরের মূর্তিকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, এই মানুষকেই খোদা, খোদার অবতার এবং খোদার পুত্র বলেও স্বীকার করেছে। আর পথভ্রষ্ট নেতাদের অন্ধ আনুগত্য করতে গিয়ে এমন সব অদ্ভুত পথ ও পন্থা গ্রহণ করেছে যা মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নৈতিকতাকে উলট–পালট করে দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহর রসূল যখন তাদের কাছে সত্য ও ন্যায় নিয়ে এসেছেন এবং সকল ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে উঠে তাদের কাছে নির্ভেজাল সত্য পেশ করেছেন তখন তারা বলেছে ঃ "আপনি তো মানুষ। আর মানুষ হয়ে আমাদের হিদায়াত দিবেন কি করে?" এর মানে হলো, মানুষ যদি পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করে তাহলে তাকে সাদরে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু যদি সত্য, সঠিক ও ন্যায়ের পথ দেখায় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৩. অর্থাৎ তারা যখন আল্লাহর দেয়া হিদায়াতের পরোয়া করলো না তখন তারা গোমরাহীর কোন্ গহ্বরে পতিত হতে যাচ্ছে, আল্লাহও তার পরোয়া করলেন না। কোন ব্যাপারেই আল্লাহ তাদের কাছে ঠেকা ছিলেন না যে, তারা তাকে খোদা হিসেবে মানলে

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۭ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۭ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ⑦

অস্বীকারকারীরা দাবী করে বলেছে যে, মরার পরে আর কখনো তাদের জীবিত করে উঠানো হবে না।[১৪] তাদের বলে দাও, আমার রবের শপথ, তোমাদের অবশ্যই উঠানো হবে।[১৫] তারপর (দুনিয়ায়) তোমরা যা করেছো তা অবশ্যই তোমাদেরকে অবহিত করা হবে।[১৬] এরূপ করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।[১৭]

তবেই তিনি খোদা থাকবেন অন্যথায় তাঁর কর্তৃত্বের আসন হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তিনি তাদের ইবাদাত-বন্দেগীরও মুখাপেক্ষী নন কিংবা প্রশংসা ও স্তব-স্তুতিরও মুখাপেক্ষী নন। তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই তিনি তাদেরকে সত্য ও সঠিক পথ দেখাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহও তাদের প্রতি বিমুখ হয়ে গেলেন। এরপর আল্লাহ তাদেরকে না হিদায়াত দিয়েছেন, না রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, না তাদেরকে ধ্বংসের মুখে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন এবং না নিজেদের ওপর ধ্বংস ডেকে আনা থেকে বাধা দিয়েছেন। কারণ তারা নিজেরাই তাঁর হিদায়াত ও বন্ধুত্ব লাভের আকাঙ্খী ছিল না।

১৪. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগেই ন্যায় ও সত্যের অস্বীকারকারীরা মৌলিক একটি গোমরাহীর মধ্যে ডুবে রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সেটিই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোমরাহীটি হলো মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন নেই, আখেরাত অস্বীকারকারীদের কাছে এ কথা জানার কোন উপায় না পূর্বে ছিল, না এখন আছে, না কখনো থাকতে পারে। কিন্তু এসব মূর্খতা চিরদিনই জোর গলায় সে দাবী করেছে। অথচ চূড়ান্তভাবে আখেরাতকে অস্বীকার করার কোন যুক্তিসংগত ও জ্ঞানগত ভিত্তি নেই।

১৫. কুরআন মজীদে এটা তৃতীয় স্থান যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে (সা) বলেছেন : তোমার রবের শপথ করে বলো, অবশ্যই তা হবে। প্রথমে সূরা ইউনুসে বলেছেন :

وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ۭ قُلْ اِيْ وَرَبِّيْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ڤ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ

"তারা জিজ্ঞেস করে, তা কি সত্যি সত্যিই হবে? বলো, আমার রবের শপথ, তা অবশ্যই সত্য। তোমরা এত ক্ষমতাশালী নও যে, তা বাধা দিয়ে ঠেকাতে পার।" (আয়াত : ৫৩)

পরে সূরা সাবায় বলা হয়েছে :

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ۭ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ –

"অস্বীকারকারীরা বলে, কি ব্যাপার! আমাদের ওপর কিয়ামত আসছে না কেন? বলো, আমার রবের শপথ। তা তোমাদের ওপর অবশ্যই আসবে।" (আয়াত ৩)

এখানে এই মর্মে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একজন আখেরাত অস্বীকারকারীকে আপনি আখেরাতের কথা শপথ করে বলেন আর শপথ ছাড়া বলেন তাতে তার জন্য এমন কি এসে যায়? জিনিসটিকে যখন সে স্বীকারই করে না তখন আপনি কেবল শপথ করে বললেই সে তা মেনে নেবে কেন? এর জবাব হলো, প্রথমত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন লোকদের উদ্দেশ করে তাঁর বক্তব্য পেশ করছিলেন যারা নিজেদের ব্যক্তিগত জানা শোনা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ কথা ভাল করে জানতো যে, ঐ ব্যক্তি সারা জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। তাই মুখে তারা তাঁর বিরুদ্ধে যত অপবাদই রটনা করুক না কেন অন্তরে কখনো একথা কল্পনা করতে পারতো না যে, এমন সত্যবাদী লোকটি আল্লাহর শপথ করে কোন সময় এমন কথা বলতে পারেন যা সত্য হওয়ার পুরো বিশ্বাস তাঁর নেই। দ্বিতীয়ত তিনি শুধু আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের কথাই পেশ করতেন না, বরং তার স্বপক্ষে অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদিও পেশ করতেন। কিন্তু যে জিনিসটি একজন নবী ও অনবীর মধ্যে পার্থক্য করে তা হচ্ছে, একজন অনবী আখেরাতের স্বপক্ষে যে অখণ্ডনীয় দলীল-প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম তার ফায়দা বড় জোর এতটুকু হতে পারে যে, আখেরাত সংঘটিত না হওয়ার চেয়ে হওয়াটাই অধিক যুক্তিসংগত এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে। অপরদিকে একজন নবীর মর্যাদা ও স্থান একজন দার্শনিকের মর্যাদা ও স্থান থেকে অনেক উর্ধে। আখেরাত হওয়া উচিত, যুক্তিভিত্তিক দলীল-প্রমাণের সাহায্যে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌছেননি। তাঁর প্রকৃত পদমর্যাদা ও অবস্থান তা নয়। বরং তাঁর প্রকৃত পদমর্যাদা ও অবস্থান হলো, আখেরাত যে হবে সে বিষয়ে তিনি প্রকৃত ও চাক্ষুস জ্ঞানের অধিকারী। তাই আখেরাত অবশ্যই সংঘটিত হবে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথেই তিনি সে কথা বলেন। তাই একজন নবীই কেবল শপথ করে একথা বলতে পারেন। কোন দার্শনিকের পক্ষে এ ব্যাপারে শপথ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া একজন নবীর বক্তব্যের ভিত্তিতেই কেবল আখেরাতের প্রতি ঈমান সৃষ্টি হতে পারে। দার্শনিকের যুক্তিতর্কের মধ্যে এমন কোন শক্তি নেই। অন্যেরা তো দূরের কথা দার্শনিক নিজেও তার দলীল-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে নিজের ঈমানী আকীদা পোষণ করতে পারে না। দার্শনিক যদি সত্যিই সুষ্ঠু ও সঠিক চিন্তার অধিকারী দার্শনিক হয়ে থাকেন তাহলে সে "হওয়া উচিত" বলার অধিক কিছুই বলতে পারেন না। "এটিই ঠিক" এবং "নিশ্চিতভাবেই এটি ঠিক" কোন বিষয় সম্পর্কে এ কথাটি কেবল নবীই বলতে পারেন।

১৬. এ উদ্দেশ্যেই মৃত্যুর পরে মানুষকে পুনরায় উঠানো হবে। এবং এরূপ করার প্রয়োজন কি এর মধ্যে সে প্রশ্নেরও জবাব আছে। সূরার শুরু থেকে ৪ নম্বর আয়াত পর্যন্ত যে আলোচনা করা হয়েছে তা যদি সামনে থাকে তাহলে এ কথাটি সহজেই বোধগম্য হয় যে, সত্য ও ন্যায়ভিত্তিক এবং যুক্তিনির্ভর এই বিশ্ব-জাহানে যে মাখলুক বা সৃষ্টিকে ঈমান ও কুফরের যে কোন একটি পথ অনুসরণ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, যাকে এই বিশ্ব-জাহানের বহু সংখ্যক জিনিসের ওপরে কর্তৃত্ব খাটানোর ক্ষমতা দান করা হয়েছে এবং যে কুফরী বা ঈমানের পথ অনুসরণ করে এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে সারা জীবনভর সঠিক বা ভ্রান্ত পথে ব্যবহার করে নিজের দায়িত্বে অসংখ্য নেক কাজ বা অসংখ্য মন্দ কাজ করেছে তার সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ নিতান্তই অযৌক্তিক যে, তার এই ভাল কাজের কল্যাণকর দিক এবং মন্দ কাজের ক্ষতিকর দিক সবই নিষ্ফল ও পরিণামহীন থাকবে এবং তার এসব কাজের ভাল-মন্দ যাঁচাই বাছাই করার কোন অবকাশ কখনো

فَـَٔامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِيٓ أَنزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِـَٔايَاتِنَآ أُولَٰٓئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾

তাই ঈমান আন আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং সেই 'নূর' বা আলোর প্রতি যা আমি নাযিল করেছি।[১৮] আর তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত। (এ বিষয়ে তোমরা টের পাবে সেইদিন) যখন একত্র করার দিন তোমাদের সবাইকে তিনি একত্র করবেন।[১৯] সেদিনটি হবে তোমাদের পরস্পরের হার–জিতের দিন।[২০] যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করে[২১] আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহ মুছে ফেলবেন আর তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝরণা বইতে থাকবে। এসব লোক চিরস্থায়ীভাবে সেখানে থাকবে। এটাই বড় সফলতা আর যারা কুফরী করেছে এবং আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে[২২] তারাই দোযখের বাসিন্দা হবে। তারা চিরস্থায়ীভাবে সেখানে থাকবে। তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।

আসবে না। যে ব্যক্তি এ ধরনের অযৌক্তিক কথা বলে সে দু'টি নির্বুদ্ধিতার যে কোন একটির মধ্যে অবশ্যই নিমজ্জিত। হয় সে মনে করে যে, এই বিশ্ব–জাহান অবশ্যই যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মানুষের মত ক্ষমতা ও ইখতিয়ারসম্পন্ন সৃষ্টিকে এখানে দায়িত্বহীন করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অথবা সে মনে করে যে, এই বিশ্ব–জাহান এক খেয়ালী সৃষ্টি। এর সৃষ্টির পেছনে কোন জ্ঞানীর জ্ঞান ও কৌশল কাজ করেনি। প্রথম ক্ষেত্রে সে একটি পরস্পর বিরোধী কথা বলে। কারণ জ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর বিশ্ব–জাহানে ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সম্পন্ন একটি সৃষ্টির দায়িত্বহীন হওয়া সরাসরি ন্যায় ও যুক্তির পরিপন্থি। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে এর কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নির্দেশ করতে পারে না যে, একটি খেয়ালী ও অযৌক্তিকভাবে সৃষ্ট বিশ্ব–জাহানে মানুষের মত বুদ্ধিমান সৃষ্টির অস্তিত্ব লাভ করা কিভাবে সম্ভব হলো এবং তার মস্তিষ্কে ন্যায় ও ইনসাফের ধারণা কোত্থেকে এলো? নির্বুদ্ধিতার মধ্য থেকে বুদ্ধির উদ্ভব এবং ন্যায় ও সুবিচারহীন অবস্থা থেকে ন্যায়ের ধারণার উদ্ভব এমন এক ব্যাপার যা কেবল একজন হঠকারী ব্যক্তির পক্ষেই মেনে নেয়া সম্ভব কিংবা

সেই ব্যক্তির পক্ষেই মেনে নেয়া সম্ভব যে অতি মাত্রায় দর্শন কপচাতে কপচাতে মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

১৭. এটি আখেরাত সংঘটিত হওয়ার দ্বিতীয় প্রমাণ। প্রথম প্রমাণটি ছিল আখেরাতের আবশ্যকতা সম্পর্কে। কিন্তু এই প্রমাণটি তার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে। এ কথা স্পষ্ট যে, যে আল্লাহর পক্ষে বিশ্ব–জাহানের এত বড় একটা ব্যবস্থা বানানো অসম্ভব হয়নি এবং এই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করা যার জন্য অসম্ভব ও কঠিন নয়, তার পক্ষে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করে তাঁর সামনে হাজির করে হিসেব নেয়া কঠিন বা অসম্ভব হবে কেন?

১৮. অর্থাৎ এটাই বাস্তব ও সত্য এবং গোটা মানব ইতিহাসই যখন সাক্ষ দিচ্ছে যে, জাতিসমূহের ধ্বংসের মূল কারণ হচ্ছে নবী–রসূলদের কথা না মানা আর আখেরাতকে অস্বীকার করা তখন সেই ভুল নীতি ও পথ অনুসরণ করে নিজের দুর্ভাগ্য ডেকে আনার জন্য জিদ করো না এবং আল্লাহ, তাঁর রসূল ও কুরআনের পেশকৃত হিদায়াতের ওপর ঈমান আনো। এখানে পূর্বাপর বিষয় থেকে আপনা আপনি প্রকাশ পাচ্ছে যে, আল্লাহর নাযিলকৃত আলো অর্থ কুরআন। আলো যেমন নিজেই সমুজ্জল ও উদ্ভাসিত হয় এবং আশেপাশের অন্ধকারে ঢাকা সব জিনিসকে স্পষ্ট ও আলোকিত করে দেয় তেমনি কুরআন মজীদও এমন এক আলোকবর্তিকা যার সত্যতা আপনা থেকেই স্পষ্ট ও সমুজ্জল। মানুষের জ্ঞান–বুদ্ধির উপায়–উপকরণ ও মাধ্যম যেসব সমস্যা বুঝার জন্য যথেষ্ট নয় কুরআনের আলোকে মানুষ সেসব সমস্যা সহজেই বুঝতে পারে। যার কাছেই এ আলোকবর্তিকা থাকবে সে চিন্তা ও কর্মের অসংখ্য আঁকাবাঁকা পথের মধ্যেও ন্যায় ও সত্যের সোজা পথ স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। এই সরল সোজা পথের ওপর সে সারা জীবন এমনভাবে চলতে পারবে যে, প্রতি পদক্ষেপে সে জানতে পারবে যে, গোমরাহীর দিকে নিয়ে যাওয়ার মত ছোট ছোট পায়ে চলার পথ কোন কোন দিকে যাচ্ছে, ধ্বংসের গহ্বরসমূহ কোথায় কোথায় আসছে আর এসবের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার পথই বা কোন্‌টি তাও সে জানতে পারবে।

১৯. সমবেত হওয়ার দিন অর্থ কিয়ামতের দিন। আর সবাইকে একত্র করার অর্থ সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ জন্ম লাভ করেছে তাদের সবাইকে একই সময়ে জীবিত করে একত্রিত করা। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টি আরো খোলাসা করে বলা হয়েছে। যেমন ঃ সূরা হূদে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ –

"সেটি এমন এক দিন যেদিনে সব মানুষকে একত্রিত করা হবে। আর সেদিন যা কিছু হবে সবার চোখের সামনে হবে।" (আয়াত ১০৩)

সূরা ওয়াকেয়ায় বলা হয়েছে

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ –

"তাদের বলো, পূর্বে অতিবাহিত এবং পরে আগমনকারী সমস্ত মানুষকে একটি নির্দিষ্ট দিনে অবশ্যই একত্রিত করা হবে।" (আয়াত ৪৯, ৫০)

২০. মূল আয়াতে يوم التغابن শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির অর্থ এত ব্যাপক যে কোন ভাষারই একটি মাত্র শব্দে বা বাক্যে এর অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কুরআন মজীদের মধ্যেও কিয়ামতের যতগুলো নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে সম্ভবত এ নামটিই সর্বাধিক অর্থপূর্ণ। তাই এর অর্থ ও তাৎপর্য বুঝার জন্য কিছুটা ব্যাখ্যা অপরিহার্য।

تغابن শব্দটির উৎপত্তি عبن শব্দ থেকে। এর উচ্চারণ عبن এবং غبن উভয়ই। غبن উচ্চারণটি বেশীর ভাগ কেনাবেচা এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং غبن সিদ্ধান্ত ও মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আবার কোন কোন সময় এর বিপরীত অর্থ বুঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়। আরবী অভিধানে শব্দটির কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে যেমন ঃ غَبِنُوا خَبَرَ النَّاقَة "তাদের উট কোথায় গিয়েছে তার হদিস তাদের নেই।" غَبَنَ فُلَانًا فِى الْبَيْعِ "ক্রয়–বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সে অমুক ব্যক্তিকে ধোঁকা দিয়েছে।" غَبَنَ فُلَانًا "সে অমুক ব্যক্তিকে কম দিয়েছে।" غَبِنْتُ مِن حَقِّى عِندَ فُلَانٍ "অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ভুল হয়ে গিয়েছে।" غبين বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যার ধীশক্তির অভাব আছে এবং যার মতামত ও সিদ্ধান্ত দুর্বল। প্রতারিত ব্যক্তিকে مغبون বলা হয়। الغبن ، الغفلة ، النسيان ، فوت الحظ ، ان يبخس صاحبك فى معاملة بينك وبينه لضرب من الاخفاء –

"غبن" অর্থ "অসাবধানতা–অসতর্কতা, ভুল–ত্রুটি, নিজের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া, ব্যবসায়–বাণিজ্য ও পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির অপর কোন ব্যক্তির ক্ষতি করা।" ক্রয়–বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে ধোঁকা দিচ্ছে দেখে ইমাম হাসান বসরী (র) বললেন ঃ هذا يغبن عقلك "এ ব্যক্তি তোমাকে বোকা বানাচ্ছে।"

غبن ধাতু থেকে যখন تغابن শব্দ গঠন করা হয় তখন তাতে দুই বা দুইয়ের অধিক ব্যক্তির মধ্যে প্রতারণা বা ধোঁকাবাজি সংঘটিত হওয়ার অর্থ সৃষ্টি হয়। تَغَابَنَ الْقَوم অর্থ কিছু লোক কর্তৃক কিছু লোকের সাথে ধোঁকাবাজি বা প্রতারণার আচরণ করা। অথবা এক ব্যক্তি কর্তৃক আরেক ব্যক্তির ক্ষতি করা এবং অপর ব্যক্তির তার হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অথবা একজনের অংশ অন্যজনের পেয়ে যাওয়া এবং নিজের অংশ থেকে সেই ব্যক্তির বঞ্চিত থেকে যাওয়া অথবা ব্যবসায়ে এক পক্ষের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং অপর পক্ষের মুনাফা অর্জন করা অথবা কিছু লোকের অপর কিছু লোকের অসতর্ক বা দুর্বল মতামত ও সিদ্ধান্তের অধিকারী হওয়া।

এই প্রেক্ষাপটে এখন এই বিষয়টি চিন্তা করে দেখুন যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামত সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ ذلك يوم التغابن "সেটি হবে تغابن –এর দিন"। এ বাক্য থেকে স্বতঃই এ অর্থ প্রকাশ পায় যে, পৃথিবীতে তো রাতদিন হরহামেশা تغابن হচ্ছেই। কিন্তু তা কেবল বাহ্যিক ও দৃষ্টি প্রলুব্ধকারী تغابن প্রকৃত ও বাস্তব تغابن নয়। প্রকৃত تغابن হবে কিয়ামতের দিন। সেখানে যাওয়ার পর জানা যাবে কে সত্যি সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কে লাভবান হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কে কার অংশ লাভ করেছে আর কে তার নিজের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কে ধোঁকায় পড়েছে আর কে অত্যন্ত সতর্ক ও বিচক্ষণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কে তার জীবন রূপ পুঁজির সবটাই একটা ভুল কারবারে বিনিয়োগ করে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে এবং কে তার সব

শক্তি, যোগ্যতা, চেষ্টা–সাধনা, অর্থ–সম্পদ আর সময়কে লাভজনক কারবারে খাটিয়ে সবটুকু মুনাফা লুটে নিয়েছে। অথচ প্রথমোক্ত ব্যক্তি যদি পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা বুঝার ব্যাপারে ধোঁকায় না পড়তো তাহলে সেও ঐ রকম মুনাফা অর্জন করতে পারতো।

মুফাস্সিরগণ يوم التغابن কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এসব অর্থের সবগুলোই যথার্থ ও সঠিক এবং তা এর প্রকৃত অর্থের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করে। কোন কোন মুফাস্সির এর অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন যে, দোযখীরা জান্নাতের বাসিন্দাদের মত কাজ–কর্ম করে জান্নাতে গেলে সেখানে তারা যে অংশ লাভ করতো সেদিন তা জান্নাতবাসীগণ লাভ করবে। আর জান্নাতবাসীগণ যদি দুনিয়ায় দোযখীদের মত কাজকর্ম করে আসতেন তাহলে দোযখের যে অংশ তারা পেতেন তা সেদিন দোযখীদের অংশে পড়বে। ইমাম বুখারী (র) বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে কিতাবুর রিকাক অধ্যায়ে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটি এ ব্যাখ্যার সমর্থন করে। উক্ত হাদীসে নবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তিই জান্নাতে যাবে তাকে সেই জায়গাটা দেখানো হবে, দুনিয়ায় খারাপ কাজকর্ম করে গেলে যা সে দোযখে পেতো। উদ্দেশ্য যাতে সে আরো বেশী 'শোকর গুজার' বা কৃতজ্ঞ হয়। আর যে ব্যক্তিই দোযখে যাবে তাকেও বেহেশতের সেই স্থানটি দেখানো হবে যা সে দুনিয়ায় ভাল কাজ করে আসলে লাভ করতো। যাতে সে আরো বেশী অনুতপ্ত হয়।

অপর কিছু সংখ্যক মুফাস্সির বলেন, সেদিন অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারীর ততটা নেকী ছিনিয়ে নেবে যতটা তার অত্যাচারের সমান হবে। কিংবা অত্যাচারিতের ঠিক ততটা গোনাহ অত্যাচারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে যা তার হক বা অধিকারের সমান হবে। কারণ কিয়ামতের দিন কারো কাছে কোন প্রকার অর্থ–সম্পদ বা সোনা–রূপা থাকবে না যা দিয়ে সে অত্যাচারিতকে ক্ষতিপূরণ দেবে বা জরিমানা আদায় করবে। মানুষের আমলসমূহই হবে সেখানে একমাত্র বিনিময়যোগ্য মুদ্রা। এ কারণে যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কারো প্রতি জুলুম করেছে সে মজলুমের অধিকার কেবল এভাবে আদায় করতে পারবে যে, তার নিজের যতটুকু নেকী আছে তা থেকেই আর্থিক দণ্ড দেবে অথবা মজলুমের গোনাহর কিছু অংশ নিজের ওপর চাপিয়ে নিয়ে তার দণ্ড ভোগ করবে। কিছু সংখ্যক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম থেকে এ বিষয়টিও বর্ণিত হয়েছে। বুখারী হাদীস গ্রন্থের কিতাবুর রিকাকে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিই কাউকে জুলুম করে তার গোনাহর বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে রেখেছে তার উচিত এ পৃথিবীতে অবস্থানকালেই তা থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া। কারণ আখেরাতে টাকা পয়সা বা অর্থ–সম্পদের কোন কারবার থাকবে না। সেখানে তার নেকী থেকে মজলুমকে দেয়া হবে। অথবা তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে নেকীও যদি না থাকে তাহলে মজলুমের কিছু গোনাহ তার ওপর অর্পণ করা হবে। অনুরূপ মসনাদে আহমাদে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উনায়েস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জান্নাতবাসী জান্নাতে যেতে পারবে না এবং কোন দোযখবাসী দোযখে যাবে না যতক্ষণ না সে দুনিয়ায় কারো ওপর তার কৃত জুলুমের বদলা বা ক্ষতিপূরণ দেবে। এমনকি একটি থাপ্পড়ের ক্ষতিপূরণ পর্যন্তও দিতে হবে। "আমরা বললাম, এই ক্ষতিপূরণ কিভাবে দেয়া হবে? কেননা কিয়ামতের দিন তো আমরা নিস্ব ও

নিসম্বল থাকবো।" নবী (সা) বললেন ঃ নিজের আমলের নেক কাজ ও বদ কাজ দ্বারা এই ক্ষতিপূরণ করতে হবে। মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার নবী (সা) তাঁর মজলিসে লোকদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ দরিদ্র এবং অভাবী কে তা কি তোমরা জান? লোকজন বলে উঠল, আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই দরিদ্র যার অর্থ-সম্পদ কিছুই নেই। তিনি বললেন ঃ "আমার উম্মাতের মধ্যে দরিদ্র হলো সেই ব্যক্তি যে নামায, রোযা ও যাকাত আদায় করে কিয়ামতের দিন হাজির হবে। কিন্তু এমন অবস্থায় হাজির হবে যে দুনিয়ায় কাউকে গালি দিয়েছিল, কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করেছিল, কারো অর্থ-সম্পদ মেরে খেয়েছিল, কারো রক্তপাত ঘটিয়েছিল এবং কাউকে মারপিট করে এসেছিল। সুতরাং তার নেকীসমূহ নিয়ে ঐ সব অত্যাচারিতদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে।" কিন্তু তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য যখন তার কোন নেকী আর অবশিষ্ট থাকবে না তখন তাদের কিছু কিছু গোনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে এবং তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। মুসলিম ও আবু দাউদ হযরত বুরাইদা থেকে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে আছে, নবী (সা) বলেছেন ঃ "কোন জিহাদকারীর অনুপস্থিতিতে কেউ যদি তার স্ত্রী ও পরিবারের লোকদের ব্যাপারে খিয়ানত বা বিশ্বাস ভংগ করে তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে ঐ মুজাহিদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলা হবে, তার ভাল কাজের যতটা ইচ্ছা তুমি নিয়ে নাও।" এরপর নবী (সা) আমাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ "এ ব্যাপারে তোমরা কি মনে করো? অর্থাৎ তোমরা কি মনে করো যে, এরপর সে তার জন্য কোন নেক কাজ অবশিষ্ট রাখবে?"

আরো কিছু সংখ্যক মুফাস্সির বলেছেন যে, تغابن শব্দটি বেশীর ভাগ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর কাফের ও মু'মিনগণ তাদের দুনিয়ার জীবনে যে আচরণ ও নীতি অনুসরণ করে থাকে কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে সেই আচরণকে তেজারত বা ব্যবসায়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মু'মিন যদি নাফরমানির পথ পরিত্যাগ করে আনুগত্যের পথ অনুসরণ করে এবং নিজের জানমাল ও চেষ্টা-সাধনা আল্লাহর পথে নিয়োজিত করে তাহলে সে যেন লোকসানজনক ব্যবসায় ছেড়ে এমন এক ব্যবসায়ে তার পুঁজি খাটাচ্ছে যা অবশেষে লাভজনক হবে এবং মুনাফা দেবে। আর একজন কাফের যখন আনুগত্যের পথ বর্জন করে নাফরমানি ও বিদ্রোহের পথে নিজের সবকিছু নিয়োজিত করে তখন সে এমন একজন ব্যবসায়ীর মত হয়ে যায়, যে হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করে। পরিণামে সে এর লোকসান ভোগ করবে। এই উভয় কাজের লাভক্ষতি কেবল কিয়ামতের দিনই প্রকাশ পাবে। দুনিয়ার জীবনে মু'মিন হয়তো কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে এবং কাফের বিপুলভাবে লাভবান হতে থাকবে। কিন্তু আখেরাতে জানা যাবে সত্যিকার অর্থে লাভজনক কারবার কে করেছে আর ক্ষতিকর কারবার কে করেছে। কুরআন মজীদে বহু সংখ্যক স্থানে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নবর্ণিত আয়াতগুলো দেখুন, আল বাকারাহ, আয়াত ১৬, ১৭৫, ২০৭; আলে ইমরান, আয়াত ৭৭, ১৭৭; আন নিসা, ৭৪; আত তাওবা, ১১১; আন নাহল, ৯৫; ফাতের, ২৯; আস সাফ, ১০।

تغابن বা হারজিতের আরো একটি অবস্থা হলো, মানুষ পৃথিবীতে কুফরী, পাপাচার এবং জুলুম ও নাফরমানির কাজে একান্ত নির্বিকারচিত্তে পরস্পরকে সহযোগিতা করে আসছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালবাসা এবং বন্ধুত্ব আছে বলেও তাদের আস্থা

রয়েছে। চরিত্রহীন পরিবারের লোকজন, গোমরাহী বিস্তারকারী নেতৃবর্গ ও তাদের অনুসারীরা, চোর ও ডাকাতদের দল, ঘুষখোর ও জালেম কর্মচারীদের গাঁটছড়া বাঁধা, বেঈমান ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং জমিদার গোষ্ঠী, গোমরাহী, দুষ্কর্ম ও নোংরামির প্রসারকামী দলসমূহ এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আকারে জুলুম ও বিপর্যয়ের ঝাণ্ডাবাহী সরকার ও জাতিসমূহের সবারই পারস্পরিক যোগসাজশ এই আস্থার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। তাদের প্রত্যেকের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তিরা মনে করে তারা একে অপরের নির্ভরযোগ্য বন্ধু এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত কার্যকর সহযোগিতা বিদ্যমান। কিন্তু তারা যখন আখেরাতে পৌছবে তখন অকস্মাৎ এ বিষয়টি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তারা সবাই মারাত্মকভাবে প্রতারিত হয়েছে। তখন প্রত্যেকেই একথা উপলব্ধি করবে যে, যাকে সে তার সর্বোত্তম বাপ, ভাই, স্ত্রী, স্বামী, ছেলে, মেয়ে, বন্ধু, নেতা, পীর, মুরীদ অথবা সহযোগী ও সাহায্যকারী মনে করে আসছিল প্রকৃতপক্ষে তারা সবাই তার জঘন্যতম শত্রু। সব রকমের আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, সম্পর্ক ও ভালবাসা শত্রুতায় পর্যবসিত হবে। সবাই একে অপরকে গালি দিতে থাকবে, একে অপরকে লানত করতে থাকবে। আর প্রত্যেকেই তার কৃত অপরাধের বেশীর ভাগ দায়–দায়িত্ব অপরের ওপর চাপিয়ে তাকে কঠোরতর শাস্তি দিতে চাইবে। এ কথাটিও কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। নীচে উল্লেখিত আয়াতসমূহে এর কিছু উদাহরণ দেখা যেতে পারে। আল বাকারাহ, ১৬৭; আল আ'রাফ, ৩৭ থেকে ৩৯; ইবরাহীম, ২১—২২; আল মু'মিন, ১০১; আল আনকাবূত, ১২—১৩, ২৫; লোকমান, ৩৩; আল আহযাব, ৬৭—৬৮; সাবা, ৩১ থেকে ৩৩; ফাতের, ১৮; আস সাফ্‌ফাত, ২৭ থেকে ৩৩; সাদ, ৫৯ থেকে ৬১; হামীম আস সাজদা, ২৯; আয্ যুখরুফ, ৬৭; আদ দুখান, ৪১; আল মা'আরিজ, ১০ থেকে ১৪; আবাসা, ৩৪ থেকে ৩৭।

২১. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ শুধু এ কথা মেনে নেয়া নয় যে, আল্লাহ আছেন। বরং তার অর্থ হলো আল্লাহ নিজে, তাঁর রসূল এবং কিতাবের মাধ্যমে যেভাবে ঈমান আনতে বলেছেন সেভাবে ঈমান আনা। এর মধ্যে রিসালাত ও কিতাবের প্রতি ঈমান আনাও আপনা থেকেই অন্তরভুক্ত। একইভাবে মানুষ যে কাজকে নেকীর কাজ মনে করে অথবা মানুষের নিজের গড়ে নেয়া নৈতিক মানদণ্ড অনুসারে যেসব কাজ করে, নেকীর কাজ বলতে সেসব কাজকেও বুঝায় না। বরং এর দ্বারা বুঝায় এমন সব কাজ–কর্ম যা আল্লাহর দেয়া আইন মোতাবেক করা হয়। তাই পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব শুভ ফলাফল ও পরিণামের কথা বলা হয়েছে রসূল ও কিতাবের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহকে মানার ও নেক কাজ করার ফলাফল এবং পরিণামও তাই হবে কারো এমন ভুল ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। যে ব্যক্তিই বুঝে শুনে কুরআন অধ্যয়ন করবে তার কাছে এ বিষয়টি গোপন থাকবে না যে, কুরআনের দৃষ্টিতে এ ধরনের কোন ঈমানের নাম আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং কোন কাজের নাম নেক কাজ আদৌ নয়।

২২. কুফরী বলতে কি বুঝায়? এ কথাটিই তা স্পষ্ট করে দেয়। আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহকে আল্লাহর আয়াত বলে না মানা, ঐ আয়াতসমূহে যেসব সত্য তুলে ধরা হয়েছে তা স্বীকার না করা এবং তার মধ্যে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা অস্বীকার ও অমান্য করাই হচ্ছে কুফরী। এরই ফলাফল ও পরিণাম পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে।

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَـٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٢﴾ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

২ রুকূ'

আল্লাহর[২৩] অনুমোদন ছাড়া কখনো কোন মুসিবত আসে না[২৪]। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে আল্লাহ তার দিলকে হিদায়াত দান করেন।[২৫] আল্লাহ সব কিছু জানেন।[২৬] আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসূলের আনুগত্য করো। কিন্তু তোমরা যদি আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে সত্যকে স্পষ্টভাবে পৌছিয়ে দেয়া ছাড়া আমার রসূলের আর কোন দায়িত্ব নেই।[২৭] তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। ঈমানদারদের আল্লাহর ওপরেই ভরসা করা উচিত।[২৮]

২৩. এখান থেকে ঈমানদারদের উদ্দেশ করে কথা বলা হয়েছে। এ পর্যায়ে কথাগুলো পড়ার সময় একথা মনে রাখতে হবে যে, এসব আয়াত যে সময়ে নাযিল হয়েছিল তা ছিল মুসলমানদের কঠোর বিপদ ও দুঃখের সময়। তারা মক্কায় বছরের পর বছর জুলুম–অত্যাচার সহ্য করার পর নিজেদের সবকিছু ছেড়ে মদীনায় চলে এসেছিলেন। যেসব ন্যায় ও সত্যপন্থী লোক তাদেরকে মদীনায় আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদের ওপরও দ্বিগুণ মুসিবত আপতিত হয়েছিল। একদিকে তাদেরকে আরবের বিভিন্ন অংশ থেকে তাদের কাছে চলে আসা শত শত মুহাজিরকে সহায়তা দিতে হচ্ছিল। অপরদিকে ইসলামের শত্রু সমগ্র আরবের লোকজন তাদের ওপর নিপীড়ন চালাতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল।

২৪. এ বিষয়টি সূরা আল হাদীদের ২২—২৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেখানে ৩৯ থেকে ৪২ নম্বর টীকায় আমরা এর ব্যাখ্যাও পেশ করেছি। যে পরিস্থিতিতে এবং যে উদ্দেশ্যে সেখানে এ কথাটি বলা হয়েছিল ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতিতে একই উদ্দেশ্যে এখানেও তা পুনরায় বলা হয়েছে। এখানে যে সত্যটি মুসলমানদের হৃদয় মনে বদ্ধমূল করে দেয়া উদ্দেশ্য তা হচ্ছে, বিপদ–আপদ নিজেই আসে না। আর পৃথিবীতে কারো এমন শক্তিও নেই যে, সে যার ওপরে ইচ্ছা কোন বিপদ চাপিয়ে দেবে। কারো ওপর কোন বিপদ আসতে দেয়া না দেয়া সরাসরি আল্লাহর অনুমোদনের ওপর নির্ভর করে। আল্লাহর অনুমোদন সর্বাবস্থায় কোন না কোন বৃহত্তর কল্যাণ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে হয় যা মানুষ জানে না বা বুঝে উঠতে পারে না।

২৫. অর্থাৎ বিপদ–আপদের ঘনঘটার মধ্যেও যে জিনিস মানুষকে সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতে পদস্খলন হতে দেয় না সেই একমাত্র জিনিসটি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান। যার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান নেই সে এসব বিপদ–আপদকে হয় আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল মনে করে অথবা এসব বিপদ–আপদ দেয়ার ও দূর করার ব্যাপারে পার্থিব শক্তিসমূহকে কার্যকর বলে বিশ্বাস করে কিংবা সেসবকে এমন কাল্পনিক শক্তিসমূহের কাজ বলে মনে করে যাদেরকে মানুষের কুসংস্কারজনিত বিশ্বাস ক্ষতি ও কল্যাণ করতে সক্ষম বলে ধরে নিয়েছে অথবা তারা আল্লাহকে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী বলে নিখাদ ও নির্ভেজাল ঈমানের সাথে মানে না। ভিন্ন ভিন্ন এসব ক্ষেত্র ও পরিস্থিতিতে মানুষ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত সে বিপদ–আপদ বরদাশত করে বটে কিন্তু তার পরেই সে পরাজয় স্বীকার করে নেয়। তখন সেসব আস্তানায়ই মাথা নত করে, সব রকম অপমান ও লাঞ্ছনা স্বীকার করে নেয়। এ সময় সে যে কোন হীন কাজ ও আচরণ করতে পারে। সব রকম ভ্রান্ত কাজ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। আল্লাহকে গালি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এমন কি আত্মহত্যা পর্যন্ত করে বসে। অপরদিকে যে ব্যক্তি একথা জানে এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলার হাতেই সবকিছু। তিনিই এই বিশ্ব–জাহানের মালিক ও শাসক। তাঁর অনুমোদনক্রমেই বিপদ–মসিবত আসতে এবং দূরীভূত হতে পারে। এই ব্যক্তির মনকে আল্লাহ তা'আলা ধৈর্য ও আনুগত্য এবং তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার 'তাওফীক' দান করেন। তাকে সাহস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে সব রকম পরিস্থিতির মোকাবেলা করার শক্তি দান করেন। অন্ধকার থেকে অন্ধকারতর পরিস্থিতিতেও তার সামনে আল্লাহর দয়া ও করুণা লাভের আশার আলো প্রজ্জ্বলিত থাকে। অতি বড় কোন বিপদও তাকে এতটা সাহসহারা করতে পারে না যে, সে সত্য ও সঠিক পথ থেকে সরে যাবে বা বাতিলের সামনে মাথা নত করবে কিংবা আল্লাহ ছাড়া আর কারো দরবারে তার দুঃখ–বেদনার দাওয়াই বা প্রতিকার তালাশ করবে। এভাবে প্রতিটি বিপদ মসিবতই তার জন্যে অধিক কল্যাণের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে কোন মসিবতই তার জন্য মসিবত থাকে না বরং পরিণামের দিক থেকে সরাসরি রহমতে পরিণত হয়। কেননা সে এই মসিবতে নিঃশেষ হয়ে যাক বা সফলভাবে উৎরিয়ে যাক—উভয় অবস্থায়ই সে তার প্রভুর দেয়া পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এ বিষয়টিই বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ ، لاَيَقْضِى اللّٰهُ لَهُ قَضَاءً اِلاَّ كَانَ خَيْرًا لَهُ ، اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَاِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَلَيْسَ ذَالِكَ لاَحَدٍ اِلاَّ الْمُؤْمِنِ –

"মু'মিনের ব্যাপারটিই বড় অদ্ভুত। আল্লাহ তার জন্য যে ফায়সালাই করুন না কেন তা সর্বাবস্থায় তার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে। বিপদ–আপদে সে ধৈর্য অবলম্বন করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর। সুখ–শান্তি ও সচ্ছলতা আসলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া আর কারো ভাগ্যেই এরূপ হয় না।"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

হে সেই সব লোক যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। আর যদি তোমরা ক্ষমা ও সহনশীলতার আচরণ করো এবং ক্ষমা করে দাও তাহলে আল্লাহ অতিব ক্ষমাশীল, অতিব দয়ালু।[২৯] তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি একটি পরীক্ষা। আর কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে আছে বিরাট প্রতিদান।[৩০]

২৬. পূর্বাপর প্রসংগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা জানেন কোন ব্যক্তি প্রকৃতই ঈমানদার এবং সে কিরূপ ঈমানের অধিকারী? তাই তিনি তার জ্ঞানের ভিত্তিতে সেই সব হৃদয়মনের অধিকারীকে হিদায়াত দান করেন যার মধ্যে ঈমান আছে এবং তার মধ্যে যে মর্যাদার ও প্রকৃতির ঈমান আছে সেই পর্যায়ের হিদায়াত তাকে দান করেন। অপর অর্থটি এও হতে পারে যে, আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দার অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত নন। তিনি তাকে ঈমান গ্রহণের আহবান জানিয়ে এবং ঈমান গ্রহণের সাথে দুনিয়ার কঠিন পরীক্ষাসমূহের মধ্যে ফেলে দিয়ে তাদেরকে ঐ অবস্থায়ই পরিত্যাগ করেননি। পৃথিবীতে কোন ঈমানদারের ওপর কি মসিবত চলছে আর কোন কোন পরিস্থিতিতে সে কিভাবে তার ঈমানের দাবীসমূহ পূরণ করছে তা তিনি জানেন। তাই এ বিষয়ে আস্থা রাখো যে, আল্লাহর অনুমোদনক্রমে যে মসিবতই তোমাদের ওপর আসুক না কেন আল্লাহর কাছে তার বৃহত্তর কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে এবং তার মধ্যে বৃহত্তর কোন কল্যাণ লুক্কায়িত আছে। কেননা, আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দার কল্যাণকামী। তিনি তাদেরকে বিনা কারণে বিপদে ফেলতে চান না।

২৭. এখানে এ কথার অর্থ হলো, অবস্থা ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে কিন্তু বিপদের ঘনঘটায় ঘাবড়ে গিয়ে যদি তোমরা আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে কেবল নিজেরই ক্ষতি করবে আমার রসূলের দায়িত্ব শুধু তোমাদেরকে ঠিকমত সত্য ও সঠিক পথটির সন্ধান বলে দেয়া। আর রসূল সে কাজটি ভালভাবেই করেছেন।

২৮. অর্থাৎ খোদায়ীর সর্বময় ক্ষমতা ও ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে। এই ক্ষমতা ও ইখতিয়ার অন্য কারো আদৌ নেই। তাই সে তোমাদের জন্য ভাল বা মন্দ ভাগ্য গড়তে পারে না। তিনি আনলেই কেবল সুসময় আসতে পারে এবং তিনি দূর করলেই কেবল দুঃসময় দূর হতে পারে। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহকে মনে প্রাণে একমাত্র ইলাহ বলে স্বীকার করে সে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এবং একজন ঈমানদার হিসেবে

এই বিশ্বাস রেখে দুনিয়াতে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে থাকবে যে, আল্লাহ যে পথ দেখিয়েছেন কেবল সে পথেই কল্যাণ নিহিত। এ ছাড়া তার জন্য আর কোন পথ নেই। এ পথে সফলতা লাভ হলে তা আল্লাহর সাহায্য, সহযোগিতা ও তাওফিকের মাধ্যমেই হবে ; অপর কোন শক্তির সাহায্যে তা হওয়ার নয়। আর এ পথে যদি কঠোর পরিস্থিতি, বিপদাপদ, ভয়ভীতি ও ধ্বংস আসে তাহলে তা থেকেও কেবল তিনিই রক্ষা করতে পারেন, অন্য কেউ নয়।

২৯. এ আয়াতের দু'টি অর্থ। একটি অর্থ অনুসারে আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে বহুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষকে তাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে, স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীদের পক্ষ থেকে এবং পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে যেসব কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় সেই সব পরিস্থিতির ক্ষেত্রে এ আয়াতটি প্রযোজ্য। ঈমান ও সত্য সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে একে অপরের পুরোপুরি বন্ধু ও সহযোগী হতে পারে একজন স্বামীর এরূপ স্ত্রী, একজন স্ত্রীর এরূপ স্বামী লাভ করা এবং আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক ও চরিত্রের দিক দিয়ে সকল সন্তান-সন্ততিই চোখ জুড়ানোর মত হওয়া পৃথিবীতে খুব কমই ঘটে থাকে। বরং সাধারণত দেখা যায় যে, স্বামী যদি নেক্কার ও ঈমানদার হয় তাহলে সে এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি লাভ করে থাকে যারা তার দীনদারী, আমানতদারী এবং সততাকে নিজেদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করে। তারা চায় যে, তাদের স্বামী ও পিতা তাদের জন্য জাহান্নাম খরিদ করুক এবং হালাল ও হারামের বাছবিচার না করে যে কোন পন্থায় আরাম-আয়েশ, আমোদ-ফূর্তি এবং গোনাহ ও পাপের উপকরণ এনে দিক। কোন কোন সময় আবার এর ঠিক উল্টোটাও ঘটে থাকে। একজন নেক্কার ঈমানদার নারীকে এমন স্বামীর পাল্লায় পড়তে হয় যে স্ত্রীর শরীয়াত অনুসারে জীবন যাপন দুই চোখে দেখতে পারে না। আর সন্তানরাও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের গোমরাহী ও দুষ্কর্ম দ্বারা মায়ের জীবনকে অতিষ্ট করে তোলে। বিশেষ করে কুফর ও ঈমানের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সময় যখন একজন মানুষের ঈমান দাবী করে যে, আল্লাহ এবং তাঁর দীনের জন্য সে ক্ষতি স্বীকার করবে, দেশ ছেড়ে হিজরাত করবে কিংবা জিহাদে অংশগ্রহণ করে নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করবে, তখন তার পথে তার স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনই সর্বপ্রথম বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সময় বিপুল সংখ্যক মুসলমানের জন্য যে বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছিল এবং কোন অমুসলিম সমাজে ইসলাম গ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তির জন্য আজও দেখা দেয় এ আয়াতটির দ্বিতীয় অর্থটি সেই বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। সেই সময় মক্কা মুয়ায্যমা ও আরবের অন্যান্য অংশে সাধারণভাবে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতো যে, একজন লোক ঈমান এনেছে কিন্তু তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা ঈমান আনতে প্রস্তুত নয় শুধু তাই না বরং তারা তাকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সচেষ্ট। যেসব মেয়েরা তাদের পরিবারে একাকী ইসলাম গ্রহণ করত। তাদের জন্যও ঠিক একই পরিস্থিতির উদ্ভব হতো।

যেসব ঈমানদার নারী ও পুরুষ এ দু'টি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন তাদের উদ্দেশ করে তিনটি কথা বলা হয়েছে ঃ

সর্বপ্রথম তাদের এই বলে সাবধান করা হয়েছে যে, পার্থিব সম্পর্কের দিক দিয়ে যদিও তারা মানুষের অতি প্রিয়জন কিন্তু দীন ও আদর্শের দিক দিয়ে এরা তোমাদের 'দুশমন'। তারা তোমাদের সৎকাজে বাধা দেয় এবং অসৎকাজের প্রতি আকৃষ্ট করে, কিংবা তোমাদের ঈমানের পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং কুফরীর পথে সহযোগিতা করে কিংবা তারা কাফেরদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে মুসলমানদের সামরিক গোপন তথ্য সম্পর্কে তারা তোমাদের নিকট থেকে যাই জানতে পারে তা ইসলামের শত্রুদের কাছে পৌছিয়ে দেয়। এর যে কোন পন্থায়ই তারা দুশমনী করুক না কেন তাতে দুশমনীর ধরন ও প্রকৃতিতে অবশ্যই পার্থক্য হয়। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই তা দুশমনী। ঈমান যদি তোমাদের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে সেই বিচারে তাদেরকে দুশমনই মনে করতে হবে। তাদের ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে এ বিষয়টি কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তোমাদের ও তাদের মধ্যে ঈমান ও কুফর বা আনুগত্য ও অবাধ্যতার প্রাচীর আড়াল করে আছে।

এরপর বলা হয়েছে যে, তাদের ব্যাপারে সাবধান থাক। অর্থাৎ তাদের পার্থিব স্বার্থের জন্য নিজেদের পরিণাম তথা আখেরাতকে বরবাদ করো না। তোমাদের অন্তরে তাদের প্রতি ভালবাসাকে এতটা প্রবল হতে দিও না যে, তারা আল্লাহ ও রসূলের সাথে তোমাদের সম্পর্ক এবং ইসলামের প্রতি তোমাদের বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের প্রতি এতটা বিশ্বাস ও আস্থা রেখো না যাতে তোমাদের অসাবধানতার কারণে মুসলমানদের দলের গোপনীয় বিষয়সমূহ তারা অবগত হয়ে যেতে পারে এবং তা দুশমনদের হাতে পৌছে যায়। একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে এ বিষয়টি সম্পর্কেই সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে,

يُؤْتَى بِرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُقَالُ اَكَلَ عِيَالُهُ حَسَنَاتَهُ -

"কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে। বলা হবে, তার সন্তান-সন্ততিরা তার সব নেকী ধ্বংস করে ফেলেছে।"

সর্বশেষে বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতা দেখাও এবং ক্ষমা করে দাও তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। এর অর্থ হলো, তাদের শত্রুতা সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা হচ্ছে শুধু এই জন্য যে, তোমরা সতর্ক থাকবে এবং নিজেদের আদর্শকে তাদের থেকে রক্ষা করার চিন্তা-ভাবনা করবে। এই সতর্কীকরণের অর্থ কখনো এ নয় যে, যা করতে বলা হলো তার চেয়ে আরো অগ্রসর হয়ে তোমরা স্ত্রী ও সন্তানদের মারতে শুরু করবে অথবা তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করবে অথবা সম্পর্ক এমন তিক্ত করে তুলবে যে, তোমাদের এবং তাদের পারিবারিক জীবন আযাবে পরিণত হবে। কারণ এরূপ করার দু'টি স্পষ্ট ক্ষতি আছে। একটি হলো, এভাবে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সংশোধনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। দ্বিতীয়টি হলো, এভাবে সমাজে ইসলামের বিরুদ্ধে উল্টা খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া এভাবে আশেপাশের লোকদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের আখলাক ও চরিত্রের এমন একটি চিত্র ভেসে ওঠে যাতে তারা মনে করতে শুধু করে যে, ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে সে নিজের ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য পর্যন্ত কঠোর ও বদমেজাজী হয়ে যায়।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۶﴾ اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۷﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۸﴾

তাই যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করে চলো।[৩১] শোন, আনুগত্য করো এবং নিজেদের সম্পদ ব্যয় করো। এটা তোমাদের জন্যই ভাল। যে মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থাকলো সেই সফলতা লাভ করবে।[৩২] যদি তোমরা আল্লাহকে করযে হাসানা দাও তাহলে তিনি তোমাদেরকে তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন[৩৩] এবং তোমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ সঠিক মূল্যায়ণকারী ও অতিব সহনশীল।[৩৪] সামনে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

এ প্রসংগে এ কথাটিও মনে রাখা উচিত যে, ইসলামের প্রথম যুগে মানুষ যখন সবেমাত্র মুসলমান হতো এবং যদি তাদের পিতামাতা কাফেরই থেকে যেত তাহলে একটি সমস্যা দেখা দিত এই যে, তারা তাদের সন্তানদেরকে নতুন দীন পরিত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করত। তাদের জন্য আরো একটি সমস্যা দেখা দিত তখন যখন তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা (কিংবা মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের স্বামী এবং সন্তানরা) কুফরকেই আঁকড়ে ধরে থাকত এবং সত্য দীনের পথ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করত। প্রথমোক্ত পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য সূরা আনকাবূতের (১৮ আয়াত) এবং সূরা লোকমান (১৪ ও ১৫ আয়াত)–এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, দীনের ব্যাপারে কখনো পিতামাতার কথা অনুসরণ করবে না। তবে পার্থিব ব্যাপারে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। এখানে দ্বিতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, নিজের দীনকে নিজের সন্তান–সন্ততির হাত থেকে রক্ষা করার চিন্তা অবশ্যই করবে কিন্তু তাই বলে তাদের সাথে কঠোর আচরণ করবে না। বরং নমনীয় আচরণ করো এবং ক্ষমা ও উদারতা দেখাও। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আত্ তাওবা, আয়াত ২৩, ২৪; আল মুজাদালা, টীকা ৩৭; আল মুমতাহিনা, টীকা ১ থেকে ৩; আল মুনাফিকূন, টীকা ১৮)।

৩০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আনফাল, টীকা ২৩। এ ক্ষেত্রে তাবারানী হযরত আবু মালেক আশ'আরী (রা) থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটিও মনে রাখা দরকার। তিনি বলেছেন ঃ "তুমি যে শত্রুকে হত্যা করতে পারার কারণে সফল হলে কিংবা সে তোমাকে হত্যা করলে

তুমি জান্নাত লাভ করলে সে তোমার আসল শত্রু নয়। বরং তোমার ঔরষজাত সন্তানই হয়তো তোমার আসল শত্রু। এরপর তোমার শত্রু হচ্ছে তোমার মালিকানাধীন অর্থ–সম্পদ।" তাই এখানে এবং সূরা আনফালে উভয় জায়গাতেই বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা অর্থ–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততির ফিতনা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পার এবং আল্লাহর প্রতি ভালবাসাকে তাদের প্রতি ভালবাসার ওপর প্রাধান্য দিতে সক্ষম হও তাহলে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে।

৩১. কুরআন মজীদে এক স্থানে বলা হয়েছে اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ "আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় কর।" (আলে ইমরান, ১০২) অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا "আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেন না।" (আল বাকারাহ, ২৮৬) এখানে বলা হচ্ছে, সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। এ তিনটি আয়াতের বিষয়বস্তু এক সাথে মিলিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায়, প্রথম আয়াতে আমাদের সামনে একটি মানদণ্ড পেশ করা হয়েছে সেখানে পৌঁছার জন্য প্রত্যেক মু'মিনের চেষ্টা করা উচিত। দ্বিতীয় আয়াত আমাদেরকে এই মৌলিক নীতি অবহিত করছে যে, কোন ব্যক্তির নিকট থেকেই তার সাধ্যাতীত কোন কাজ দাবী করা হয়নি। বরং আল্লাহর দীনের অধীনে মানুষ ততটুকুই করার জন্য আদিষ্ট যা করার সামর্থ তার আছে। আর এ আয়াতটি প্রত্যেক ঈমানদারকে এ মর্মে পথনির্দেশনা দিচ্ছে যে, সে যেন সাধ্যানুসারে তাকওয়ার পথ অনুসরণে কোন ত্রুটি না করে। তার পক্ষে যতটা সম্ভব আল্লাহর হুকুম আহকাম পালন করা এবং তাঁর নাফরমানী থেকে দূরে থাকা কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে সে যদি অলসতা করে তাহলে পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। তবে যে জিনিস তার সাধ্যের অতীত (অবশ্য কোন জিনিস তার সাধ্যের অতীত তার ফায়সালা আল্লাহই ভালভাবে করতে পারেন) সে বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

৩২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল হাশর, টীকা ১৯।

৩৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, টীকা ২৬৭; আল মায়েদা, টীকা ৩৩; আল হাদীদ, টীকা ১৬।

৩৪. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ফাতির, টীকা ৫২—৫৯; আশ শূরা, টীকা ৪২।

আত তালাক

৬৫

নামকরণ

এ সূরার নামই শুধু الطلاق নয়, বরং এটি এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কারণ এর মধ্যে কেবল তালাকের হুকুম আহকামই বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস একে সূরা النساء القصرى অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত সূরা নিসা বলে অভিহিত করেছেন।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন যে, সূরা বাকারার যেসব আয়াতে সর্ব প্রথম তালাক সম্পর্কিত হুকুম আহকাম দেয়া হয়েছিল সেসব আয়াত নাযিল হওয়ার পর এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। সূরার বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সাক্ষও তা প্রমাণ করে। সূরাটি নাযিল হওয়ার সঠিক সময়-কাল কোনটি তা নির্ণয় করা যদিও কঠিন, কিন্তু বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে এতটুকু অন্তত জানা যায় যে, লোকজন সূরা বাকারার বিধিনিষেধগুলো বুঝতে যখন ভুল করতে লাগলো এবং কার্যতও তাদের থেকে ভুল-ত্রুটি হতে থাকলো তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সংশোধনের জন্য এসব নির্দেশ নাযিল করলেন।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

তালাক ও ইদ্দত সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইতিপূর্বে যেসব বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে এ সূরার নির্দেশাবলী বুঝার জন্য পুনরায় তা স্মৃতিতে তাজা করে নেয়া প্রয়োজন।

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمۡسَاكٌۢ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ تَسۡرِيۡحٌۢ بِاِحۡسَانٍ (البقره : ٢٢٩)

"তালাক দুইবার। এরপর স্ত্রীকে হয় উত্তমরূপে রাখবে নয় ভালভাবে বিদায় করে দেবে।"

وَالۡمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِاَنۡفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوۡٓءٍ .... وَبُعُوۡلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ اِنۡ اَرَادُوۡٓا اِصۡلَاحًا (البقره : ٢٢٨)

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকেরা (তিন তালাকের পর) তিন হায়েজ পর্যন্ত নিজেদের বিরত রাখবে................যদি তারা সংশোধনে আগ্রহী হয় তাহলে এই সময়ের মধ্যে তাদের স্বামীরা তাদেরকে (স্ত্রী হিসেবে) ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী।"

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ....

"এরপর সে যদি তৃতীয়বারের মত তালাক দিয়ে দেয় তাহলে অন্য কারো সাথে সেই স্ত্রীর বিয়ে হওয়ার আগে সে আর তার জন্য হালাল হবে না...।" (আল বাকারাহ ২৩০)

اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا (الاحزاب : ٤٩)

"তোমরা ঈমানদার নারীদের বিয়ে করে স্পর্শ করার পূর্বেই যদি তালাক দিয়ে দাও তাহলে তোমরা তাদের কাছে ইদ্দত পালন করার দাবী করতে পার না। কারণ তোমাদের জন্য ইদ্দত পালন জরুরী নয়।" (আল আহযাব ঃ ৪৯)

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا (البقرة : ٢٣٤)

"তোমাদের মধ্যে কেউ স্ত্রী রেখে মারা গেলে স্ত্রীরা চার মাস দশদিন পর্যন্ত নিজেদের বিরত রাখবে বা অপেক্ষা করবে।" (আল বাকারাহ ঃ ৩৪)

উল্লেখিত আয়াতসমূহে যেসব নীতি নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল তা হচ্ছে ঃ

এক ঃ স্বামী তার স্ত্রীকে সর্বাধিক তিন তালাক দিতে পারে।

দুই ঃ এক বা দুই তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর থাকে এবং ইদ্দতের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করতে চাইলে করতে পারবে। এ জন্য তাহলীলের কোন শর্ত প্রযুক্ত হবে না। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয় তাহলে ইদ্দতের সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার আর স্বামীর থাকে না, বরং তা বাতিল হয়ে যায়। এরপর ঐ স্ত্রীর অপর কোন পুরুষের সাথে বিয়ে হওয়া এবং ঐ স্বামী স্বেচ্ছায় তাকে তালাক না দেয়া পর্যন্ত পূর্বোক্ত স্বামীর সাথে পুনরায় তার বিয়ে হতে পারে না।

তিন ঃ ঋতুস্রাব চালু আছে এবং স্বামীর সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে এমন স্ত্রীলোকের 'ইদ্দত' হলো তালাক প্রাপ্তির পর তিনবার মাসিক হওয়া। এক তালাক বা দুই তালাক হওয়ার ক্ষেত্রে এ ইদ্দত পালনের অর্থ হলো, স্ত্রীলোকটি এখনও তার দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ আছে এবং ইদ্দতকালের মধ্যে সে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু স্বামী যদি তিন তালাক দিয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীর এই ইদ্দত পালন তাকে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য নয়, বরং শুধু এ জন্য যে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে সে অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না।

চার ঃ দৈহিক মিলন হয়নি এমন কোন স্ত্রীকে (স্পর্শ করার পূর্বে) যদি তালাক দেয়া হয়, তাকে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। সে চাইলে তালাক প্রাপ্তির পরপরই বিয়ে করতে পারে।

পাঁচ ঃ যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গিয়েছে তাকে চার মাস দশদিন সময়–কালের জন্য ইদ্দত পালন করতে হবে।

এখন এ কথাটি ভাল করে বুঝে নিতে হবে যে, এসব বিধি–বিধানের কোনটি বাতিল করা বা সংশোধন করার জন্য সূরা তালাক নাযিল হয়নি। বরং দু'টি উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এ সূরা নাযিল হয়েছে।

প্রথম উদ্দেশ্যটি হলো, পুরুষকে তালাক দেয়ার যে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে তা প্রয়োগের জন্য এমন কিছু বিজ্ঞোচিত পন্থা বলে দেয়া, যার সাহায্য নিলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিস্থিতি না আসতে পারে। আর বিচ্ছিন্ন হলেও যেন শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় তা হয় যখন পারস্পরিক সমঝোতা ও বুঝাপড়ার সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। কারণ আল্লাহর শরীয়াতে তালাকের অবকাশ রাখা হয়েছে শুধু একটি অনিবার্য প্রয়োজন হিসেবে। অন্যথায়, একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে যে দাম্পত্য বন্ধন একবার কায়েম হয়েছে তা আবার ছিন্ন হয়ে যাক তা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَا اَحَلَّ اللّٰهُ شَيْئًا اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ (ابو داؤد)

"তালাকের চেয়ে অপছন্দনীয় আর কোন জিনিসকে আল্লাহ তা'আলা হালাল করেননি।" (আবু দাউদ)

তিনি আরো বলেছেন ঃ

اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (ابو داؤد)

"সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় হচ্ছে তালাক।" (আবু দাউদ)

দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হলো, সূরা বাকারায় নাযিলকৃত বিধি–বিধান ছাড়া আরো যেসব বিষয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষে ছিল তার ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ দিয়ে ইসলামের পারিবারিক আইনের এ দিক ও বিভাগটিকে পূর্ণতা দান করা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে স্বামীর সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে মাসিক বন্ধ হওয়া এমন স্ত্রীলোক কিংবা যাদের এখনো মাসিক আসেনি তারা তালাক প্রাপ্তা হলে তাদের ইদ্দত কি হবে, তা ছাড়া যেসব নারী গর্ভবতী হয়েছে তারা যদি তালাকপ্রাপ্তা হয় কিংবা স্বামী মারা যায় তাদের ইদ্দত কি হবে তা বলা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন রকম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের খোরপোষ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা কিভাবে হবে এবং যেসব ছেলেমেয়ের পিতামাতা তালাকের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে তাদের দুধপানের ব্যবস্থা কিভাবে করা হবে তা এই সূরাতে বলা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ①

হে নবী, তোমরা স্ত্রীলোকদের তালাক দিলে তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দাও[১] এবং ইদ্দতের সময়টা ঠিকমত গণনা করো[২] আর তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করো (ইদ্দত পালনের সময়ে)। তোমরা তাদেরকে তোমাদের বাড়ী থেকে বের করে দিও না। তারা নিজেরাও যেন বের না হয়।[৩] তবে তারা যদি স্পষ্ট অশ্লীল কাজ করে[৪] তবে ভিন্ন কথা। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে আল্লাহর সীমাসমূহ লংঘন করবে সে নিজেই নিজের ওপর জুলুম করবে। তোমরা জান না আল্লাহ হয়তো এরপরে সমঝোতার কোন উপায় সৃষ্টি করে দেবেন।[৫]

১. অর্থাৎ তালাক দেয়ার ব্যাপারে তোমরা তাড়াহুড়া করো না যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন ঝগড়া বিবাদ হওয়া মাত্রই রাগান্বিত হয়ে তালাক দিয়ে ফেললে এবং এক আঘাতে বিবাহ বন্ধন এমনভাবে ছিন্ন করে ফেললে যে, ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগও আর অবশিষ্ট থাকলো না এমনভাবে তালাক দিও না। বরং স্ত্রীদের তালাক দিতে হলে ইদ্দত পালনের জন্য তালাক দাও। ইদ্দত পালনের জন্য তালাক দেয়ার দু'টি অর্থ আছে এবং এখানে দু'টি অর্থই প্রয়োজ্য ঃ

একটি অর্থ হচ্ছে, ইদ্দত শুরু করার জন্য তালাক দাও। অন্য কথায় এমন সময় তালাক দাও যে সময় থেকে তাদের ইদ্দত শুরু হয়ে থাকে। সূরা বাকারার ২২৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যেসব স্ত্রীলোকের স্বামীর সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে এবং মাসিকও হয়ে

থাকে তালাক প্রাপ্তির পর তিনবার মাসিক হওয়ার সময়–কালই তাদের ইদ্দত। এই নির্দেশের প্রতি লক্ষ রেখে বিচার করলে ইদ্দত শুরু করার জন্য তালাক দেয়ার অপরিহার্য যে অর্থ হতে পারে তা হচ্ছে, স্ত্রীকে ঋতুস্রাবকালে তালাক দেয়া যাবে না। কারণ, যে ঋতুস্রাবকালে তাকে তালাক দেয়া হয়েছে তার ইদ্দত সেই ঋতুস্রাব থেকে গণনা করা যাবে না। তাই এ অবস্থায় তালাক দেয়ার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে নারীর ইদ্দতের সময়–কাল তিন হায়েজের পরিবর্তে চার হায়েয হয়ে যায়। তাছাড়া এ নির্দেশের আরো একটি দাবী হলো যে 'তুহ্‌রে' (স্ত্রীর ঋতু থেকে পবিত্র থাকার অবস্থা) স্বামী স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন করেছে সেই 'তুহ্‌রে' তালাক দেয়া যাবে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে তালাক দেয়ার সময় স্বামী ও স্ত্রীর মিলনের ফলে গর্ভসঞ্চার হয়েছে কি না তা তাদের দু'জনের কেউই জানতে পারে না। এ কারণে অনুমানের ওপর নির্ভর করে যেমন ইদ্দত গণনা শুরু হতে পারে না তেমনি মহিলাকে গর্ভবতী ধরে নিয়েও ইদ্দত গণনা হতে পারে না। সুতরাং এই নির্দেশটি একই সাথে দু'টি বিষয় দাবী করে। একটি হলো, হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া যাবে না। দ্বিতীয়টি হলো, তালাক দিতে হবে এমন 'তুহ্‌রে' যে 'তুহ্‌রে' দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়নি কিংবা যখন স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি জানা আছে। তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে এসব বাধ্যবাধকতার মধ্যে যে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে তা একটু চিন্তা–ভাবনা করলেই বুঝা যায়। ঋতু অবস্থায় তালাক না দেয়ার কল্যাণকর দিক হলো, এটি এমন এক অবস্থা যখন স্বামী ও স্ত্রীর দৈহিক মিলন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে এক ধরনের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটা প্রমাণিত যে, এই অবস্থায় নারীর মেজাজ স্বাভাবিক থাকে না। তাই সেই সময় যদি তাদের মধ্যে কোন ঝগড়া–বিবাদ হয় তাহলে তা মিটমাট করার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়েই অনেকটা অসহায় হয়ে পড়ে। আর পরিস্থিতিকে ঝগড়া–বিবাদ থেকে তালাক পর্যন্ত না গড়িয়ে যদি স্ত্রীর ঋতু থেকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয় তাহলে স্ত্রীর মেজাজ প্রকৃতি স্বাভাবিক হওয়া এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে আল্লাহ যে স্বাভাবিক আকর্ষণ দিয়েছেন তা তৎপর ও কার্যকর হয়ে পুনরায় দু'জনের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। যে 'তুহ্‌রে' দৈহিক মিলন হয়েছে সেই 'তুহ্‌রে'ই তালাক নিষিদ্ধ হওয়ার কল্যাণকর দিক হচ্ছে, সেই সময়ে যদি গর্ভসঞ্চার হয়ে থাকে তাহলে স্বামী ও স্ত্রী কারো পক্ষেই তা জানা সম্ভব হয় না। তাই তা তালাক দেয়ার উপযুক্ত সময় নয়। আর গর্ভসঞ্চার হয়েছে এ বিষয়ে জানার পর যে নারীর গর্ভে তার সন্তান বেড়ে উঠছে তাকে তালাক দেবে কি দেবে না সে সম্পর্কে পুরুষটি অন্তত দশবার ভেবে দেখবে। অপরদিকে নারীও তার নিজের ও সন্তানের ভবিষ্যত চিন্তা করে স্বামীর অসন্তুষ্টির কারণ দূর করার জন্য পুরোপুরি চেষ্টা করবে। কিন্তু চিন্তা–ভাবনা না করে অন্ধকারে তীর নিক্ষেপ করার পর যদি একথা জানতে পারে যে, গর্ভসঞ্চার হয়েছিল তাহলে উভয়কেই পরে অনুশোচনা করতে হবে।

এটা হচ্ছে ইদ্দতের জন্য তালাক দেয়ার প্রথম তাৎপর্য। দৈহিক মিলন হয়েছে এমন ঋতুবতী এবং গর্ভধারণে সক্ষম নারীদের জন্য এটি প্রযোজ্য। এখন থাকলো এর দ্বিতীয় তাৎপর্যটি। এ তাৎপর্যটি হলো, তালাক দিতে হলে ইদ্দত পর্যন্ত সময়ের জন্য তালাক দাও। অর্থাৎ একসাথে তিন তালাক দিয়ে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য তালাক দিয়ে ফেল না। বরং এক বা বড় জোর দুই তালাক দিয়ে ইদ্দত পর্যন্ত অপেক্ষা করো যাতে এই

সময়–কালের মধ্যে যেকোন সময় 'রুজু' করার বা ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ তোমার থাকে। এই তাৎপর্য অনুসারে এই নির্দেশটি দৈহিক মিলন হয়েছে এমন ঋতুবতী মহিলাদের জন্য যেমন কল্যাণকর তেমনি যাদের ঋতু বন্ধ হয়ে গিয়েছে, বা এখনো যাদের ঋতু আসেনি অথবা তালাক দেয়ার সময় যাদের গর্ভসঞ্চার হয়েছে বলে জানা গেছে তাদের সবার জন্য সমানভাবে কল্যাণকর। আল্লাহর এই নির্দেশের অনুসরণ করলে তালাক দেয়ার পর কাউকেই পস্তাতে হবে না। কারণ এভাবে তালাক দিলে ইদ্দতের মধ্যে 'রুজু' করা বা ফিরিয়ে নেয়া যায় এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পরেও পূর্বতন স্বামী–স্ত্রী যদি পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তাহলে পুনরায় বিয়ের মাধ্যমে তা করা সম্ভব।

বড় বড় মুফাসসির طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ আয়াতাংশের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন তা এই। এর তাফসীর করতে গিয়ে ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ ঋতু অবস্থায় তালাক দেবে না এবং যে 'তুহরে' স্বামী দৈহিক মিলন করেছে সে 'তুহরে'ও দেবে না। বরং তাকে ঋতুস্রাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র হওয়ার সুযোগ দেবে। অতপর তাকে এক তালাক দেবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী যদি রুজু নাও করে এবং এমতাবস্থায় ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে স্ত্রী কেবল এক তালাক দ্বারা বিচ্ছিন্ন হবে (ইবনে জারীর)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ "ইদ্দতের জন্য তালাক দেয়ার অর্থ হলা, 'তুহরে' তথা পবিত্রাবস্থায় দৈহিক মিলন না করেই তালাক দেবে।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর, 'আতা, মুজাহিদ, মায়মুন ইবনে মাহরান, মুকাতিল ইবনে হাইয়ান এবং দাহ্হাক রাহিমাহুমুল্লাহ থেকে এ তাফসীর বর্ণিত হয়েছে (ইবনে কাসীর)। ইকরিমা এর অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন ঃ "নারীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে এ বিষয়ে জেনে তালাক দেবে। দৈহিক মিলন হয়েছে এ অবস্থায় নারীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে কি হয়নি সে বিষয়ে না জেনে তালাক দেবে না" (ইবনে কাসীর)। হযরত হাসান বসরী ও ইবনে সিরীন বলেন ঃ 'তুহর' অবস্থায় দৈহিক মিলন না করে তালাক দেবে কিংবা গর্ভ যখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন তালাক দেবে (ইবনে জারীর)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাঁর স্ত্রীকে মাসিক চলাকালে তালাক দিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত স্পষ্ট করে এ আয়াতের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রায় সবগুলো হাদীসগ্রন্থেই এ ঘটনা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়েছে। এসব বিষয়ে আইনের উৎস মূলত এটিই। ঘটনাটা হলো, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাঁর স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিলে হযরত উমর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করলেন। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন ঃ "স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দাও। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সে যেন তাকে স্ত্রী হিসেবেই রাখে। এরপর যখন তার মাসিক হবে এবং তা থেকেও পবিত্র হবে তখন যদি সে তাকে তালাক দিতে চায় তাহলে সেই পবিত্রাবস্থায় দৈহিক মিলন না করে তালাক দেবে। মহান আল্লাহ যে ইদ্দতের জন্য তালাক দিতে বলেছেন এটিই সেই ইদ্দত।" একটি হাদীসের ভাষ্য হলো, "পবিত্রাবস্থায় দৈহিক মিলন না করে তালাক দেবে অথবা এমন অবস্থায় তালাক দেবে যখন তার গর্ভ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।"

বড় বড় সাহাবী কর্তৃক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আরো কতিপয় হাদীসও এ আয়াতের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের ওপর অধিক আলোকপাত করে।

নাসায়ী হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানানো হলো যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছে। একথা শুনে নবী (সা) ক্রোধে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং বললেন ঃ

أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟

"আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকতেই আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেলা হচ্ছে?"

এ ধরনের আচরণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্রোধের মাত্রা দেখে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ আমি কি তাকে হত্যা করবো না? আবদুর রাযযাক হযরত উবাদা ইবনে সামেত সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা নিজের স্ত্রীকে হাজার তালাক দিয়ে ফেললে তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ فِى مَعْصِيَةِ اللّٰهِ تَعَالَى وَبَقِىَ، تِسْعُ مِأَةٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُوْنَ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا ، إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ -

"সে আল্লাহর নাফরমানি করেছে আর ঐ স্ত্রী তিন তালাক দ্বারা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এখন নয় শত সাতানব্বই তালাক জুলুম ও সীমালংঘন হিসেবে অবশিষ্ট আছে। আল্লাহ চাইলে এ জন্য তাকে আযাব দিতে পারেন কিংবা ক্ষমাও করতে পারেন।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর সম্পর্কিত ঘটনার বিস্তারিত যে বিবরণ দারুকুতনী ও ইবনে আবী শায়বা হাদীসগ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে তাতে এ কথাটিও আছে যে, নবী (সা) আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলে আবদুল্লাহ ইবনে উমর জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি তাকে তিন তালাক দিতাম তাহলেও কি ফিরিয়ে নিতে পারতাম? নবী (সা) জবাব দিলেন ঃ كانت تبين منك وكانت معصية "না, এ অবস্থায় সে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। তবে এটি হতো একটি গোনাহর কাজ।" একটি হাদীসে নবীর (সা) বক্তব্যের ভাষা বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ اذا قد عصيت ربك وبانت منك امراتك "এরূপ করলে তুমি তোমার রবের নাফরমানি করতে। কিন্তু তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।"

এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম থেকে যেসব ফাতাওয়া বর্ণিত হয়েছে তাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ও নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মুয়াত্তা হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি এসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা) বলল! আমি আমার স্ত্রীকে আট তালাক দিয়ে ফেলেছি। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ বিষয়ে তোমাকে কি ফতোয়া দেয়া হয়েছে? সে বলল ঃ "আমাকে বলা হয়েছে যে, স্ত্রী আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।" আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেনঃ صدقوا ، هو مثل ما يقولون "তারা ঠিকই বলেছে। তারা মাসয়ালার যে সমাধান দিয়েছে তাই ঠিক।" আবদুর রায্যাক আলকামা থেকে এ মর্মে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা) বলল ঃ আমি আমার স্ত্রীকে ৯৯ তালাক দিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ ثلاث بينها وسائر هن عدوان "তিনটি

তালাক তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। অবশিষ্ট সবগুলোই বাড়াবাড়ি।" ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ তাঁর সুনান গ্রন্থে এটি হযরত আলী (রা) ও হযরত উসমানের (রা) মত বলে উল্লেখ করেছেন। এক ব্যক্তি এসে হযরত উসমানকে বলল যে, সে তার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়ে ফেলেছে। হযরত উসমান বললেন ঃ بانت منك بثلاث "সে তিন তালাক দ্বারা তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।" হযরত আলীর (রা) সামনে অনুরূপ ঘটনা উপস্থাপিত হলে তিনি বলেছিলেন ঃ بَانَتْ مِنْكَ بِثَلاَثٍ وَاقسِمْ سَائِرَ هُنَّ عَلَى نِسَائِكَ "সে তো তিন তালাক দ্বারা তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এখন অবশিষ্ট তালাকগুলো তোমার অন্যসব স্ত্রীদের জন্য বন্টন করে দাও।" আবু দাউদ ও ইবনে জারীর কিছুটা শাব্দিক তারতম্যসহ এ মর্মে মুজাহিদের একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি ইবনে আব্বাসের কাছে বসেছিলেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছি। এ কথা শুনে ইবনে আব্বাস নীরব থাকলেন। এতে আমার ধারণা জন্মালো যে, হয়তো তিনি তার স্ত্রীকে তার কাছে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন। এরপর তিনি বললেন ঃ "তোমরা একেকটি লোক তালাক দেয়ার ব্যাপারে প্রথমে বোকামি করে বসো এবং পরে এসে হে ইবনে আব্বাস, হে ইবনে আব্বাস বলতে থাক। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যে ব্যক্তিই আল্লাহর ভয় মনে রেখে কাজ করবে আল্লাহ তার জন্য সমস্যা থেকে বের হয়ে আসার উপায় করে দেবেন। তুমি তো আল্লাহকে ভয় করো নাই। এখন আমি তোমার জন্য কোন উপায় দেখছি না। তুমি তোমার রবের নাফরমানি করেছো এবং তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।" মুয়াত্তা হাদীসগ্রন্থ এবং তাফসীরে ইবনে জারীরে মুজাহিদ থেকেই আরো একটি হাদীস কিছুটা শাব্দিক তারতম্যসহ বর্ণিত হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একশত তালাক দেয়ার পর ইবনে আব্বাসের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন ঃ "তিন তালাক দ্বারা সে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। অবশিষ্ট ৯৭ তালাক দ্বারা তুমি আল্লাহর আয়াতকে খেলার বস্তু বানিয়েছ।" এটি মুয়াত্তার ভাষা। ইবনে জারীরে ইবনে আব্বাসের বক্তব্যের যে ভাষা উদ্ধৃত করা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ "তুমি তোমার রবের নাফরমানি করেছ। তাই তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তুমি আল্লাহকে ভয় কর নাই। আল্লাহকে ভয় করলে এই কঠিন অবস্থা থেকে বাঁচার কোন উপায় আল্লাহ সৃষ্টি করতেন।" ইমাম তাহাবী একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসের কাছে এসে তাঁকে বলল, আমার চাচা তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছেন। ইবনে আব্বাস বললেন ঃ

إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللّٰه فَأَثِمَ وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا –

তোমার চাচা আল্লাহর নাফরমানি করে গোনায় লিপ্ত হয়েছে এবং শয়তানের আনুগত্য করেছে। তাই আল্লাহ তার জন্য এই কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পথ রাখেননি।"

আবু দাউদ ও মুয়াত্তা হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি নির্জনবাসের আগেই তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর আবার তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হলো এ উদ্দেশ্যে সে ফতোয়া জানতে বের হলো। হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াস ইবনে বুকাইর বলেন ঃ আমি তার সাথে ইবনে আব্বাস ও আবু হুরাইরা (রা)–এর কাছে গেলাম। তাঁরা উভয়েই যে জবাব দিয়েছিলেন তাহলো إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ

"তোমার জন্য যে সুযোগ ছিল তা তুমি হাতছাড়া করে ফেলেছো।" জামাখশারী তাঁর কাশশাফ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদানকারী যে ব্যক্তিই হযরত উমরের (রা) কাছে আসত তিনি তাকে প্রহার করতেন এবং তার প্রদত্ত তালাক কার্যকরী বলে গণ্য করতেন। সাঈদ ইবনে মনসুর হযরত আনাসের বর্ণনা থেকে সহীহ সনদে এ কথাটি উদ্ধৃত করেছেন। এ ব্যাপারে সাহাবা কিরাম যে সাধারণ মত পোষণ করতেন তা ইবনে আবী শায়বা ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবরাহীম নাখায়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে উদ্ধৃত করেছেন। মতটি হলো ঃ

إِنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَةَ حِيَضٍ -

"সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম চাইতেন, স্বামী স্ত্রীকে প্রথমে এক তালাক দিক এবং তারপর তিনটি ঋতুকাল অতিবাহিত হোক।"

এটি ইবনে আবী শায়বার বক্তব্যের ভাষা। ইমাম মুহাম্মাদের বক্তব্যের ভাষা হলো ঃ

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا تَزِيدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ -

"একসাথে এক তালাকের বেশী না দেয়া এবং এভাবে ইদ্দত পূর্ণ হতে দেয়া ছিল সাহাবায়ে কিরামের পছন্দনীয় পন্থা।"

এসব হাদীস সাহাবায়ে কেরামের মতামত ও বক্তব্যের আলোকে কুরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে ইসলামী ফিকাহবিদগণ বিস্তারিত যে বিধান তৈরী করেছেন আমরা তা নীচে বর্ণনা করছি।

এক ঃ হানাফী ফিকাহবিদগণের মতে তালাক তিন প্রকার, আহসান, হাসান এবং বেদয়ী। আহসান তালাক হলো, যে 'তুহরে' স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করেনি সেই 'তুহরে' শুধু এক তালাক দিয়ে 'ইদ্দত' পূর্ণ হতে দেবে। হাসান তালাক হলো, প্রত্যেক 'তুহরে' একটি করে তালাক দেবে। এই নিয়মে তিন 'তুহরে' তিন তালাক দেয়াও সুন্নাতের পরিপন্থী নয়। যদিও একটি তালাক দিয়ে 'ইদ্দত' পূর্ণ হতে দেয়াটাই সর্বোত্তম। বিদআত তালাক হলো, ব্যক্তির এক সাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়া কিংবা একই 'তুহরে' ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিন তালাক দিয়ে দেয়া বা হায়েয অবস্থায় তিন তালাক দেয়া অথবা যে 'তুহরে' সহবাস করেছে সেই 'তুহরে' তিন তালাক দেয়া। সে এর যেটিই করুক না কেন গোনাহগার হবে। ঋতুবতী ও দৈহিক মিলন হয়েছে এমন স্ত্রীলোকের জন্য এ বিধানটি প্রযোজ্য। এখন বাকী থাকে দৈহিক মিলন হয়নি এমন স্ত্রীকে তালাকের ব্যাপারটি। এরূপ স্ত্রীকে 'তুহর' ও 'হায়েয' উভয় অবস্থায় সুন্নাত অনুসারে তালাক দেয়া যেতে পারে। কিন্তু স্ত্রী যদি এমন হয় যে, তার সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে কিন্তু তার ঋতুস্রাব হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে অথবা এখনো ঋতুস্রাব হয়নি তাহলে দৈহিক মিলনের পরেও তাকে তালাক দেয়া যেতে পারে। কেননা, তার গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর স্ত্রী গর্ভবতী হলে

সহবাসের পরেও তাকে তালাক দেয়া যেতে পারে। কারণ, তার গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি আগে থেকেই জানা আছে। কিন্তু এই তিন শ্রেণীর স্ত্রীলোককে তালাক দেয়ার সুন্নাত পন্থা হলো এক মাস পর পর তালাক দেয়া। আর আহসান তালাক হলো, এক তালাক দিয়ে 'ইদ্দত' অতিবাহিত হতে দেয়া" (হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কুরআন—জাস্সাস, উমদাতুল কারী)।

ইমাম মালেকের (র) মতেও তালাক তিন প্রকার ঃ সুন্নী, বিদয়ী মাকরূহ এবং বিদয়ী হারাম। সুন্নাত অনুসারে তালাক হলো, নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় এমন সহবাসকৃত স্ত্রীকে 'তুহর' অবস্থায় সহবাস না করে এক তালাক দিয়ে ইদ্দত অতিবাহিত হতে দেয়া। বিদয়ী মাকরূহ তালাক হলো, যে 'তুহরে' সহবাস করা হয়েছে সেই তুহরে তালাক দেয়া, কিংবা সহবাস না করে এক 'তুহরে' একাধিক তালাক দেয়া বা ইদ্দত পালনকালে ভিন্ন ভিন্ন তুহরে তিন তালাক দেয়া অথবা একসাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়া। আর বিদয়ী হারাম তালাক হলো, ঋতুস্রাবকালে তালাক দেয়া। (হাশিয়াতুদ দাসূকী আলাশশারহিল কাবীর, আহকামুল কুরআন—ইবনুল আরাবী)।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের (র) নির্ভরযোগ্য মত হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ ফিকাহবিদ যে বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন—তা হলো নিয়মিত মাসিক স্রাব হয় এবং স্বামীর সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে এমন স্ত্রীলোককে সুন্নাত অনুসারে তালাক দেয়ার নিয়ম হচ্ছে 'তুহর' অবস্থায় তার সাথে সহবাস না করে তালাক দিতে হবে এবং 'ইদ্দত' অতিবাহিত হওয়ার জন্য এই অবস্থায়ই রেখে দিতে হবে। তবে তাকে যদি তিন 'তুহরে' আলাদাভাবে তিন তালাক দেয়া হয় কিংবা একই 'তুহরে' তিন তালাক দেয়া হয় বা একই সাথে তিন তালাক দেয়া হয় অথবা ঋতুস্রাবকালে তালাক দেয়া হয় অথবা যে 'তুহরে' সহবাস করা হয়েছে সেই 'তুহরেই' তালাক দেয়া, কিন্তু তার গর্ভবতী হওয়ার বিষয় প্রকাশ না পায় তাহলে এসব তালাক বিদআত ও হারাম। তবে নারী যদি এমন হয় যার সাথে সহবাস করা হয়নি অথবা সহবাস করা হয়েছে কিন্তু তার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে অথবা ঋতুস্রাব এখনো শুরু হয়নি অথবা গর্ভবতী, তাহলে তার ক্ষেত্রে না সময়ের বিবেচনায় সুন্নাত ও বিদআত বলে কোন পার্থক্য আছে, না তালাকের সংখ্যার বিবেচনায় কোন পার্থক্য আছে। (আল ইনসাফ ফী মা'রিফাতির রাজেহ মিনাল খেলাফ আলা মাযহাবি আহমাদ ইবনে হাম্বল)।

ইমাম শাফেয়ী (র)–এর মতে তালাককে সুন্নাত ও বিদআত হিসেবে পৃথক করা যেতে পারে কেবল সময়ের বিচারে সংখ্যার বিচারে নয়। অর্থাৎ নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় এবং দৈহিক মিলন হয়েছে এমন নারীকে ঋতুস্রাবকালে তালাক দেয়া অথবা গর্ভধারণে সক্ষম নারীকে যে তুহরে সহবাস হয়েছে সেই তুহরে তালাক দেয়া কিন্তু তার গর্ভাবস্থা প্রকাশ পায়নি, বিদআত ও হারাম। এরপর থাকে তালাকের সংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়টি। এ ক্ষেত্রে একই সাথে তিন তালাক দেয়া হোক অথবা একই তুহরে বা ভিন্ন ভিন্ন 'তুহরে' দেয়া হোক কোন অবস্থায়ই তা সুন্নাতের পরিপন্থী নয়। আর দৈহিক মিলন হয়নি এমন নারী অথবা এমন নারী যার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে অথবা এখনো শুরু হয়নি অথবা গর্ভবতী হওয়া প্রকাশ পেয়েছে তাকে দেয়া তালাকের ক্ষেত্রে সুন্নাত বিদআতের পার্থক্য প্রযোজ্য নয়। (মুগনিউল মুহতাজ)

দুই ঃ কোন তালাক বিদআত, মাকরূহ, হারাম বা গোনাহর কাজ হওয়ার অর্থ চার ইমামের নিকট এই নয় যে, তা কার্যকর হবে না। তালাক মাসিক অবস্থায় দেয়া হয়ে থাকুক অথবা একসাথে তিন তালাক দেয়া হয়ে থাকুক, অথবা যে তুহরে দৈহিক মিলন হয়েছে সেই তুহরে দেয়া হয়ে থাকুক কিন্তু গর্ভ প্রকাশ পায়নি অথবা কোন ইমামের দৃষ্টিতে বিদআত এমন কোন পন্থায় দেয়া হয়ে থাকুক সর্বাবস্থায় তা কার্যকরী হবে। আর তালাকদাতা ব্যক্তি গোনাহগার হবে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুজতাহিদ এ ব্যাপারে চার ইমামের সাথে মতানৈক্য পোষণ করেছেন।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব এবং আরো কিছু সংখ্যক তাবেয়ীর মতে যে ব্যক্তি সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ করে ঋতু অবস্থায় তালাক দেবে অথবা একই সাথে তিন তালাক দেবে তার তালাক আদৌ কার্যকর হয় না। ইমামিয়া মাযহাবের অনুসারীরাও এমত পোষণ করেন। এমতের ভিত্তি হলো, এরূপ করা যেহেতু নিষিদ্ধ এবং হারাম বিদআত তাই তা কার্যকর নয়। অথচ আমরা ওপরে যেসব হাদীস উদ্ধৃত করেছি তাতে বলা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর মাসিক অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিলে নবী (সা) তাঁকে রুজু করার বা ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ তালাক যদি আদৌ কার্যকর না হয়ে থাকবে তাহলে রুজু করার নির্দেশ দেয়ার কি অর্থ থাকতে পারে? তাছাড়া বহু সংখ্যক হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত যে, নবী (সা) এবং বড় বড় সাহাবী একের অধিক তালাক দানকারীকে গোনাহগার বললেও তার দেয়া তালাককে অকার্যকর বলেননি।

তাউস ও ইকরিমা বলেন, একসাথে তিন তালাক দিলে সে ক্ষেত্রে শুধু এক তালাক কার্যকর হবে। ঈমাম ইবনে তাইমিয়া (র)–ও এ সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেছেন। একটি রেওয়ায়াত তাদের এ মতের উৎস ও ভিত্তি। রেওয়ায়াতটি হলো, আবুস্ সাহবা ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি জানেন না রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকরের (রা) সময়ে এবং হযরত উমরের (রা) যুগের প্রথম ভাগে তিন তালাককে এক তালাক বলে গণ্য করা হতো?" তিনি জবাব দিলেন ঃ হাঁ (বুখারী ও মুসলিম)। তাছাড়া মুসলিম, আবু দাউদ এবং মুসনাদে আহমাদে ইবনে আব্বাসের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকরের (রা) যুগে এবং হযরত উমরের (রা) যুগের প্রথম দুই বছরে তিন তালাককে এক তালাক বলে গণ্য করা হতো। পরবর্তী সময়ে হযরত উমর (রা) বললেন যে, মানুষ এমন এমন একটি বিষয়ে তাড়াহুড়া করতে শুরু করেছে, যে বিষয়ে ভেবে চিন্তে ও বুঝে সুজে কাজ করার অবকাশ দেয়া হয়েছিল। এখন আমরা তাদের এ কাজকে কার্যকর করবো না কেন? সুতরাং তিনি তা কার্যকর বলে ঘোষণা করলেন।

কিন্তু কয়েকটি কারণে এ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত কয়েকটি রেওয়ায়াত অনুসারে ইবনে আব্বাসের নিজের ফতোয়াই এর পরিপন্থী ছিল। এ কথা আমরা ওপরে উদ্ধৃত করেছি। দ্বিতীয়ত এ মতটি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং বড় বড় সাহাবী থেকে বর্ণিত যেসব হাদীসে তিন তালাক দানকারী সম্পর্কে ফতোয়া দেয়া হয়েছে যে, তার দেয়া তিন তালাকই কার্যকর হবে তার পরিপন্থী। আমরা ওপরে ঐ হাদীসগুলোর উদ্ধৃত করেছি। তৃতীয়ত ইবনে আব্বাসের নিজের রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত উমর (রা) সাহাবায়ে কিরামের (রা) সমাবেশে তিন তালাক কার্যকর করার কথা ঘোষণা

করেছিলেন। কিন্তু সে সময় বা পরবর্তীকালে কোন সময়ই সাহাবীদের মধ্যে থেকে কেউ এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি। এখন কথা হলো, হযরত উমর (রা) সুন্নাতের পরিপন্থী কোন কাজ করেছেন এ কথা কি কল্পনা করা যেতে পারে? আর সে বিষয়ে সমস্ত সাহাবী নিশ্চুপ থাকবেন এ কথাও কি মেনে নেয়া যেতে পারে? তাছাড়া রুকানা ইবনে আবদে ইয়াযীদের ঘটনা সম্পর্কে আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইমাম শাফেয়ী (র), দারেমী এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন যে, রুকানা তার স্ত্রীকে একই সাথে তিন তালাক দিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হলফ করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, সত্যিই কি তার এক তালাক দেয়ার নিয়ত ছিল? (অর্থাৎ অন্য দু'টি তালাক প্রথম তালাকটির ওপর জোর দেয়া এবং গুরুত্ব আরোপ করার জন্য তার মুখ থেকে বেরিয়ে ছিল এবং তিন তালাক দিয়ে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেয়া তার উদ্দেশ্য ছিল না) তিনি হলফ করে এ বর্ণনা দিলে নবী (সা) তাকে রুজু করার বা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার দিয়েছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কোন প্রকারের তালাকসমূহকে এক তালাক হিসেবে গণ্য করা হতো তার প্রকৃতি এসব ঘটনা থেকে জানা যায়। এ কারণে হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতের এই অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, যেহেতু প্রাথমিক যুগে দীনি ব্যাপারে মানুষের মধ্যে খিয়ানত প্রায় ছিল না বললেই চলে তাই তিন তালাক দানকারীর এ বক্তব্য মেনে নেয়া হতো যে, তার প্রকৃত নিয়ত ছিল এক তালাক দেয়ার। অন্য দু'টি তালাক প্রথম তালাকের ওপর জোর দেয়ার জন্যই তার মুখ থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু হযরত উমর দেখলেন যে, মানুষ তাড়াহুড়া করে প্রথমে তিন তালাক দিয়ে বসে এবং পরে প্রথম তালাকের ওপর জোর দেয়ার বা গুরুত্ব আরোপ করার বাহানা করে। তাই তিনি এ বাহানা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। ইমাম নববী ও ইমাম সুবকী এ ব্যাখ্যাটিকে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতের উত্তম ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করেছেন। শেষ কথা হলো, ইবনে আব্বাসের বক্তব্য সম্পর্কে আবুস সাহবা কর্তৃক যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতেও অসামঞ্জস্য রয়েছে। মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী আবুস সাহবা থেকে অপর যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জিজ্ঞেস করায় ইবনে আব্বাস বললেন ঃ "নির্জন বাসের পূর্বেই কেউ তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকরের (রা) যুগে এবং হযরত উমরের (রা) যুগের প্রথম দিকে তাকে এক তালাক বলে গণ্য করা হতো।" এভাবে একই বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস থেকে দু'টি পরস্পর বিরোধী রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। এই পরস্পর বিরোধিতা দু'টি রেওয়ায়াতকেই দুর্বল করে দেয়।

তিন ঃ স্ত্রীর ঋতুস্রাব চলাকালে তালাকদাতাকে যেহেতু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'রুজু' করার আদেশ দিয়েছিলেন তাই এ নির্দেশকে কোন্ অর্থে গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ, ইমাম আওযায়ী, ইবনে আবী লায়লা, ইসহাক ইবনে রাহাবিয়া এবং আবু সাওর বলেন ঃ "ঐ ব্যক্তিকে 'রুজু' করার নির্দেশ দেয়া হবে তবে 'রুজু' করতে বাধ্য করা হবে না।" (উমদাতুল কারী)। হিদায়া গ্রন্থে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের যে মত বর্ণনা করা হয়েছে সে অনুসারে 'রুজু' করা শুধু মুস্তাহাব নয় বরং ওয়াজিব। মুগনিউল মুহতাজ গ্রন্থে শাফেয়ী মাযহাবের যে মত বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে, যে ব্যক্তি মাসিক চলাকালে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে কিন্তু তিন তালাক দেয়নি তার জন্য সুন্নাত পন্থা হলো,

সে রুজু করবে এবং এর পরবর্তী তুহরেই তালাক না দিয়ে তা অতিবাহিত হতে দেবে এবং তা অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রী পুনরায় যখন মাসিক থেকে পবিত্র হবে তখন চাইলে তালাক দেবে, যাতে ঋতুকালে প্রদত্ত তালাক থেকে 'রুজু' করা খেলার বস্তুতে পরিণত না হয়। আল ইনসাফ গ্রন্থে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের যে মত বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে, এ অবস্থায় তালাক দানকারীর জন্য 'রুজু' করা মুস্তাহাব। কিন্তু ইমাম মালেক ও তাঁর সঙ্গীদের মতে ঋতু চলাকালে তালাক দেয়া পুলিশের হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ। স্ত্রী দাবী করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় শাসকের অবশ্য কর্তব্য হলো যখন কোন ব্যক্তির এ ধরনের কাজ সম্পর্কে তিনি জানতে পারবেন তখনই তাকে 'রুজু' করতে বাধ্য করবেন এবং ইদ্দতের শেষ সময় পর্যন্ত তাকে চাপ দিতে থাকবেন। সে অস্বীকৃতি জানালে তাকে বন্দী করবেন। এরপরও অস্বীকৃতি জানালে প্রহার করবেন। তারপরও সে যদি না মানে তাহলে শাসক নিজেই সিদ্ধান্ত দেবেন যে, তিনি তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। শাসক বা বিচারকের এই সিদ্ধান্ত 'রুজু' বলে গণ্য হবে। এরপর স্বামীর রুজু করার নিয়ত থাক বা না থাক তার জন্য ঐ স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বৈধ হবে। কারণ শাসক বা বিচারকের নিয়ত তার নিয়তের বিকল্প (হাশিয়াতুদ দুসুকী)। মালেকীরা এ কথাও বলেন যে, যে ব্যক্তি ঋতুস্রাবকালে প্রদত্ত তালাক থেকে ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় রুজু করেছে সে যদি তালাক দিতেই চায় তাহলে তার জন্য মুস্তাহাব পন্থা হলো, সে যে হায়েজে তালাক দিয়েছে তার পরের 'তুহরে'ই তালাক দেবে না। বরং পুনরায় হায়েজ আসার পর যখন পবিত্র হবে তখন তালাক দেবে। তালাকের পরবর্তী তুহরেই তালাক না দেয়ার নির্দেশ মূলত এজন্য দেয়া হয়েছে যে, হায়েজ অবস্থায় তালাক দানকারীর 'রুজু' করা যেন কেবল মৌখিক না হয়। বরং স্ত্রীর পবিত্রতার সময় তার স্ত্রীর সাথে দৈহিকভাবে মিলিত হওয়া উচিত। তারপর যে 'তুহরে' দৈহিক মিলন হয়েছে সেই 'তুহরে' তালাক দেয়া যেহেতু নিষিদ্ধ তাই তালাক দেয়ার সঠিক সময় তার পরবর্তী 'তুহর'। (হাশিয়াতুদ দুসুকী)

চার ঃ রিজয়ী তালাকদাতার জন্য 'রুজু' করার সুযোগ কতক্ষণ? এ বিষয়েও ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সূরা বাকারার ২২৮ আয়াতের ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ অর্থ তিন হায়েজ না তিন 'তুহর' এ প্রশ্নের ভিত্তিতেই এ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র) এবং ইমাম মালেকের (র) মতে قُرْء শব্দের অর্থ 'তুহর'। হযরত আয়েশা, ইবনে উমর এবং যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও এ মতটিই বর্ণিত হয়েছে। হানাফীদের মত হলো, قُرْء শব্দের অর্থ হায়েজ। এটিই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের নির্ভরযোগ্য মত। খোলাফায়ে রাশেদীনের চার খলিফা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), উবাই ইবনে কা'ব, মু'য়ায ইবনে জাবাল, আবুদ্ দারদা, উবাদা ইবনে সামেত এবং আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে এ মতটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে শা'বীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ১৩ জন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁরাও সবাই এ মত পোষণ করেছেন। তাছাড়া বহু সংখ্যক তাবেয়ীও এ মত পোষণ করেছেন।

এ মতভেদের ওপর ভিত্তি করে শাফেয়ী এবং মালেকীদের মতে তৃতীয় হায়েজ শুরু হওয়া মাত্রই স্ত্রীর ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যায় এবং স্বামীর রুজু করার অধিকার বাতিল হয়ে যায়। তবে যদি হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়া হয়ে থাকে তাহলে ঐ হায়েজ ইদ্দতের

মধ্যে গণ্য হবে না, বরং চতুর্থ হায়েজ শুরু হওয়া মাত্র ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে (মুগনিউল মুহতাজ, হাশিয়াতুদ দুসুকী)। হানাফীদের মত হলো, তৃতীয় হায়েজের দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পর যদি রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায় তবে নারী গোসল করুক বা না করুক তার ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে। আর যদি দশদিনের কম সময়ের মধ্যে রক্তস্রাব বন্ধ হয় তাহলে গোসল না করা পর্যন্ত অথবা এক ওয়াক্ত নামাযের পুরো সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দতকাল শেষ হবে না। পানি না থাকার পরিস্থিতিতে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফের (র) মতে নারী যখন তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নেবে তখন স্বামীর রুজু করার অধিকার শেষ হয়ে যাবে আর ইমাম মুহাম্মাদের মতে তায়াম্মুম করা মাত্রই রুজু করার অধিকার শেষ হয়ে যাবে (হিদায়া)। ইমাম আহমাদের নির্ভরযোগ্য যে মতটি সম্পর্কে হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ অনুসারী একমত তা হচ্ছে, স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় হায়েজ থেকে মুক্ত হয়ে গোসল না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর 'রুজু' করার অধিকার থাকবে (আল ইনসাফ)।

পাঁচ ঃ রুজু কিভাবে হয় আর কিভাবে হয় না? এ মাসয়ালার ক্ষেত্রে ফিকাহবিদদের মধ্যে এ বিষয়ে ঐকমত্য আছে যে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রিজয়ী তালাক দিয়েছে স্ত্রী সম্মত হোক বা না হোক ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে সে যখন ইচ্ছা 'রুজু' করতে পারে। কেননা কুরআন মজীদে (সূরা বাকারাহ, আয়াত ২২৮) বলা হয়েছেঃ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ "এই সময়ের মধ্যে তাদের স্বামী তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার পূর্ণ অধিকার রাখে।" এ থেকে স্বতই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 'ইদ্দত' শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের বিবাহ বন্ধন বহাল থাকে এবং চূড়ান্তভাবে ছেড়ে দেয়ার পূর্বে সে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। অন্য কথায় 'রুজু' করা বিবাহ নবায়ন করা নয় যে, সেজন্য স্ত্রীর সম্মতি প্রয়োজন হবে। এতটুকু পর্যন্ত ঐকমত্য পোষণ করার পর ফিকাহবিদগণ 'রুজু' করার পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

শাফেয়ী মাযহাবের মতে, 'রুজু' করা শুধু কথার দ্বারাই হতে পারে, কাজ দ্বারা নয়। 'আমি তোমাকে রুজু করলাম অর্থাৎ ফিরিয়ে নিলাম' এ কথা যদি তালাকদাতা না বলে তাহলে দৈহিক মিলন বা মেলামেশার মত কোন কাজ 'রুজু' করার নিয়তে করা হলেও তাকে 'রুজু' বলে গণ্য করা হবে না। বরং এ ক্ষেত্রে নারীকে যে কোন পন্থায় উপভোগ করা এবং তার থেকে তৃপ্তি লাভ করা হারাম, এমনকি তা যৌন উত্তেজনা ছাড়া হয়ে থাকলেও। কিন্তু রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে সে জন্য কোন হদ বা শাস্তি হবে না। কারণ, রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকল উলামা একমত নন। তবে যে ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে সহবাস হারাম বলে মনে করে তাকে তাযীর করা হবে। তাছাড়া শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করার কারণে সর্বাবস্থায় 'মহরে মিস্‌ল' বা সমতুল্য মহরানা পরিশোধ করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। সহবাস করার পর স্বামী মৌখিকভাবে 'রুজু' করুক বা না করুক তাতে কিছু এসে যায় না। (মুগনিউল মুহতাজ)

মালেকী মাযহাবের অনুসারীদের মতে 'রুজু' কথা ও কাজ উভয়ভাবেই হতে পারে। কথার দ্বারা রুজু করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি স্পষ্ট ভাষা প্রয়োগ করে তাহলে 'রুজু' করার নিয়ত তার থাক বা না থাক 'রুজু' হয়ে যাবে। এমনকি স্পষ্টভাবে রুজু করা বুঝায় এমন

শব্দ যদি সে তামাসাচ্ছলেও বলে তবুও তা 'রুজু' বলে গণ্য হবে। তবে কথা যদি সুস্পষ্ট না হয় তাহলে কেবল 'রুজু'র নিয়তে বলা হয়ে থাকলে তবেই তা রুজু বলে গণ্য হবে। এরপর থাকে কোন কাজ দ্বারা 'রুজু' করার বিষয়টি। এ ক্ষেত্রে মেলামেশা হোক বা সহবাস হোক ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কাজকে 'রুজু' হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে না যতক্ষণ না তা 'রুজু'র নিয়তে করা হবে। (হাশিয়াতুদ্ দুসুকী, আহকামুল কুরআন—ইবনুল আরাবী)

কথা দ্বারা বা মৌখিকভাবে রুজু করার বেলায় হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের মতামত মালেকী মাযহাবের অনুরূপ। কিন্তু কাজ দ্বারা রুজু করার ক্ষেত্রে তাদের মতামত মালেকীদের বিপরীত। এ ক্ষেত্রে হানাফী ও হাম্বলী উভয় মাযহাবের ফতোয়া হলো স্বামী যদি ইদ্দতের মধ্যেই রিজয়ী 'তালাকপ্রাপ্তা' স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহলে এ ক্ষেত্রে সে 'রুজু' করার নিয়তে করুক বা না করুক তার এই কাজ আপনা থেকেই রুজু বলে গণ্য হবে। তবে উভয় মাযহাবের সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, হানাফীদের মতে, মেলামেশার যে কোন কাজই 'রুজু' বলে গণ্য হবে এমনকি যদি তা সহবাসের চেয়ে নিম্নস্তরের কোন কাজও হয়। কিন্তু হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণ শুধু মেলামেশাকে রুজু বলে স্বীকার করেন না।" (হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, উমদাতুল কারী, আল ইনসাফ)

ছয় ঃ ফলাফলের দিক দিয়ে সুন্নাত তালাক ও বিদআত তালাকের মধ্যে পার্থক্য এই যে, এক তালাক বা দুই তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে ইদ্দতকাল শেষ হয়ে গেলেও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী এবং তার পূর্ব স্বামীর মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পুনরায় বিয়ে হতে পারে। কিন্তু কেউ যদি তিন তালাক দিয়ে ফেলে তাহলে ইদ্দতের মধ্যে যেমন 'রুজু' করা সম্ভব নয় তেমনি ইদ্দত শেষে পুনরায় বিয়ে হওয়াও সম্ভব নয়। তবে উক্ত মহিলার যদি অন্য কোন পুরুষের সাথে যথাযথভাবে বিয়ে হয়ে থাকে আর সে তার সাথে সহবাস করে এবং পরে তালাক দেয় কিংবা মরে যায় এবং তারপর সেই মহিলা ও তার পূর্ব স্বামী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তাহলে তা করতে পারবে। অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থে সহীহ সনদে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। এরপর সেই মহিলা অন্য এক পুরুষকে বিয়ে করেছে। দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার নির্জনবাসও হয়েছে কিন্তু সহবাস হয়নি। এমতাবস্থায় সে তাকে তালাক দিয়েছে। এখন এই মহিলার কি তার পূর্ব স্বামীর সাথে পুনরায় বিয়ে হতে পারে? নবী (সা) জবাব দিলেন ঃ

لَا، حَتّٰى يَذُوقَ الْاٰخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَاذَاقَ الْاَوَّلُ

"না, ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না যতক্ষণ তার দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর মত দৈহিক মিলন না করবে।"

এরপর থাকে পাতানো বিয়ে সম্পর্কে কথা। এ ধরনের বিয়েতে আগে থেকেই শর্ত থাকে যে, নারীকে তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল করার নিমিত্তে এক ব্যক্তি তাকে বিয়ে করবে এবং সহবাস করার পর তালাক দেবে। ইমাম আবু ইউসুফের (র) মতে এ ধরনের শর্তযুক্ত বিয়ে আদৌ বৈধ হয় না। ইমাম আবু হানীফার (র) মতে, এভাবে তাহলীল হয়ে

যাবে, তবে কাজটি মাকরূহ তাহরিমী বা হারাম পর্যায়ের মাকরূহ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (ترمذى ، نسائى)

"যে তাহলীল করে এবং যে তাহলীল করায় তাদের উভয়কে আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন।" (তিরমিযী, নাসায়ী)।

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেনঃ الا اخبركم بالتيس المستعار؟ "আমি কি তোমাদেরকে ভাড়াটে ষাঁড় সম্পর্কে অবহিত করবো না? সাহাবাগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, অবশ্যই করবেন। তিনি বললেন ঃ

هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (ابن ماجه ، دار قطنى)

"ভাড়াটে ষাঁড় হচ্ছে তাহলীলকারী। যে তাহলীল করে এবং যে তাহলীল করায় আল্লাহ তাদের উভয়কে লা'নত করেছেন। (ইবনে মাজা, দারু কুতনী)।

২. এই নির্দেশ পুরুষ, নারী এবং তাদের পরিবারের লোকজনদের উদ্দেশ্য করে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো, তালাককে এমন খেলার বস্তু মনে করো না যে, তালাকের মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর কবে তালাক দেয়া হয়েছে, কবে ইদ্দত শুরু হয়েছে এবং কবে তা শেষ হবে তাও মনে রাখা হবে না। তালাক একটি অত্যন্ত নাজুক ব্যাপার। এ থেকে স্বামী, স্ত্রী, তাদের সন্তান–সন্ততি এবং গোটা পরিবারের জন্য বহু আইনগত সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই তালাক দেয়া হলে তার সময় ও তারিখ মনে রাখতে হবে, কি অবস্থায় নারীকে তালাক দেয়া হয়েছে তাও মনে রাখতে হবে। সাথে সাথে হিসেব করে দেখতে হবে ইদ্দত কবে শুরু হয়েছে, কত সময় এখনো অবশিষ্ট আছে এবং কবে তা শেষ হয়েছে। এই হিসেবের ওপরই এ সিদ্ধান্ত নির্ভর করে যে, কোন্ সময় পর্যন্ত স্বামীর 'রুজু' করার অধিকার আছে, কোন সময় পর্যন্ত নারীকে তার বাড়ীতে রাখতে হবে, কতদিন পর্যন্ত তাকে খোরপোষ দিতে হবে, কতদিন পর্যন্ত সে নারীর উত্তরাধিকারী হবে এবং নারী তার উত্তরাধিকারীনী হবে। কখন নারী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় বিয়ে করার অধিকার পাবে। তাছাড়া ব্যাপারটি যদি মামলা–মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায় তাহলে সঠিক রায় দানের জন্য আদালতকেও তালাকের যথার্থ তারিখ ও সময় এবং নারীর অবস্থা জানার প্রয়োজন হবে। কারণ এ ছাড়া আদালত সহবাসকৃতা ও সহবাসকৃতা নয় এমন নারী, গর্ভবতী ও অগর্ভবতী, ঋতুবতী ও অঋতুবতী এবং রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা ও অন্য প্রকার তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ক্ষেত্রে তালাক থেকে সৃষ্ট সমস্যাবলীর যথার্থ ফায়সালা করতে অক্ষম।

৩. অর্থাৎ রাগান্বিত হয়ে স্বামী স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে দেবে না কিংবা রাগান্বিতা হয়ে স্ত্রী নিজেও বাড়ী ছেড়ে যাবে না। ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ী তার। ঐ বাড়ীতেই তাদের উভয়কে থাকতে হবে যাতে পারস্পরিক সমঝোতার কোন সম্ভাব্য উপায় সৃষ্টি হলে তা কাজে লাগিয়ে উপকৃত হওয়া যায়। রিজয়ী তালাকের ক্ষেত্রে স্বামী যে

কোন সময় স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এবং স্ত্রীও বিরোধের কারণসমূহ দূর করে স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য সচেষ্ট হতে পারে। উভয়ে যদি একই বাড়ীতে থাকে তাহলে তিন মাস পর্যন্ত অথবা তিনবার মাসিক আসা পর্যন্ত অথবা গর্ভবতী হওয়ার ক্ষেত্রে সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত এ সুযোগ বার বার আসতে পারে। কিন্তু স্বামী যদি তাড়াহুড়া করে স্ত্রীকে বের করে দেয় অথবা স্ত্রী যদি চিন্তা–ভাবনা না করে পিতৃগৃহে চলে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে 'রুজু' করার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে এবং সাধারণত শেষ পর্যন্ত তালাকের পরিণাম স্থায়ী বিচ্ছেদে রূপান্তরিত হয়। এ জন্য ফিকাহবিদগণ এ কথাও বলেছেন যে, যে স্ত্রী রিজয়ী তালাকের ইদ্দত পালন করছে তার সাজসজ্জা ও রূপচর্চা করা উচিত, যাতে স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। (হিদায়া, আল ইনসাফ)

সমস্ত ফিকাহবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, ইদ্দতকালে রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বাসগৃহ এবং খোরপোষ পাওয়ার অধিকার আছে। স্বামীর অনুমতি ছাড়া এই সময় বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়া স্ত্রীর জন্য জায়েয নয় এবং স্বামীর জন্য স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়াও জায়েজ নয়। স্বামী তাকে বের করে দিলে গোনাহগার হবে। আর স্ত্রী নিজেই যদি বের হয়ে যায় তাহলে সেও গোনাহগার হবে এবং খোরপোষ ও বাসগৃহ পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

৪. বিভিন্ন ফিকাহবিদগণ এর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। হযরত হাসান বসরী, আমের শা'বী, যায়েদ ইবনে আসলাম, দাহ্হাক, মুজাহিদ, ইকরিমা, ইবনে যায়েদ, হাম্মাদ এবং লাইসের মতে এর অর্থ ব্যভিচার। ইবনে আব্বাসের মতে, এর অর্থ গালিগালাজ ও অশালীন কথাবার্তা। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তির পরও স্ত্রীর মন–মেজাজ ঠিক না হওয়া। বরং ইদ্দতের সময়ও স্বামী এবং তার পরিবারের লোকজনের সাথে ঝগড়াঝাটি করা ও অশালীন ভাষা প্রয়োগ করা। কাতাদার মতে, এর অর্থ نشوز বা বিদ্রোহ। অর্থাৎ বিদ্রোহী প্রকৃতির জন্যই নারীকে তালাক দেয়া হয়েছে। এখন ইদ্দত চলাকালে সে স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত হয়নি। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), সুদ্দী, ইবনুস সায়েব এবং ইবরাহীম নাখায়ীর মতে, এর অর্থ নারীর বাড়ী থেকে বের হয়ে চলে যাওয়া। অর্থাৎ তাদের মতে, তালাকের পর ইদ্দতকালে নারীর বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়াটাই فاحشة مبينة (স্পষ্ট অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া)। আর "তারা নিজেরাও বের হবে না, তবে যদি স্পষ্ট অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে" কথাটা অনেকটা এরূপ যেমন কেউ বললো ঃ "তুমি কাউকে গালি দিও না, তবে যদি বে–আদব হয়ে থাক।" এই চার বক্তব্যের মধ্যে প্রথম তিনটি বক্তব্য অনুসারে "তবে যদি" সম্পর্ক "তাদেরকে বাড়ী থেকে বের করে দিও না"র সাথে। আর এই অংশের অর্থ হচ্ছে সে যদি চরিত্রহীনতা অথবা অশালীন ও অভদ্র কথাবার্তা বলে অথবা বিদ্রোহে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে বের করে দেয়া জায়েয হবে। আর চতুর্থ বক্তব্য অনুসারে এর সম্পর্ক "আর তারা নিজেরাও বের হবে না"র সাথে। এ ক্ষেত্রে অর্থ হচ্ছে, যদি তারা বের হয়ে যায় তাহলে স্পষ্ট অন্যায় ও অশালীন কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

৫. যারা বলেন, হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলে বা একই সংগে তিন তালাক দিলে আদৌ তালাক হয় না এ দু'টি আয়াতাংশ তাদের ধারণা খন্ডন করে। সাথে সাথে তাদের ধারণাও মিথ্যা প্রমাণ করে, যারা মনে করে এক সাথে তিন তালাক দিলে তা এক

তালাক বলে গণ্য হয়। এখন প্রশ্ন হলো, বেদাতী অর্থাৎ সুন্নাত বিরোধী পন্থায় দেয়া তালাক যদি আদৌ কার্যকর না হয় অথবা তিন তালাক যদি এক তালাক রিজয়ী বলে গণ্য হয় তাহলে এ কথা বলার প্রয়োজন কি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমাসমূহ অর্থাৎ সুন্নাত নির্দেশিত পন্থা ও নিয়ম লংঘন করবে সে নিজের ওপর জুলুম করবে, এবং তোমরা জাননা এর পরে আল্লাহ তা'আলা হয়তো সমঝোতার কোন উপায় সৃষ্টি করে দেবেন এ দু'টি কথা কেবল তখনই অর্থপূর্ণ হতে পারে, যখন সুন্নাতের পরিপন্থী পন্থায় তালাক দেয়ার কারণে সত্যি কোন ক্ষতি হয় এবং যে কারণে ব্যক্তিকে অনুশোচনা করতে হয় এবং এক সাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়ার কারণে 'রুজু' করার কোন সুযোগ আর না থাকে। অন্যথায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, যে তালাক আদৌ কার্যকরী হয় না তা দ্বারা আল্লাহর সীমাসমূহও লংঘন হয় না। তাইতা নিজের প্রতি জুলুম বলেও গণ্য হতে পারে না। আর রিজয়ী তালাক হয়ে যাওয়ার পর সমঝোতার পথ অবশ্যই থেকে যায়। সুতরাং এ কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই যে, আল্লাহ তা'আলা এরপর সমঝোতার কোন উপায় সৃষ্টি করে দেবেন।

এখানে পুনরায় সূরা বাকারার ২২৮ থেকে ২৩০ আয়াত এবং সূরা তালাকের আলোচ্য আয়াতগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। সূরা বাকারায় তালাকের নিসাব বা নির্দিষ্ট সীমা বলা হয়েছে তিন। এর মধ্যে দুই তালাকের পর রুজু করার অধিকার এবং 'ইদ্দত' পূরণ হওয়ার পর 'তাহলীল' ছাড়াই পুনরায় বিয়ে করার অধিকার থাকে। কিন্তু তৃতীয় তালাক দেয়ার পর এই দু'টি অধিকারই নষ্ট হয়ে যায়। এই নির্দেশটিকে বাতিল বা এর মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধনের জন্য সূরা তালাকের এ আয়াতগুলো নাযিল হয়নি, বরং নাযিল হয়েছে এ কথা জানিয়ে দেয়ার জন্য যে, স্ত্রীদের তালাক দেয়ার যে অধিকার ও ইখতিয়ার স্বামীদের দেয়া হয়েছে তা প্রয়োগ করার বিজ্ঞোচিত পন্থা কি, যা অনুসরণ করলে দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তালাক দিয়ে অনুশোচনা করার মত পরিস্থিতি আসতে পারে না। সমঝোতা ও আপোষরফা হওয়ার সর্বাধিক সুযোগ থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত যদি বিচ্ছেদ হয়েও যায় তাহলে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আবার মিলিত হওয়ার শেষ পথটি খোলা থাকে। কিন্তু অজ্ঞতা বশত কেউ যদি তার ইখতিয়ারসমূহ ভুল পন্থায় প্রয়োগ করে বসে তাহলে সে নিজের ওপর জুলুম করবে এবং ক্ষতিপূরণ ও সংশোধনের সমস্ত সুযোগ হারিয়ে ফেলবে। এর উপমা দেয়া যায় এভাবে যে, কোন এক পিতা তার ছেলেকে তিন শত টাকা দিয়ে বললেন ঃ তুমিই এ টাকার মালিক, যেভাবে ইচ্ছা তুমি এ টাকা খরচ করতে পার। এরপর তিনি তাকে উপদেশ দিয়ে বললেনঃ যে অর্থ আমি তোমাকে দিলাম তা তুমি সতর্কতার সাথে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে খরচ করবে যাতে তা থেকে যথাযথ উপকার পেতে পার। আমার উপদেশের তোয়াক্কা না করে তুমি যদি অসতর্কভাবে অন্যায় ক্ষেত্রে তা খরচ করো কিংবা সমস্ত অর্থ একসাথে খরচ করে ফেল তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর আমি খরচ করার জন্য আর কোন টাকা পয়সা তোমাকে দিব না। এখন পিতা যদি এই অর্থের পুরোটা ছেলেকে আদৌ না দেয় তাহলে সে ক্ষেত্রে এসব উপদেশের কোন অর্থই হয় না। যদি এমন হয় যে, উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়াই ছেলে তা খরচ করতে চাচ্ছে, কিন্তু টাকা তার পকেট থেকে বেরই হচ্ছে না, অথবা পুরো তিন শত টাকা খরচ করে ফেলা সত্ত্বেও মাত্র একশত টাকাই তার পকেট থেকে বরে হচ্ছে এবং সর্বাবস্থায় দুইশত টাকা তার পকেটেই থেকে যাচ্ছে, তাহলে এই উপদেশের আদৌ কোন প্রয়োজন থাকে কি?

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

এরপর তারা যখন তাদের (ইদ্দতের) সময়ের সমাপ্তির পর্যায়ে পৌছবে তখন হয় তাদেরকে ভালভাবে (বিবাহ বন্ধনে) আবদ্ধ রাখো নয় ভালভাবেই তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও।[৬] এমন দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাও তোমাদের মধ্যে যারা ন্যায়বান।[৭] হে সাক্ষীরা, আল্লাহর জন্য সঠিকভাবে সাক্ষ দাও।

যারা আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে[৮] তাদের জন্য উপদেশ হিসেবে এসব কথা বলা হচ্ছে। যে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তার জন্য কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সৃষ্টি করে দেবেন।[৯]

৬. অর্থাৎ এক অথবা দুই তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীকে দাম্পত্য বন্ধনে রাখবে কি রাখবে না সে বিষয়ে 'ইদ্দতকাল' শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। যদি রাখতে চাও তাহলে সদাচরণের উদ্দেশ্যেই রাখ। এ উদ্দেশ্যে রাখবে না যে, তাকে জ্বালাতন ও উত্যক্ত করার জন্য 'রুজু' করবে তারপর আবার তালাক দিয়ে তার ইদ্দতকালকে দীর্ঘায়িত করতে থাকবে। আর যদি বিদায় দিতে হয় তাহলে সৎ ও ভাল মানুষের মত কোন প্রকার ঝগড়াঝাঁটি ছাড়াই বিদায় দিয়ে দাও, মহরানা বা মহরানার আংশিক যদি পাওনা থাকে তা পরিশোধ করে দাও এবং সামর্থ অনুযায়ী কিছু না কিছু মুতআ' (কিছু ব্যবহার্য সামগ্রী) হিসেবে দাও। সূরা বাকারার ২৪১ আয়াতে এ বিষয়েই বলা হয়েছে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আহযাব, টীকা ৮৬)।

৭. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এর অর্থ তালাক এবং 'রুজু' উভয় বিষয়েই সাক্ষী রাখা। (ইবনে জারীর) হযরত ইমরান ইবনে হুসাইনকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে পরে 'রুজু' করেছে। কিন্তু সে তালাক ও 'রুজু' করা কোনটির ব্যাপারেই কাউকে সাক্ষী বানায়নি। তিনি জবাব দিলেন ঃ তুমি তালাকও দিয়েছ সুন্নাতের পরিপন্থী পন্থায় এবং 'রুজু'ও করেছ সুন্নাতের পরপন্থী পন্থায়। তালাক দেয়া এবং 'রুজু' দু'টি ক্ষেত্রেই সাক্ষী রাখ এবং ভবিষ্যতে এরূপ কাজ আর করবে না। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা) কিন্তু চার মাযহাবের ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, তালাক দেয়া, রুজু করা এবং বিচ্ছেদের ব্যাপারে সাক্ষী রাখা এসব কাজের শুদ্ধতার জন্য শর্ত নয়। অর্থাৎ সাক্ষী না রাখলে তালাক কার্যকর হবে না এবং 'রুজু' ও বিচ্ছেদও হবে না এমনটি নয়। বরং সতর্কতার জন্য এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে উভয়ের কেউ–ই পরে কোন ঘটনা

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

এবং এমন পন্থায় তাকে রিযিক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।[১০] যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করে থাকেন।[১১] আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্য একটা মাত্রা ঠিক করে রেখেছেন।

অস্বীকার করতে না পারে, ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হলে সহজেই তার ফায়সালা দেয়া যায় এবং সংশয় ও সন্দেহের পথ বন্ধ করা যায়। এ নির্দেশটি হুবহু وَاَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ "তোমরা যখন পরস্পর ক্রয়–বিক্রয় করবে তখন সাক্ষী রাখবে" (আল বাকারাহ, ২৮২) এ আয়াতে বর্ণিত নির্দেশের মত। এর নির্দেশের অর্থ এ নয় যে, ক্রয়–বিক্রয়ের ব্যাপরে সাক্ষী রাখা ফরয এবং সাক্ষী না রাখলে ক্রয়–বিক্রয় বৈধ ও সঠিক হবে না। বরং এটি একটি বিজ্ঞোচিত উপদেশ, বিভিন্ন রকমের ঝগড়া বিবাদ ও বিরোধের পথ বন্ধ করার জন্য এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ অনুসারে কাজ করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে। অনুরূপ তালাক দেয়া এবং 'রুজু' করার ক্ষেত্রেও সঠিক কথা হলো, এর প্রতিটি কাজ সাক্ষী ছাড়া আইনগত বৈধতা লাভ করে। কিন্তু সাবধানতার দাবী হলো, যে কাজই করা হোক না কেন তা করার সময় বা তার পরে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাতে হবে।

৮. এ কথা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওপরে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা নসীহত ও উপদেশ মাত্র, এর আইনগত কোন মর্যাদা নেই। কেউ যদি সুন্নাতের পরিপন্থী পন্থায় তালাক দিয়ে ফেলে, ইদ্দতের হিসেব সংরক্ষণ না করে, স্ত্রীকে যুক্তিগ্রাহ্য কোন কারণ ছাড়া বাড়ী থেকে বের করে দেয়, ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে রুজু করলে স্ত্রীকে জ্বালাতন ও উত্যক্ত করার জন্য তা করে, বিদায় দিলে ঝগড়া বিবাদ করে বিদায় দেয় এবং তালাক দেয়া, রুজু করা ও বিচ্ছেদ ঘটানো কোন ব্যাপারেই সাক্ষী না রাখে তাহলে তালাক দেয়া, রুজু করা এবং বিচ্ছেদের আইনগত ফলাফলে কোন পার্থক্য হবে না। তবে আল্লাহ তা'আলার উপদেশের পরিপন্থী কাজ করা থেকে প্রমাণ হবে যে, তার মনে আল্লাহ ও আখেরাত সম্পর্কে সঠিক ঈমান নেই। তাই সে এমন কর্মপন্থা অনুসরণ করেছে যা একজন সাচ্চা মু'মিনের পক্ষে করা উচিত নয়।

৯. পূর্বের বক্তব্য থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে কাজ করার অর্থ এখানে সুন্নাত অনুসারে তালাক দেয়া, ঠিকমত ইদ্দতের হিসেব রাখা, স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে না দেয়া, ইদ্দতের শেষ পর্যায়ে যদি স্ত্রীকে রাখতে হয় তাহলে মিলেমিশে থাকা ও সদাচরণের নিয়তে রুজু করা, আর বিচ্ছিন্ন হতে হলে ভাল ও সৎ মানুষের মত তাকে বিদায় করে দেয়া এবং তালাক দেয়া, রুজু করা বা বিচ্ছেদ ঘটানো যাই করা হোক না কেন সে বিষয়ে দু'জন ন্যায়বান লোককে সাক্ষী রাখা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী হলো, যে ব্যক্তি এভাবে তাকওয়া অবলম্বন করে কাজ করবে তার জন্য আমি কোন না কোন مخرج (অর্থাৎ জটিলতা ও বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার

وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ④ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا ⑤

তোমাদের যেসব স্ত্রীলোকের মাসিক বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাদের ব্যাপারে যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে (জেনে নাও যে,) তাদের ইদ্দতকাল তিন মাস।[১২] আর এখনো যাদের মাসিক হয়নি[১৩] তাদের জন্যও একই নির্দেশ। গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দতের সীমা সন্তান প্রসব পর্যন্ত।[১৪] যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার কাজ সহজসাধ্য করে দেন। এটা আল্লাহর বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার গোনাহসমূহ মুছে ফেলবেন এবং তাকে বড় পুরস্কার দেবেন।[১৫]

উপায়) করে দেবো। এভাবে আপনা থেকেই এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যে ব্যক্তি এসব ব্যাপারে তাকওয়া বা আল্লাহকে ভয় করে কাজ করবে না সে নিজেই তার জন্য এমন সব সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি করে নেবে যা থেকে বাঁচার কোন পথ খুঁজে পাবে না।

এ কথাটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায়, যেসব লোকের মতে বেদয়াতী তালাক আদৌ কার্যকর হয় না এবং যারা এক সাথে একই তুহুরে দেয়া তিন তালাককে এক তালাক বলে গণ্য করেন তাদের মতটি সঠিক নয়। কারণ, বেদয়াতী তালাক যদি কার্যকরীই না হয় তাহলে মোটেই কোন জটিলতা সৃষ্টি হয় না যা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায়ের প্রয়োজন হতে পারে। আর একসাথে তিন তালাক দিয়ে দিলেও যদি এক তালাকই হয় তাহলেও রক্ষা পাওয়ার কোন উপায়ের প্রয়োজন হয় না। এ অবস্থায় কি এমন জটিলতা থাকতে পারে যা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন প্রয়োজন দেখা দিবে?

১০. অর্থাৎ ইদ্দত পালন কালে তালাক প্রদত্ত স্ত্রীকে বাড়ীতে রাখা, তার খরচপত্র বহন করা এবং বিদায় দান কালে তাকে মহরানা ও কিছু ব্যবহার্য সামগ্রী দিয়ে বিদায় করার বিষয়টা নিসন্দেহে ব্যক্তির জন্য একটা আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। যে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট ও ভীতশ্রদ্ধ হওয়ার কারণে স্বামী তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে মনস্থির করে নিয়েছে সে তার জন্য অর্থ ব্যয় নিশ্চিয়ই অপছন্দ করবে। তদুপরি স্বামী যদি অভাবী হয় তাহলে এই অর্থ ব্যয় তার জন্য আরো মনকষ্টের কারণ হবে। কিন্তু আল্লাহভীরু লোকদের এসব বরদাশত করা উচিত। তোমাদের মন সংকীর্ণ হলে হতে পারে। কিন্তু রিযিক দেয়ার জন্য আল্লাহর হাত সংকীর্ণ নয়। যদি তার নির্দেশ অনুসারে অর্থ ব্যয় করো তাহলে তিনি এমন

সব পথে তোমাকে রিযিক দেবেন যে পথে রিযিক পাওয়ার কল্পনাও তুমি করতে পারনি।

১১. অর্থাৎ কোন শক্তি আল্লাহর নির্দেশের বাস্তবায়ন রোধ করতে পারে না।

১২. যেসব মহিলার ঋতুস্রাব একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং অধিক বয়সের কারণে যারা ঋতুস্রাব হওয়ার আশা করে না তাদেরকে যেদিন তালাক দেয়া হয়েছে সেদিন থেকে তাদের 'ইদ্দত' গণনা শুরু হবে। আর তিন মাস বলতে তিনটি চান্দ্র মাস বুঝানো হয়েছে। তালাক যদি চান্দ্র মাসের শুরুতে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে চাঁদ দেখা যাওয়া অনুসারে ইদ্দত গণনা হবে। আর যদি মাসের মাঝে কোন সময় তালাক দেয়া হয়ে থাকে তাহলে ইমাম আবু হানীফার (র) মতে, ৩০ দিনে মাস ধরে তিন মাস পূরণ করতে হবে। ('বাদায়েউস সানায়ে')

যেসব মহিলার ঋতুস্রাবের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অনিয়ম আছে তাদের ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব বর্ণনা করেছেন যে, হযরত 'উমর (রা) বলেছেন ঃ যে মহিলাকে তালাক দেয়া হয়েছে দুই একবার ঋতুস্রাব হওয়ার পর যদি তার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে ৯ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এ সময়ে যদি তার গর্ভ প্রকাশ পায় তাহলে ভাল। অন্যথায় ৯ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সে আরো তিন মাস ইদ্দত পালন করবে। এরপর সে অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য উপযুক্ত ও বৈধ হবে।

ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও ইকরিমার মতে, যে মহিলার এক বছর পর্যন্ত ঋতুস্রাব হয়নি তার ইদ্দতের সময়–কাল তিন মাস।

তাউসের মতে, যে মহিলার বছরে একবার ঋতুস্রাব হয় তার ইদ্দতকাল তিনবার ঋতুস্রাব হওয়া। হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা) এবং হযরত যায়েদ (রা) ইবনে সাবেতও এই মত পোষণ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মালেক বর্ণনা করেছেন যে, হাব্বান নামক এক ব্যক্তি এমন অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দেয় যখন সে তার সন্তানকে দুধ দিচ্ছিল। এমতাবস্থায় এক বছর চলে যায় কিন্তু তার ঋতুস্রাব হয় না। এরপর ঐ ব্যক্তি মারা যায়। তালাকপ্রাপ্তা তার উত্তরাধিকারীনী হওয়ার দাবী পেশ করে। বিষয়টি হযরত উসমানের সামনে পেশ করা হলে তিনি হযরত আলী (রা) ও হযরত যায়েদ (রা) ইবনে সাবেতের কাছে পরামর্শ চান। তাঁদের উভয়ের সাথে পরামর্শ করে হযরত উসমান ফায়সালা দিলেন যে, নারী উক্ত স্বামীর উত্তরাধিকারিনী হবে। তাঁর দলীল ছিল এই যে, যে সব মহিলা ঋতুস্রাব হবে না বলে নিরাশ হয়ে গিয়েছে সে তাদের মত নয় আবার যেসব মহিলাদের এখনো ঋতুস্রাব হয়নি তাদের মতও নয়। সুতরাং যে ঋতুস্রাব চলাকালে তাকে তালাক দেয়া হয়েছে স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত সে উক্ত ঋতুস্রাবেই ছিল। তার ইদ্দত কাল এখনো শেষ হয়নি, বরং অবশিষ্ট আছে।

হানাফীদের মতে, যে স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু তা অধিক বয়স জনিত কারণে বন্ধ হয়নি যা পরে আবার শুরু হওয়ার আশাই থাকে না এমন স্ত্রীলোকের

ইদ্দত গণনা করতে হবে ঋতুস্রাব দ্বারা যদি তা পরে শুরু হয় কিংবা যে বয়সে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় সেই বয়সের বিচারে। এ রকম বয়সে উপনীত হয়ে থাকলে সে তিন মাস ইদ্দত পালন করার পর বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এটাই ইমাম শাফেয়ীর (র), ইমাম সাওরী এবং ইমাম লাইসের মত। হযরত আলী (রা), হযরত উসমান (রা) এবং হযরত যায়েদ (রা) ইবনে সাবেতের মাযহাবও এটাই।

ইমাম মালেক হযরত উমর এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মত হচ্ছে, স্ত্রী প্রথমে ৯ মাস অতিবাহিত করবে। যদি এই সময়ের মধ্যে ঋতুস্রাব শুরু না হয় তাহলে সে বার্ধক্য জনিত কারণে স্থায়ীভাবে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া স্ত্রীলোকের মত তিন মাস ইদ্দত পালন করবে। ইবনুল কাসেম ইমাম মালেকের অনুসৃত মতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, যখন শেষবারের মত স্ত্রীলোকটির ঋতুস্রাব বন্ধ হয়েছিল তখন থেকে ৯ মাসের গণনা শুরু হবে, তালাক দেয়ার সময় থেকে নয়। (জাসসাসের আহকামুল কুরআন এবং কাসানীর বাদায়েউস্ সানায়ে' গ্রন্থদ্বয় থেকে এসব বিবরণ গৃহীত হয়েছে)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মাযহাব হচ্ছে, যে নারীর ইদ্দতের হিসেব হায়েজ থেকে শুরু হয়েছিল ইদ্দত চলাকালে তার ঋতুস্রাব যদি বার্ধক্যজনিত কারণে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সে ঋতুবর্তী নারীদের মত ইদ্দত পালন না করে বৃদ্ধদের মত ইদ্দত পালন করবে। যদি তার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু কি কারণে বন্ধ হয়েছে তা জানা না যায় তাহলে প্রথমে গর্ভসঞ্চারের সন্দেহে ৯ মাস সময়–কাল অতিবাহিত করবে এবং পরে তিনমাস ইদ্দত পূরণ করতে হবে। তবে ঋতুস্রাব কেন বন্ধ হয়েছে তা যদি জানা যায়, যেমন ঃ কোন রোগে আক্রান্ত হয় অথবা সন্তানকে স্তন্যদান করে অথবা অন্য কোন কারণ থাকে তাহলে যতদিন ঋতুস্রাব পুনরায় শুরু না হবে এবং ঋতুস্রাবের হিসেবে ইদ্দত গণনা শুরু না হতে পারবে অথবা সে ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার মত বৃদ্ধবয়সে উপনীত হবে এবং রুদ্ধস্রাব বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মত ইদ্দত পালন করতে পারবে ততো দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। (আল ইনসাফ)

১৩. ঋতুস্রাব যদি অল্প বয়সের জন্য না হয়ে থাকে অথবা কিছু সংখ্যক মহিলাদের অনেক দেরীতে হয়ে থাকে বলে না হয়ে থাকে এবং বিরল কিছু ঘটনা এমনও হয়ে থাকে যে সারা জীবন কোন স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব হয় না এরূপ সর্বক্ষেত্রে এ রকম স্ত্রীলোকদের ইদ্দত রুদ্ধস্রাব বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মত। অর্থাৎ তাদের ইদ্দত তালাকের সময় থেকে তিন মাস।

এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, কুরআন মজীদের স্পষ্ট বক্তব্য অনুসারে যে স্ত্রীর সাথে তার স্বামী নির্জনবাস করেছে কেবল তার ক্ষেত্রেই ইদ্দত পালনের প্রশ্ন আসে। কারণ, নির্জনবাসের পূর্বে তালাক হলে আদৌ কোন ইদ্দত পালন করতে হয় না। (আল আহযাব, ৪৯) সুতরাং যেসব মেয়েদের এখনো ঋতুস্রাব শুরু হয়নি তাদের ইদ্দত বর্ণনা করা স্পষ্টত এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ বয়সে মেয়েদের বিয়ে শুধু জায়েযই নয়, বরং তার সাথে স্বামীর নির্জনবাস এবং মেলামেশাও জায়েয। এখন এ কথা স্পষ্ট যে, কুরআন যে জিনিসকে জায়েয বলে ঘোষণা করেছে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার অধিকার কোন মুসলমানের নেই।

এখনো ঋতুস্রাব হয়নি এমন কোন মেয়েকে যদি তালাক দেয়া হয় এবং ইদ্দত চলাকালে তার ঋতুস্রাব শুরু হয় তাহলে সে উক্ত ঋতুস্রাব থেকে পুনরায় ইদ্দত শুরু করবে। তার ইদ্দত হবে ঋতুবতী মহিলাদের মত।

১৪. সমস্ত আলেম এ বিষয়ে একমত যে, তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। কিন্তু যে মহিলার স্বামী গর্ভকালে মারা গিয়েছে তার ব্যাপারেও এ নির্দেশ প্রযোজ্য কি না সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। এ মতভেদের কারণ হলো, যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা যায় সূরা বাকারার ২৩৪ আয়াতে তার ইদ্দতকাল ৪ মাস দশদিন বলা হয়েছে। এ নির্দেশ সমস্ত বিধবা মহিলাদের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য না কেবল গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য সে ব্যাপারে সেখানে কোন স্পষ্ট বক্তব্য নেই।

হযরত আলী (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ দু'টি আয়াতের বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী নারীর ইদ্দত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তো বটেই। কিন্তু গর্ভবতী বিধবা নারীর ইদ্দত হচ্ছে দু'টি সময়কালের মধ্যে বিলম্বিত দীর্ঘতর সময়টি। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত এবং গর্ভবতী নারীর ইদ্দতের মধ্যে যেটি বেশী দীর্ঘতর সেটিই তার ইদ্দত। উদাহরণ স্বরূপ, তার গর্ভস্থ সন্তান যদি ৪ মাস দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে তাকে ৪ মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। কিন্তু তার সন্তান যদি উক্ত সময়ের মধ্যে ভূমিষ্ঠ না হয় তাহলে যে সময় তার সন্তান প্রসব হবে তখন তার ইদ্দত পূরণ হবে। ইমামিয়াগণ এ মতটি অনুসরণ করে থাকেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতে, সূরা তালাকের এই আয়াতটি সূরা বাকারার আয়াতের পরে নাযিল হয়েছে। অতএব পরে নাযিল হওয়া নির্দেশ পূর্বে নাযিল হওয়া আয়াতের নির্দেশকে গর্ভহীনা বিধবাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা যাই হোক না কেন গর্ভবতী সমস্ত নারীর ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এই মত অনুসারে গর্ভবতী নারীর সন্তান প্রসব স্বামী মৃত্যুর পরপরই হোক কিংবা ৪ মাস দশ দিন দীর্ঘায়িত হোক সর্বাবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র সে ইদ্দত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। হযরত উবাই ইবনে কা'বের একটি রেওয়ায়াত এ মতের সমর্থন করে। তিনি বর্ণনা করেন, সূরা তালাকের এ আয়াত নাযিল হলে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা উভয় শ্রেণীর নারীর জন্যই কি এ নির্দেশ? তিনি জবাব দিলেন হাঁ। অন্য একটি হাদীস অনুসারে নবী (সা) আরো স্পষ্ট করে বললেন : اجل كل حامل ان تضع ما فى بطنها "সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সময় প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর ইদ্দতকাল।" (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হাজার বলেন : এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণের অবকাশ থাকলেও হাদীসটি যেহেতু বেশ কিছু সংখ্যক সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে তাই স্বীকার করে নিতে হয় যে, এর কোন ভিত্তি অবশ্যই আছে)। এর স্বপক্ষে এর চেয়েও মজবুত সমর্থন পাওয়া যায় সুবাইআ আসলামিয়ার ঘটনা থেকে। ঘটনাটি ঘটেছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে। সুবাইআ আসলামিয়া গর্ভবতী অবস্থায় বিধবা হয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পর (কিছু সংখ্যক রেওয়ায়াতে ২০ দিন।

কোনটিতে ২৩ দিন, কোনটিতে ২৫ দিন, কোনটিতে ৪০ দিন এবং কোনটিতে ৩৫ দিন) তার সন্তান প্রসব হয়েছিল। তার ব্যাপারে নবীর (সা) কাছে ফতোয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি তাকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছিলেন। বুখারী ও মুসলিম হযরত উম্মে সালামা থেকে কয়েকটি সূত্রে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। আবার এ ঘটনাটি বুখারী, মুসলিম, ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজা বিভিন্ন সনদে হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা থেকেও বর্ণনা করেছেন। মুসলিম সুবাইআ আসলামিয়ার নিজের এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন ঃ আমি সা'দ ইবনে খাওলার স্ত্রী ছিলাম। বিদায় হজ্জের সময় আমার স্বামী মারা গিয়েছিলেন। আমি তখন গর্ভবতী ছিলাম। স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পরই আমার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। একজন আমাকে বললো, তুমি ৪ মাস দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে বিয়ে করতে পারবে না। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি ফতোয়া দিলেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তুমি হালাল হয়ে গিয়েছ, এখন ইচ্ছা করলে আবার বিয়ে করতে পার। বুখারীও এ হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন।

বিপুল সংখ্যক সাহাবী থেকে এ মতটিই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, আবদুর রায্যাক, ইবনে আবী শায়বা এবং ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে গর্ভবতী বিধবা নারীর ইদ্দত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সময় তার ইদ্দত। এ কথা শুনে আনসারদের একজন লোক বললো, হযরত উমর তো এ কথাও বলেছিলেন যে, স্বামীর দাফন কাফন পর্যন্ত হয়ে সারেনি, বরং তার লাশ তখনো মৃত্যু শয্যায় পড়ে আছে এমতাবস্থায়ও যদি স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে তখনই সে পুনরায় বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য হালাল হবে। হযরত আবু হুরাইরা (রা), হযরত আবু মাসউদ বদরী (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা)ও এ মত পোষণ করেছেন। চার ইমাম এবং অন্য সব বড় বড় ফিকাহবিদও এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

শাফেয়ী মাযহাবের মতে, গর্ভবতী স্ত্রীর পেটে যদি একাধিক বাচ্চা থাকে তাহলে সর্বশেষ বাচ্চাটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে। এমন কি মৃত বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হলেও তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় থেকে ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। গর্ভপাতের ক্ষেত্রে ধাত্রী যদি তার ধাত্রী বিদ্যার আলোকে একথা বলে যে, তা শুধু রক্তপিণ্ড ছিল না বরং তা মানুষের আকৃতি লাভ করেছিল, অথবা গর্ভস্থ বস্তুর গিঁট ছিল না, বরং মানবদেহ সৃষ্টির উপাদান ছিল, তাহলে তাদের কথা গ্রহণ করা হবে এবং ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে (মুগনিউল মুহতাজ)। হাম্বলী ও হানাফী মাযহাবের মতামতও প্রায় অনুরূপ। তবে গর্ভপাতের ক্ষেত্রে তাদের মত হলো, মানুষের দেহকাঠামো স্পষ্ট হয়ে না উঠলে শুধুমাত্র "তা মানবদেহ সৃষ্টির মূল উপাদান ছিল" ধাত্রীদের এই বক্তব্যের ওপর নির্ভর করা হবে না এবং এভাবে ইদ্দতও শেষ হবে না (বাদায়েউস্ সানায়ে'—আল ইনসাফ)। কিন্তু বর্তমান সময়ে ডাক্তারী পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এ কথা জানা আর কঠিন নয় যে গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসা বস্তু আদতেই মানব আকৃতির মত কোন কিছু ছিল, না গর্ভস্থ পদার্থের কোন গিঁট বা জটপাকানো কিছু ছিল অথবা জমাট বাঁধা রক্তের মত কোন কিছু ছিল। তাই বর্তমানে যেসব ক্ষেত্রে ডাক্তারদের মতামত জানা সম্ভব সেসব ক্ষেত্রে সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে যে, যাকে গর্ভপাত বলা হচ্ছে তা প্রকৃতই

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ⑥ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ⑦

তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী যে রকম বাসগৃহে থাক তাদেরকেও (ইদ্দতকালে) সেখানে থাকতে দাও। তাদেরকে বিপদগ্রস্ত করার জন্য উত্যক্ত করো না।[১৬]

আর তারা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত[১৭] তাদের জন্য খরচ করো। তারপর তারা যদি তোমাদের সন্তানদের বুকের দুধ পান করায় তাহলে তাদেরকে তার বিনিময় দাও এবং (বিনিময়দানের বিষয়টি) তোমাদের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উত্তম পন্থায় ঠিক করে নাও।[১৮] কিন্তু (বিনিময় ঠিক করতে গিয়ে) তোমরা যদি একে অপরকে কষ্টকর অবস্থার মধ্যে ফেলতে চেয়ে থাক তাহলে অন্য মহিলা বাচ্চাকে দুধ পান করাবে।[১৯] সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুপাতে খরচ করবে। আর যাকে স্বল্প পরিমাণ রিযিক দেয়া হয়েছে সে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে খরচ করবে। আল্লাহ যাকে যতটা সামর্থ দিয়েছেন তার চেয়ে অধিক দায়িত্ব তিনি তার ওপর চাপান না। অসম্ভব নয় যে, অসচ্ছলতার পর আল্লাহ তাকে সচ্ছলতা দান করবেন।

গর্ভপাত কি না এবং তা দ্বারা ইদ্দতকাল শেষ হয়েছে না হয়নি। তবে যেসব ক্ষেত্রে এ রকম ডাক্তারী পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্ভব নয় সেসব ক্ষেত্রে হাম্বলী ও হানাফী মাযহাবের মতামতই অধিক সতর্কতামূলক। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ধাত্রীদের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়।

১৫. এই উপদেশটি যদিও সবার জন্য এবং মানবজীবনের সব পরিস্থিতিতেই তা প্রযোজ্য। কিন্তু পূর্বাপর প্রসঙ্গের বিশেষ এই প্রেক্ষিতে এ উপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের এ মর্মে সতর্ক করা যে ওপরে যেসব নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে তা পালন করতে

গিয়ে দায়িত্বের যত বড় বোঝাই তোমাদের ওপর পড়ুক না কেন আল্লাহর ভয় মনে রেখে সর্বাবস্থায় তা মেনে চল। আল্লাহ তোমাদের কাজ সহজ করে দেবেন, তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন এবং তোমাদেরকে বড় পুরস্কার দান করবেন। এ বিষয় স্পষ্ট যে, তালাকপ্রাপ্তা যেসব নারীর ইদ্দতকাল তিন মাস নির্ধারিত তাদের ইদ্দতের সময় সেসব নারীর ইদ্দতের তুলনায় দীর্ঘতর হবে, যাদের ইদ্দতকাল তিন হায়েজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দতকাল তো এর চেয়েও কয়েকমাস বেশী দীর্ঘায়িত হতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে চাইলে পুরো এই সময়টার জন্য তার বাসস্থান এবং খোরপোষের দায়িত্ব বহন করা তার জন্য অসহনীয় বোঝা বলে মনে হবে। কিন্তু আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর নির্দেশসমূহ পালনের উদ্দেশ্যে যে বোঝা বহন করা হবে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো, তিনি মেহেরবানী করে সে বোঝা হাল্কা করে দেবেন এবং তার বিনিময়ে এত বড় পুরস্কার দেবেন, যা দুনিয়ায় বহনকৃত এই ক্ষুদ্র বোঝার তুলনায় অনেক অনেক বেশী মূল্যবান হবে।

১৬. স্ত্রীকে রিজয়ী তালাক দেয়া হয়ে থাকলে স্বামীর ওপর তাকে বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়ার দায়িত্ব বর্তায়। এ বিষয়ে সমস্ত ফিকাহবিদ একমত। স্ত্রী গর্ভবতী হলে তাকে রিজয়ী তালাক দেয়া হয়ে থাকুক বা চূড়ান্ত বিচ্ছেদকারী বায়েন তালাক দেয়া হয়ে থাকুক, সর্বাবস্থায় সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাকে বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়ার দায়িত্ব স্বামীর, এ বিষয়েও তারা একমত। তাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ হয়েছে তা হলো, অগর্ভবতী চূড়ান্ত তালাকপ্রাপ্তা (অর্থাৎ যাকে চূড়ান্ত বিচ্ছেদকারী তালাক দেয়া হয়েছে) সে কি বাসস্থান ও খোরপোষ উভয়টিই পাওয়ার অধিকারীনী না কেবল বাসস্থানলাভের অধিকারীনী? অথবা দু'টির কোনটির অধিকারিনী নয়?

একদল ফিকাহবিদের মতে, সে বাসস্থান ও খোরপোষ উভয়টিই লাভের অধিকারীনী। এ মত পোষণ করেছেন হযরত উমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আলী ইবনে হুসাইন (ইমাম যায়নুল আবেদীন), কাজী শুরাইহ এবং ইবরাহীম নাখায়ী। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। ইমাম সুফিয়ান সাওরী এবং হাসান ইবনে সালেহ–এর মাযহাবও এটিই। দারু কুতনীর একটি হাদীসে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

হাদীসটিতে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন ঃ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ। "তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক ইদ্দতকালে বাসস্থান ও খোরপোষ লাভের অধিকারিনী।" এ মতের পক্ষে আরো সমর্থন পাওয়া যায় সেসব হাদীস থেকে যাতে বলা হয়েছে, হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীসকে হযরত উমর এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে, একজন মাত্র নারীর কথার ওপর নির্ভর করে আমি আমার রবের কিতাব ও আমার নবীর সুন্নাত পরিত্যাগ করতে পারি না। এ থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সুন্নাতটি হযরত উমরের অবশ্যই জানা ছিল যে, এরূপ স্ত্রীলোকের বাসস্থান ও খোরপোষ লাভের অধিকার আছে। বরং ইবরাহীম নাখায়ীর একটি বর্ণনায় এ কথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত উমর ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন ঃ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةُ

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, এরূপ স্ত্রীলোক বাসস্থান ও খোরপোষ উভয়টি লাভ করার অধিকারিনী।"

ইমাম আবু বকর জাস্সাস তাঁর আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এ মাসয়ালা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ মতের পক্ষে প্রথম প্রমাণ পেশ করেছেন এই যে, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কেবল এতটুকু বলেছেন ঃ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দাও।" আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ সেই ব্যক্তির জন্যও তো প্রযোজ্য যে প্রথমে দুই তালাক দিয়ে তারপর 'রুজু' করেছে এবং এখন তার কেবল এক তালাক দেয়ার অধিকার আছে। তাঁর দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তালাক দেয়ার এ পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে, যে তুহরে সহবাস করা হয়নি হয় সেই তুহরে তালাক দেবে, অথবা এমন অবস্থায় তালাক দেবে যখন নারীর গর্ভবতী হওয়ার বিষয় প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রথম, দ্বিতীয় এবং শেষ তালাকের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। অতএব, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ তোমরা যেখানে থাক তাদেরকেও সেখানেই রাখ সর্ব প্রকার তালাকের সাথেই সম্পর্কিত বলে ধরে নেয়া হবে। তিনি তৃতীয় যে দলিলটি পেশ করেন তাহচ্ছে, তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী মহিলা সে রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা হোক বা চূড়ান্ত বিচ্ছেদকারী তালাকপ্রাপ্তা হোক, তাকে বাসস্থানও খোরপোষ দেয়া স্বামীর জন্য ওয়াজিব। রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা অগর্ভবতী নারীকেও এ দু'টি দেয়া স্বামীর জন্য ওয়াজিব। এ থেকে বুঝা যায় যে, বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়া গর্ভবতী হওয়ার কারণে ওয়াজিব নয়, বরং তা এ কারণে ওয়াজিব যে, এ দুই শ্রেণীর তালাকপ্রাপ্তা শরয়ী বিধান অনুসারেই স্বামীর বাড়ী থাকতে বাধ্য। এখন অগর্ভবতী তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ক্ষেত্রেও যদি এ নির্দেশ হয়ে থাকে তাহলে তার বাসস্থান ও খোরপোষ দেয়া স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

অপর একদল ফিকাহবিদের মতে, তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দতকালে বাসস্থান পাওয়ার অধিকার অবশ্যই আছে কিন্তু খোরপোষ পাওয়ার অধিকার নেই। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, আতা, শা'বী, আওযায়ী, লাইস এবং আবু উবাইদ রাহিমাহুমুল্লাহ এ মত পোষণ করেছেন। আর ইমাম মালেকও এ মতটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী যে এ মত থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন মুগনিউল মুহতাজ গ্রন্থে তা বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

তৃতীয় আরেকটি দলের মতে, তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত চলাকালে বাসস্থান ও খোরপোষ কোনটা লাভের অধিকার নেই। এ মত হাসান বাসরী, হাম্মাদ ইবনে আবী লায়লা, আমর ইবনে দীনার, তাউস, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ্ এবং আবু সাওরের। ইবনে জারীরের বর্ণনা মতে হযরত ইবনে আব্বাসও এ মত পোষণ করতেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইমামিয়াগণও এ মত গ্রহণ করেছেন। মুগনিউল মুহতাজ গ্রন্থে শাফেয়ী মাযহাবের এ মত বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে,

تَجِبُ سُكْنٰى لِمُعْتَدَّةٍ طَلَاقٍ حَبَلٍ اَوْحَامِلٍ وَلَا بَائِنٍ .... وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا كِسْوَةً –

"যে নারী তালাকের কারণে ইদ্দত পালন করছে সে গর্ভবতী হোক বা না হোক তার বাসস্থান লাভের অধিকার আছে এবং তা দেয়া ওয়াজিব.......তবে বায়েন তালাকপ্রাপ্তা অগর্ভবতী নারীর বাসস্থান ও কাপড় চোপড় কোন কিছুই পাওয়ার অধিকার নেই।"

এ মতের স্বপক্ষে একদিকে কুরআনের আয়াত لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا "তুমি জান না, এরপরে আল্লাহ তা'আলা হয়তো সমঝোতা ও বুঝাপড়ার কোন উপায় সৃষ্টি করে দেবেন।" এ থেকে তারা যে সিদ্ধান্তে পৌছেন তা হচ্ছে, এ কথা রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, তিন তালাকপ্রাপ্তাদের ক্ষেত্রে নয়। তাই তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বাড়ীতে রাখার আদেশও রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। তাদের দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, হাদীস গ্রন্থসমূহে বিপুল সংখ্যক সহীহ সনদে বর্ণিত ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীস।

এই ফাতেমা (রা) বিনতে কায়েস আল ফিহ্‌রিয়া ছিলেন প্রথম পর্যায়ে হিজরাতকারী মহিলাদের একজন। তাঁকে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা বলে মনে করা হতো। হযরত উমরের (রা) শাহাদাতের পর তাঁর বাড়ীতেই মজলিসে শুরার অধিবেশন হয়েছিল। প্রথমে তিনি আবু আমর ইবনে হাফ্‌স্ ইবনুল মুগীরাতুল মাখযূমীর স্ত্রী ছিলেন। তাঁর স্বামী তাঁকে তিন তালাক দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম তাঁকে হযরত উসামা ইবনে যায়েদের সাথে বিয়ে দেন। তাঁর ঘটনা হলো, তাঁর স্বামী আবু 'আমর তাঁকে প্রথমে দুই তালাক দিয়েছিলেন। পরে হযরত আলীর সাথে যখন তাঁকে ইয়ামানে পাঠানো হলো, তখন তিনি সেখান থেকে অবশিষ্ট তৃতীয় তালাকটিও দিয়ে দেন। কোন কোন রেওয়ায়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, আবু আমর নিজেই তাঁর আত্মীয়–স্বজনদের পত্র মারফত জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইদ্দত পালনকালে তারা যেন তাঁকে বাড়ীতেই রাখে এবং তার ব্যয়ভার বহন করে। কোন কোন রেওয়ায়াতে উল্লেখিত আছে যে, তিনি নিজেই খোরপোষ ও বাসস্থানের দাবী করেছিলেন। তবে ঘটনা যাই ঘটে থাকুক না কেন, স্বামীর আত্মীয়–স্বজন তাঁর অধিকার স্বীকার করলেন না। এরপর তিনি দাবী নিয়ে নবীর (সা) কাছে গেলেন। নবী (সা) এই বলে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে, তুমি খোরপোষ ও বাসস্থান কিছুই পাওয়ার অধিকারী নও। একটি রেওয়ায়াতে আছে যে, নবী (সা) বলেছিলেন ঃ

اِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنٰى لِلْمَرْاَةِ عَلٰى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَاِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنٰى –

"স্বামীর ওপর স্ত্রীর খোরপোষ ও বাসস্থান পাওয়ার অধিকার থাকে তখন যখন স্বামীর রুজু করার অধিকার থাকে। কিন্তু যখন রুজু করার অধিকার থাকে না তখন খোরপোষ ও বাসস্থানলাভের অধিকারও থাকে না। (মুসনাদে আহমাদ)

তাবারানী এবং নাসায়ীও প্রায় অনুরূপ রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত রেওয়ায়াতের শেষ দিকের ভাষা হলো,

فَاِذَا كَانَتْ لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنٰى

"কিন্তু যে ক্ষেত্রে সে অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে আর পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হচ্ছে না সে ক্ষেত্রে তার খোরপোষ ও বাসস্থানের কোন অধিকার নেই।"

এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর নবী (সা) প্রথমে তাকে উম্মে শারীকের গৃহে থাকার নির্দেশ দেন কিন্তু পরে তাঁকে বলেন, তুমি ইবনে উম্মে মাকতূমের গৃহে অবস্থান করো।

কিন্তু যারা এ হাদীস গ্রহণ করেননি তাদের যুক্তি হলো ঃ

প্রথমত, তাঁকে স্বামীর আত্মীয়–স্বজনের বাড়ী ছাড়তে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এ জন্যে যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত কর্কশ ভাষী। স্বামীর আত্মীয়–স্বজন তাঁর বদ মেজাজের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব বলেন ঃ ঐ মহিলা তাঁর হাদীস বর্ণনা করে মানুষকে ফিতনার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তিনি ছিলেন খুব মুখড়া। তাই তাঁকে ইবনে উম্মে মাখতূমের গৃহে রাখা হয়েছিল (আবু দাউদ)। আরেকটি রেওয়ায়াতে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি তাঁর স্বামীর আত্মীয়–স্বজনদের কটু কথা বলেছিলেন। তাই তাঁকে বাড়ী থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল (জাসসাস)। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার বলেন, "প্রকৃতপক্ষে বদ মেজাজীর কারণে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে ছিলেন" (আবু দাউদ)।

দ্বিতীয়ত হযরত উমর (রা) এমন এক যুগে তাঁর বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যখন বহু সংখ্যক সাহাবী বেঁচে ছিলেন এবং এ বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া এবং যাঁচাই বাছাই করা পুরোপুরি সম্ভবপর ছিল। ইবরাহীম নাখায়ী বলেন ঃ হযরত উমর যখন ফাতেমার (রা) এ হাদীস শুনলেন তখন বললেন,

لَسْنَا بِتَارِكِىْ اٰيَةٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَاَةٍ لَعَلَّهَا اَوْهَمَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةُ –

"এমন একজন নারীর কথা অনুসারে আমরা আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী পরিত্যাগ করতে পারি না, যার হয়তো ভুল ধারণা হয়েছে— আমি নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর বাসস্থান ও খোরপোষ উভয়টি লাভের অধিকার আছে" (জাস্‌সাস)। আবু ইসহাক বলেন, আমি কুফার মসজিদে আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদের পাশে বসে ছিলাম। সেখানে শা'বী ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীসের উল্লেখ করলে হযরত আসওয়াদ পাথরের টুকরো তুলে শা'বীর প্রতি ছুঁড়ে মেরে বললেন, হযরত উমরের সময়ে

যখন ফাতেমার বর্ণিত এ হাদীস পেশ করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন ঃ একজন নারীর কথায় আমরা আল্লাহর কিতাব এবং নবীর সুন্নাতকে পরিত্যাগ করতে পারি না। আমরা জানি না সে সঠিকভাবে মনে রাখতে পেরেছে না ভুলে গিয়েছে। সে খোরপোষ ও বাসগৃহ লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেনঃ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী এবং নাসায়ীতে শাব্দিক তারতম্য সহ এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, মারওয়ানের শাসন আমলে তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী সম্পর্কে এক বিতর্কের সূত্রপাত হলে হযরত আয়েশা ফাতেমা বিনতে কায়েসের বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ বলেন ঃ আমি হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি ফাতেমার কাহিনী জানেন না? তিনি জবাব দিলেন ঃ ফাতেমার বর্ণিত হাদীসের কথা না বলাই ভাল (বুখারী)। বুখারী অপর যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাতে হযরত আয়েশার বক্তব্যের ভাষা হলো, ফাতেমার কি হয়েছে, সে কি আল্লাহকে ভয় করে না? তৃতীয় একটি হাদীসে হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের বলেন যে, হযরত আয়েশা বলেছেন ঃ এ হাদীস বর্ণনা করার মধ্যে ফাতেমার কোন কল্যাণ নেই। অপর এক বর্ণনায় হযরত উরওয়া বলেন, হযরত আয়েশা ফাতেমার প্রতি তাঁর চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বলেন ঃ "প্রকৃতপক্ষে সে একটি নির্জন গৃহে অবস্থান করছিল যেখানে তার কোন প্রিয়জন বা বান্ধবী ছিল না। সুতরাং তার নিরাপত্তা ও প্রশান্তির জন্য নবী (সা) তাকে গৃহ পরিবর্তনের আদেশ দিয়েছিলেন।"

চতুর্থত, পরে উসামা ইবনে যায়েদের সাথে ঐ মহিলার বিয়ে হয়েছিল। উসামার ছেলে মুহাম্মাদ বলেন, ফাতেমা যখনই এ হাদীস বলতেন তখনই আমার পিতা হাতের কাছে যা পেতেন তাই তার প্রতি নিক্ষেপ করতেন (জাস্‌সাস)। এ কথা স্পষ্ট যে, হযরত উসামার জানা মতে, তা রসূলের সুন্নাতের পরিপন্থী না হলে ঐ হাদীসটি বর্ণনা করার জন্য তিনি এতটা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে পারতেন না।

১৭. এ বিষয়টি সর্বসম্মত যে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি গর্ভবতী হয় তাহলে সে রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা হোক বা বায়েন তালাকপ্রাপ্তা হোক সর্বাবস্থায় সন্তান প্রসব পর্যন্ত তার বাসস্থান ও খোরপোষের দায়িত্ব স্বামীর ওপর ন্যস্ত থাকবে। তবে যে ক্ষেত্রে গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা যাবে সে ক্ষেত্রে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। এ ক্ষেত্রে সে তালাক দেয়ার পরে মারা গিয়ে থাকুক, অথবা কোন তালাক না দিয়ে মারা গিয়ে থাকুক, এবং স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় বিধবা হয়ে থাকুক তাতে কিছু এসে যায় না। এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মতামত হলো ঃ

এক ঃ হযরত আলী (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মতে, স্বামীর পরিত্যক্ত মোট সম্পদের ওপর থেকে তাকে খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), কাজী শুরাইহ, আবুল আলীয়া, শা'বী এবং ইবরাহীম নাখায়ী থেকেও এ মতটি বর্ণিত হয়েছে এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের একটি মত এ মতের সমর্থন করে (আলূসী, জাস্‌সাস)।

দুই ঃ ইবনে জারীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের দ্বিতীয় যে মতটি বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি যদি কোন সম্পদ রেখে গিয়ে থাকে তাহলে সেই সম্পদে

তার গর্ভস্থ সন্তানের অংশ থেকে তার জন্য ব্যয় করতে হবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি কোন সম্পদ না রেখে গিয়ে থাকলে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে তার জন্য খরচ করা কর্তব্য। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ (البقره : ٢٣٣) وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

তিন ঃ হযরত জাবের (রা) ইবনে আবদুল্লাহ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়ের (রা), হযরত হাসান বাসরী, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব এবং হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহর মতে, মৃত স্বামীর সম্পদে তার খোরপোষ লাভের কোন অধিকার নেই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত তৃতীয় মতটিও এ মতটিরই অনুরূপ (জাস্‌সাস)। এর অর্থ, স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদে উত্তরাধিকারী হিসেবে সে যে অংশ লাভ করেছে তা থেকে সে নিজের ব্যয় নির্বাহ করতে পারে। কিন্তু স্বামীর রেখে যাওয়া মোট সম্পদের ওপর তার খোরপোষের দায়িত্ব বর্তায় না। কারণ, তাতে সমস্ত উত্তরাধিকারীকেই সে বোঝা বহন করতে হয়।

চার ঃ ইবনে আবী লায়লার মতে, মৃত স্বামীর সম্পদ থেকে তার খোরপোষ দেয়া ঠিক তেমনি ওয়াজিব যেমন কোন ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব (জাস্‌সাস)। অর্থাৎ পরিত্যক্ত মোট সম্পদ থেকে যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা হয় সেভাবে তাকে খোরপোষও দিতে হবে।

পাঁচ ঃ ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মাদ (র) ও ইমাম যুফারের মতে, মৃত স্বামীর সম্পদ থেকে তার বাসস্থান বা খোরপোষ কোনটাই পাওয়ার অধিকার নেই। কারণ, মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির কোন মালিকানা স্বত্ব থাকে না। মৃত্যুর পর তা ওয়ারিশদের সম্পদ। তাই তাদের সম্পদে মৃত ব্যক্তির গর্ভবতী বিধবার খোরপোষ কি করে ওয়াজিব হতে পারে (হিদায়া, জাস্‌সাস)। ইমাম আহমাদ (র) ইবনে হাম্বলও এ মত পোষণ করেন (আল—ইনসাফ)।

ছয় ঃ ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে, সে খোরপোষ পেতে পারে না, তবে বাসস্থান পাওয়ার অধিকারী (মুগনিউল মুহতাজ)। তাঁর দলীল হচ্ছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রা) বোন ফুরাইরার স্বামীকে হত্যা করা হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার স্বামীর বাড়ীতেই ইদ্দতকাল কাটানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন (আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী)। তাছাড়া দারু কুত্নীর একটি হাদীস থেকেও তিনি প্রমাণ দিয়েছেন। উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة –

গর্ভবতী বিধবার জন্য কোন খোরপোষ নেই। ইমাম মালেকও (র) এ মত পোষণ করেছেন (হাশিয়াতুদ দুসুকী)।

১৮. এই নির্দেশ থেকে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা যায়। এক, নারী নিজেই তার বুকের দুধের মালিক। তাহলে এ কথা স্পষ্ট যে, সে তার দুধের বিনিময় গ্রহণ করতে পারতো না এবং সে জন্য তাকে অনুমতিও দেয়া হতো না। দুই, গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই সে তার পূর্বতন স্বামীর বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে সন্তানকে দুধ পান করাতে আইনত বাধ্য নয়। বরং শিশুর পিতা যদি তার দুধ পান করাতে

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا
وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ
قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِن
بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١١﴾

রুকূ' ২

কত জনপদ[২০] তাদের রব ও তাঁর রসূলদের নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আমি তাদের কড়া হিসেব নিয়েছিলাম এবং কঠোর শাস্তি দিয়েছিলাম। তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। তাদের কৃতকর্মের পরিণাম ছিল শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি। আল্লাহ (আখেরাতে) তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব, হে ঐ সব জ্ঞানীরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তোমাদের কাছে এক নসীহত নাযিল করেছেন, এমন এক রসূল[২১] যিনি তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শোনান, যা তোমাদের সুস্পষ্ট হিদায়াত দান করে। যাতে তিনি ঈমান গ্রহণকারী ও সৎকর্মশীলদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন।[২২] যে ব্যক্তিই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং নেককাজ করবে আল্লাহ তাকে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নীচ দিয়ে ঝরণা বয়ে চলবে। এসব লোক সেখানে চিরদিন থাকবে। এসব লোকের জন্য আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিক রেখেছেন।

চায় এবং সেও সম্মত হয় তাহলে সন্তানকে দুধ পান করাবে এবং সে জন্য বিনিময় লাভের অধিকারী হবে। তিন, পিতাও সন্তানকে আইনত মায়ের দুধ পান করাতে বাধ্য নয়। চার, সন্তানের ব্যয়ভার পিতার ওপর বর্তায়। পাঁচ, সন্তানকে দুধ পান করানোর সর্বাগ্র অধিকার মায়ের। কিন্তু মা যদি এতে রাজি না হয় কিংবা সে জন্য এতটা মূল্য দাবী করে যা পূরণ করার সামর্থ পিতার নেই তাহলে কেবল সেই ক্ষেত্রে অন্য কোন নারী দ্বারা তাকে দুধ পান করানোর কাজ নেয়া যেতে পারে। এ নির্দেশ থেকে ষষ্ঠ যে মূলনীতি

পাওয়া যায় তা হচ্ছে, মা যে অর্থ দাবী করছে অপর কোন মহিলাকেও যদি সেই অর্থই দিতে হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে মায়ের অধিকার অগ্রগণ্য হবে।

এ বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদদের মাতামত নীচে বর্ণনা করা হলো ঃ

দাহ্‌হাকের মতে, শিশুকে দুধদানের সর্বাধিক অধিকার মায়ের। কিন্তু দুধ পান করানো এবং না করানোর ব্যাপারে তার ইখতিয়ার আছে। তবে শিশু যদি অন্য কোন মহিলার স্তন গ্রহণ না করে তাহলে তাকে দুধ পান করানোর জন্য মাকে বাধ্য করা হবে। কাতাদা, ইবরাহীম নাখায়ী এবং সুফিয়ান সাওরীর মত প্রায় অনুরূপ। ইবরাহীম নাখায়ী এ কথাও বলেন যে, দুধ পান করানোর জন্য যদি অন্য কোন মহিলাকে না পাওয়া যায় তা হলেও শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য মাকে বাধ্য করা হবে। (ইবনে জারীর)

হিদায়াগ্রন্থে বলা হয়েছে, পিতা মাতার বিচ্ছেদের সময় যদি দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তান থাকে তাহলে তাকে দুধ পান করানো মায়ের জন্য ফরয নয়। তবে যদি দুগ্ধদাত্রী অন্য কোন মহিলাকে পাওয়া না যায় তাহলে তাকে দুগ্ধদানে বাধ্য করা হবে। আর বাপ যদি বলে, শিশুর মাকে বিনিময় দিয়ে দুধ পান করানোর পরিবর্তে অন্য কোন মহিলাকে বিনিময় দিয়ে এ কাজ করাবো, অথচ শিশুর মা উক্ত মহিলার দাবীকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থই দাবী করছে কিংবা বিনামূল্যে এ কাজ করতে সম্মত হচ্ছে তাহলে এ ক্ষেত্রে তার অধিকারই অগ্রগণ্য হবে। আর শিশুর মা যদি অধিক বিনিময় দাবী করে তাহলে পিতাকে সে জন্য বাধ্য করা যাবে না।

১৯. এর মধ্যে পিতামাতা উভয়ের জন্য এক ধরনের তিরস্কার বিদ্যমান। বাচনভঙ্গি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অতীতে যে তিক্ততার কারণে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি তালাক পর্যন্ত গড়িয়েছে তার কারণে তারা যদি উত্তম পন্থায় শিশুর দুধ পানের বিষয়টি মীমাংসা করতে না পারে তাহলে তা আল্লাহর কাছে পছন্দীয় ব্যাপার নয়। নারীকে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি অধিক বিনিময় দাবী করে পুরুষকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করে, তাহলে সে যেন জেনে রাখে, শিশুর প্রতিপালন শুধু তার ওপরেই নির্ভর করে না। সে ক্ষেত্রে অন্য কোন নারী তাকে দুধ পান করাবে। সাথে সাথে পুরুষকেও সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, সে যদি মায়ের মাতৃত্বের দুর্বলতাকে অবৈধভাবে কাজে লাগিয়ে তাকে বিপাকে ফেলতে চায় তাহলে তা ভদ্র জনোচিত কাজ হবে না। সূরা বাকারার ২৩৩ আয়াতে প্রায় অনুরূপ বিষয়ই আরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

২০. এখানে মুসলমানদেরকে এই বলে সতর্ক করা হচ্ছে যে, আল্লাহর রসূল এবং তাঁর কিতাবের মাধ্যমে যেসব আদেশ নিষেধ তাদের দেয়া হয়েছে তা যদি তারা অমান্য করে তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে কি পরিণতির সম্মুখীন হবে। আর যদি আনুগত্যের পথ অনুসরণ করে তাহলে কি ধরনের পুরস্কার লাভ করবে।

২১. মুফাসসিরদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে নসীহত শব্দের অর্থ করেছেন, কুরআন এবং রসূল অর্থ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ নসীহত অর্থ খোদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোটা ব্যক্তি সত্তাই ছিল নসীহত। আমাদের মতে, এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই অধিক বিশুদ্ধ ও যথাযথ। কারণ, প্রথম ব্যাখ্যা মেনে নিলে বাক্যাংশের

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ﴿۱۲﴾

আল্লাহ সেই সত্তা যিনি সাত আসমান বানিয়েছেন এবং যমীনের শ্রেণী থেকেও ঐগুলোর অনুরূপ।[২৩] ঐগুলোর মধ্যে হুকুম নাযিল হতে থাকে। (এ কথা তোমাদের এ জন্য বলা হচ্ছে) যাতে তোমরা জানতে পার, আল্লাহ সব কিছুর ওপরে ক্ষমতা রাখেন এবং আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকে পরিব্যপ্ত করে আছে।

বিন্যাস হবে এভাবে ঃ আমি তোমাদের কাছে একটি নসীহত নাযিল করেছি এবং একজন রসূল পাঠিয়েছি। এই পরিবর্তন ছাড়াই কুরআনের বাক্য যখন সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছে এবং শুধু অর্থ প্রকাশ করছে না বরং অধিক সুস্পষ্টভাবে করছে, তখন কুরআনের ইবারতে এই পরিবর্তনের প্রয়োজন কি?

২২. অর্থাৎ জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোতে নিয়ে এসেছেন। মানুষ যখন তালাক, ইদ্দত এবং খোরপোষের ব্যাপারে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন ও আধুনিক পারিবারিক আইনসমূহ অধ্যয়ন করে তখন এ কথাটির পুরো গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। এই তুলনামূলক অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে, বার বার পরিবর্তন ও নিত্য নতুন আইন রচনা সত্বেও কোন জাতি যুক্তিসংগত, স্বভাবসম্মত ও সমাজের জন্য কল্যাণকর এমন কোন আইন রচনা করতে পারেনি যা এই আসমানী কিতাব এবং তার বাহক রসূল (সা) দেড় হাজার বছর পূর্বে আমাদের দিয়েছিলেন এবং কোনদিনও যা পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়নি এবং দেখা দিতে পারেও না ঐ সব আইনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার কোন অবকাশ এখানে নেই। আমি আমার "স্বামী স্ত্রীর অধিকার" গ্রন্থের শেষাংশে এর একটা সংক্ষিপ্ত নমুনা মাত্র পেশ করেছি। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি ইচ্ছা করলে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মীয় ও ধর্মহীন আইনের সাথে কুরআন ও সুন্নাহর এই আইনের তুলনামূলক অধ্যয়ন করে নিজেই দেখতে পারেন।

২৩. "ঐগুলোর অনুরূপ" কথাটির অর্থ এ নয় যে, যতগুলো আসমান বানিয়েছেন যমীনও ততগুলোই বানিয়েছেন। বরং এর অর্থ হলো, তিনি বহুসংখ্যক আসমান যেমন বানিয়েছেন তেমনি বহুসংখ্যক যমীনও বানিয়েছেন। আর যমীনের শ্রেণী থেকেও কথাটার অর্থ হচ্ছে, যে পৃথিবীতে মানুষ বাস করছে সেই পৃথিবী যেমন তার ওপর বিদ্যমান সব কিছুর জন্য বিছানা বা দোলনার মত ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলা এই বিশ্ব–জাহানে আরো অনেক যমীন বা পৃথিবী বানিয়ে রেখেছেন যা তার ওপর অবস্থানকারী সবকিছুর জন্য বিছানা ও দোলনার মত। এমন কি কুরআনের কোন কোন স্থানে এ ইংগিত পর্যন্ত দেয়া হয়েছে যে, জীবন্ত সৃষ্টি কেবল যে এই পৃথিবীতে আছে তাই নয়, বরং উর্ধজগতেও জীবন্ত সৃষ্টি বা প্রাণী বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, তাফহীমুল কুরআন আশ্ শুরা, আয়াত—২৯, টীকা—৫০। অন্য কথায় আসমানে যে অসংখ্য তারকা এবং গ্রহ–উপগ্রহ

দেখা যায় তার সবই বিরাণ অনাবাদী পড়ে নেই। বরং তার মধ্য থেকেও বহু সংখ্যক গ্রহ উপগ্রহ এমন আছে যা এই পৃথিবীর মতই আবাদ।

প্রাচীনযুগের মুফাসসিরদের মধ্যে শুধুমাত্র ইবনে আব্বাসই (রা) এমন একজন মুফাসসির যিনি সেই যুগেও এই সত্যটি বর্ণনা করেছিলেন, যখন এই পৃথিবী ছাড়া বিশ্ব–জাহানের আর কোথাও বুদ্ধিমান শ্রেণীর মাখলুক বাস করে এ কথা কল্পনা করতেও কোন মানুষ প্রস্তুত ছিল না। বর্তমানেও যেখানে এই যুগের অনেক বৈজ্ঞানিক পর্যন্ত এর সত্যতা বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দিহান সে ক্ষেত্রে ১৪ শত বছর পূর্বের মানুষ একে সহজেই কিভাবে বিশ্বাস করতে পারত। তাই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সাধারণ মানুষের সামনে এ কথা বলতে আশংকা করতেন যে, এর দ্বারা মানুষের ঈমান নড়বড়ে হয়ে না যায়। মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে এ আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ "আমি যদি তোমাদের কাছে এ আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করি তাহলে তোমরা কাফের হয়ে যাবে। তোমাদের কুফরী হবে এই যে, তোমরা তা বিশ্বাস করবে না, মিথ্যা বলে গ্রহণ করবে।" সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকেও প্রায় অনুরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন ইবনে আব্বাস বলেছেন, "আমি যদি তোমাদেরকে এর অর্থ বলি তাহলে তোমরা কাফের হয়ে যাবে না এমন আস্থা কি করে রাখা যায়।" (ইবনে জারীর, আবদ ইবনে হুমায়েদ) তা সত্ত্বেও ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও হাকেম এবং বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান ও কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত গ্রন্থে আবুদ দোহার মাধ্যমে শাব্দিক তারতম্য সহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত এই তাফসীর উদ্ধৃত করেছেন যে,

فِىْ كُلِّ اَرْضٍ نَبِىٌّ كَنَبِيِّكُمْ وَاٰدَمُ كَاٰدَمَ وَنُوحٌ كَنُوحٍ وَاِبْرَاهِيْمُ كَاِبْرَاهِيْمَ وَعِيْسٰى كَعِيْسٰى –

"ঐ সব গ্রহের প্রত্যেকটিতে তোমাদের নবীর (সা) মত নবী আছেন, তোমাদের আদমের (আ), মত আদম আছেন, নূহের (আ) মত নূহ আছেন, ইবরাহীমের (আ) মত ইবরাহীম আছেন এবং ঈসার (আ) মত ঈসা আছেন।" ইবনে হাজার (র) তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থে এবং ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরেও এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেছেন যে, এর সনদ বিশুদ্ধ। তবে আমার জানা মতে, আবূদ্ দোহা ছাড়া আর কেউ এটি বর্ণনা করেননি। তাই এটি একটি বিরল ও অপরিচিত হাদীস। অপর কিছু সংখ্যক আলেম একে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে আখ্যায়িত করেছেন। মোল্লা আলী কারী তাঁর "মাওদূয়াতে কাবীর" গ্রন্থে (পৃষ্ঠা—১৯) একে বানোয়াট বলে উল্লেখ করে লিখেছেন, এটি যদি খোদ ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীসও হয়ে থাকে তবুও তা ইসরাঈলী পৌরাণিকতার অন্তরভুক্ত। তবে প্রকৃত সত্য ও বাস্তব হলো, মানুষের জ্ঞান–বুদ্ধির অগম্যতাই এটিকে প্রত্যাখ্যান করার মূল কারণ। অন্যথায় এর মধ্যে যুক্তি ও বিবেক বুদ্ধি বিরোধী কোন কথা নেই। এ কারণে আল্লামা আলুসী এ বিষয়ে তাঁর তাফসীরে আলোচনা করতে গিয়ে লিখছেন ঃ বিবেক বুদ্ধি ও শরীয়তের দৃষ্টিতে এ হাদীসটি মেনে নিতে কোন বাধা নেই। এ হাদীসের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, প্রত্যেক যমীনে একটি মাখলুক আছে। তারা একটি মূল বা উৎসের সাথে সম্পর্কিত—এই পৃথিবীতে আমরা যেমন আমাদের মূল উৎস আদম আলাইহিস সালামের সাথে সম্পর্কিত। তাছাড়া প্রত্যেক যমীনে এমন কিছু ব্যক্তিবর্গ

আছেন যাঁরা সেখানে অন্যদের তুলনায় বৈশিষ্টমন্ডিত যেমন আমাদের এখানে নূহ ও ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বৈশিষ্টমন্ডিত। তিনি আরো বলেন ঃ হয়তো যমীনের সংখ্যা সাতের অধিক হবে এবং অনুরূপভাবে আসমানও শুধু সাতটিই হবে না। সাত একটি পূর্ণ বা অবিভাজ্য সংখ্যা। এ সংখ্যাটি উল্লেখ করায় তার চেয়ে বড় সংখ্যা রহিত হয়ে যাওয়া অনিবার্য নয়। তাছাড়া কোন কোন হাদীসে যেখানে এক আসমান থেকে অপর আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচ শত বছর বলা হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি বলেছেনঃ هو من باب التقريب للافهام অর্থাৎ এর দ্বারা হুবহু দূরত্বের পরিমাণ বা মাপ বর্ণনা করা হয়নি। বরং কথাটি যাতে মানুষের জন্য অধিকতর বোধগম্য হয় সে উদ্দেশ্যে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি আমেরিকার র‍্যাণ্ড কর্পোরেশন (Rand corporation) মহাশূন্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুমান করেছে যে, পৃথিবী যে ছায়াপথে অবস্থিত শুধু তার মধ্যেই প্রায় ৬০ কোটি এমন গ্রহ দেখা যায় আমাদের পৃথিবীর সাথে যার প্রাকৃতিক অবস্থার অনেকটা সাদৃশ্য আছে এবং সম্ভবত সেখানেও জীবন্ত মাখলুক বা প্রাণী বসবাস করছে। (ইকনমিষ্ট, লন্ডন, ২৬শে জুলাই, '৬৯ ইং)।

আত তাহরীম

৬৬

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের لم تحرم শব্দ থেকে এর নাম গৃহীত। এটিও সূরার বিষয়-ভিত্তিক শিরোনাম নয়। বরং এ নামের অর্থ হচ্ছে এ সূরার মধ্যে তাহরীম সম্পর্কিত বিষয়ের উল্লেখ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার মধ্যে তাহরীম সম্পর্কিত যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনাসমূহে দু'জন মহিলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা দু'জনই নবীর (সা) স্ত্রী। তাঁদের একজন হলেন হযরত সাফিয়া (রা) এবং অন্যজন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা)। তাঁদের মধ্যে একজন অর্থাৎ হযরত সাফিয়া (রা) খায়বার বিজয়ের পরে নবীর (সা) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আর সর্বসম্মত মতে খায়বার বিজিত হয় ৭ম হিজরীতে। দ্বিতীয় মহিলা হযরত মারিয়াকে (রা) মিসরের শাসক মুকাওকিস ৭ম হিজরী সনে নবীর (সা) খেদমতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। ৮ম হিজরীর যুলহাজ্জ মাসে তাঁরই গর্ভে নবীর (সা) পুত্র সন্তান হযরত ইবরাহীম (রা) জন্ম লাভ করেন। এসব ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে এ বিষয়টি প্রায় সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, এ সূরাটি ৭ম অথবা ৮ম হিজরীর কোন এক সময় নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এ সূরার মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের সাথে জড়িত কিছু ঘটনার প্রতি ইংগিত দিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এক ঃ হালাল হারাম এবং জায়েয নাজায়েযের সীমা নির্ধারণ করার ইখতিয়ার চূড়ান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার হাতে। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা খোদ আল্লাহ তা'আলার নবীর (সা) কাছেও তার কোন অংশ হস্তান্তর করা হয়নি। নবী নবী হিসেবে কোন জিনিসকে হারাম বা হালাল ঘোষণা করতে পারেন কেবল তখনই যখন এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন ইংগিত থাকে। সে ইংগিত কুরআন মজীদে নাযিল হয়ে থাক কিংবা তা অপ্রকাশ্য অহীর মাধ্যমে নাযিল হয়ে থাক তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু খোদ আল্লাহ কর্তৃক মোবাহকৃত কোন জিনিসকে নিজের পক্ষ থেকে হারাম করে নেয়ার অনুমতি কোন নবীকেও দেয়া হয়নি। এ ক্ষেত্রে অন্য কোন মানুষের তো প্রশ্নই ওঠে না।

দুই ঃ মানব সমাজে নবীর স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত নাজুক। একটি সাধারণ কথা যা অন্য কোন মানুষের জীবনে সংঘটিত হলে তা তেমন কোন গুরুত্বই বহন করে না, কিন্তু অনুরূপ ঘটনাই নবীর জীবনে সংঘটিত হলে আইনের মর্যাদা লাভ করে। তাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নবী–রসূলদের জীবন পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে তাদের অতি ক্ষুদ্র কোন পদক্ষেপও আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থী না হয়। নবীর দ্বারা এমন কোন ক্ষুদ্র কাজও সংঘটিত হয়ে গেলে সংগে সংগে তা সংশোধন করে দেয়া হয়েছে, যাতে ইসলামী আইন ও তার উৎস সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ রূপে শুধু আল্লাহর কিতাব আকারে নয় বরং নবীর "উসওয়ায়ে হাসানা" বা উত্তম জীবন আদর্শরূপে আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌঁছে এবং তার মধ্যে অণু পরিমাণও এমন কোন জিনিস সংমিশ্রিত হতে না পারে, আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জির সাথে যার কোন মিল নেই।

তিন ঃ ওপরে বর্ণিত মূলনীতির আলোকে আপনা থেকেই যে বিষয়টি বুঝা যায় তা এই যে, একটি ক্ষুদ্র বিষয়েও যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভুল দেখিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তা শুধু সংশোধনই করা হয়নি, বরং রেকর্ডভুক্তও করা হয়েছে তখন তা অকাট্যভাবে আমাদের মনে এ আস্থা সৃষ্টি করে যে, নবীর (সা) পবিত্র জীবনকালের যেসব কাজকর্ম ও হুকুম–আহকাম বর্তমানে আমরা পাচ্ছি, এবং যেসব কাজকর্ম ও হুকুম আহকাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন তিরস্কার বা সংশোধনী রেকর্ডে নেই তা পুরাপুরি সত্য ও নির্ভুল এবং আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পূর্ণরূপে সংগতিপূর্ণ। ঐ সব কাজকর্ম ও আদেশ নিষেধ থেকে আমরা পূর্ণ আস্থার সাথে হিদায়াত ও পথনির্দেশ গ্রহণ করতে পারি।

কুরআন মজীদের এই বাণী থেকে চতুর্থ যে বিষয়টি সামনে আসে তা হচ্ছে, যে পবিত্র রসূলের সম্মান ও মর্যাদাকে আল্লাহ নিজে বান্দাদের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে গণ্য করেন সেই রসূল সম্পর্কে এ সূরাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর স্ত্রীদের খুশী করার জন্য একবার আল্লাহর হালালকৃত একটি জিনসকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। আর নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণ, আল্লাহ নিজে যাদেরকে ঈমানদারদের মা বলে ঘোষণা করেন, এবং যাঁদেরকে সম্মান করার জন্য তিনি নিজে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন কিছু ভুল–ত্রুটির জন্য তাঁদেরকেই আবার তিনি কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তাছাড়া নবীকে তিরস্কার এবং তাঁর স্ত্রীদেরকে সাবধান চুপিসারে করা হয়নি, বরং তা সেই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা সমস্ত উম্মাতকে চিরদিন পড়তে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল এবং উম্মুল মু'মিনীনদেরকে ঈমানদারদের দৃষ্টিতে হেয়প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে তাঁর কিতাবে এসব উল্লেখ করেননি। আল্লাহ তা'আলার এরূপ কোন অভিপ্রায় ছিল না, কিংবা তা থাকতেও পারে না। একথাও স্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআনের এ সূরা পাঠ করে কোন মুসলমানের অন্তর থেকে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা উঠে যায়নি। তাহলে কুরআনে এ কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে তাঁদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সম্মান প্রদর্শনের সঠিক সীমারেখার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চান। নবীগণ কেবল নবীই, তাঁরা খোদা নন যে, তাঁদের কোন ভুল–ত্রুটি হতে পারে না। নবীর মর্যাদা এ কারণে নয় যে, তাঁর কোন ভুল–ত্রুটি হওয়া অসম্ভব। বরং নবীর মর্যাদা এ কারণে যে, তিনি আল্লাহর ইচ্ছার পূর্ণাঙ্গ বাস্তব রূপ। তাঁর

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভুল-ত্রুটিকেও আল্লাহ সংশোধন না করে ছেড়ে দেননি। এভাবে আমরা এ আস্থা ও প্রশান্তি লাভ করি যে, নবীর রেখে যাওয়া আদর্শ আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তব প্রতিনিধিত্ব করছে। একইভাবে সাহাবা কিরাম হোন বা নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণ হোন, তাঁরা সবাই মানুষ ছিলেন, ফেরেশতা বা মানব সত্তার উর্ধে কিছু ছিলেন না। তাদেরও ভুল-ত্রুটি হওয়া সম্ভব ছিল। তাঁরা যে মর্যাদা লাভ করেছিলেন তার কারণ ছিল এই যে, আল্লাহর রসূলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তাঁদেরকে মানবতার সর্বোত্তম নমুনা বানিয়ে দিয়েছিল। তাঁদের যা কিছু সম্মান ও মর্যাদা তা এ কারণেই। তাঁরা ভুল-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন এরূপ অনুমান ও মনগড়া ধারণার ওপর তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত নয়। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় যুগে সাহাবা কিরাম কিংবা নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের দ্বারা মানবিক দুর্বলতার কারণে যখনই কোন ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে তখনই তাদের সতর্ক করা হয়েছে ও ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। নবী (সা) নিজেও তাদের কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি সংশোধন করেছেন যা হাদীস গ্রন্থসমূহের বহু সংখ্যক জায়গায় উল্লেখ আছে। আল্লাহ তা'আলা নিজেও কুরআন মজীদে তাঁদের কিছু কিছু ভুল-ত্রুটির উল্লেখ করে তা সংশোধন করেছেন যাতে মুসলমানগণ কখনই তাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সম্মান দেখানোর এমন কোন অতিরঞ্জিত ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে না নেয় যা তাঁদেরকে মানুষের পর্যায় থেকে উঠিয়ে আল্লাহর মর্যাদায় বসিয়ে না দেয়। আপনি যদি চোখ খুলে কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করেন তাহলে আপনার সামনে এর দৃষ্টান্ত একের পর এক আসতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে ইমরানে ওহুদ যুদ্ধের আলোচনা প্রসংগে সাহাবা কিরামদের সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

"আল্লাহ তা'আলা (সাহায্য-সহযোগিতার) যে প্রতিশ্রুতি তোমাদের দিয়েছিলেন তা তিনি পূরণ করেছেন যখন তোমরা তাদেরকে তাঁর ইচ্ছায় হত্যা করছিলে। অবশেষে তোমরা যখন দুর্বলতা দেখালে এবং কাজের ব্যাপারে মতানৈক্য করলে আর যে জিনিসের আকাংখা তোমরা করছিলে আল্লাহ তা'আলা যেই মাত্র তোমাদের সেই জিনিস দেখালেন (অর্থাৎ গনীমতের সম্পদ) তখনই তোমরা তার হুকুমের নাফরমানি করে বসলে। তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল পার্থিব স্বার্থের প্রত্যাশী এবং কেউ ছিলে আখেরাতের প্রত্যাশী। এ অবস্থায় তোমাদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তাদের মোকাবেলায় তোমাদের পরাস্ত করে দিলেন। আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ও মেহেরবান।" (আয়াত, ১৫২)

অনুরূপভাবে সূরা নূরে হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদের উল্লেখ করে আল্লাহ সাহাবীগণকে বলেন ঃ

"এমনটা কেন হলো না যে, যখন তোমরা এ বিষয়টি শুনেছিলে মু'মিন নারী ও পুরুষ সবাই নিজে সে বিষয়ে ভাল ধারণা পোষণ করতে এবং বলে দিতে যে, এটা তো স্পষ্ট অপবাদ। ...... দুনিয়া ও আখেরাতে যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর মেহেরবানী ও দয়া না হতো তাহলে যে বিষয়ের মধ্যে তোমরা নিক্ষিপ্ত হয়েছিলে তার পরিণামে কঠিন আযাব তোমাদের গ্রাস করতো। একটু ভেবে দেখ, যখন তোমাদের মুখে মুখে কাহিনীটার চর্চা হচ্ছিল এবং তা ছড়াচ্ছিল এবং তোমরা এমন কিছু বলছিলে যে বিষয়ে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। তোমরা এটাকে একটা মামুলি ব্যাপার মনে করছিলে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়। কেন তোমরা এ কথা শোনামাত্র বললে না যে, আমাদের জন্য

এরূপ কথা মুখে আনাও শোভা পায় না। সুবহানাল্লাহ! এটা তো একটা গুরুতর অপবাদ? আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনো যেন তোমরা এরূপ আচরণ না করো।" (আয়াত, ১২ থেকে ১৭)।

সূরা আহ্যাবে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে ঃ

"হে নবী, তোমার স্ত্রীদের বলো, তোমরা দুনিয়া ও তার চাকচিক্য চাও তাহলে এসো আমি তোমাদের কিছু দিয়ে উত্তম রূপে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আখেরাতের প্রত্যাশী হয়ে থাকো তাহলে জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (আয়াত, ২৮, ২৯)।

সূরা জুম'আতে সাহাবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"তারা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও খেল-তামাশা দেখে সে দিকে ছুটে গেল এবং (হে নবী,) তোমাকে (খোতবা দানরত অবস্থায়) দণ্ডায়মান রেখে গেল। তাদের বলো, আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।" (আয়াত ১১)

মক্কা বিজয়ের পূর্বে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতায়া নবীর (সা) মক্কা অভিযানের খবর গোপনে কুরাইশদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সূরা মুমতাহিনায় তাঁর এ কাজের কঠোর সমালোচনা ও তিরস্কার করা হয়েছে।

কুরআন মজীদের মধ্যেই এসব উদাহরণ বর্তমান, যে কুরআন মজীদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সাহাবা কিরাম এবং নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের সম্মান ও মর্যাদা নিজে বর্ণনা করেছেন এবং তাদেরকে রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু অর্থাৎ তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট বলে ফরমান শুনিয়েছেন। সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান দেখানোর এই শিক্ষা মধ্যপন্থার ওপর ভিত্তিশীল। এ শিক্ষা মুসলমানদেরকে মানুষ পূজার সেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে যার মধ্যে ইহুদী ও খৃষ্টানরা নিপতিত হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বড় বড় মনীষী হাদীস, তাফসীর এবং ইতিহাস বিষয়ে যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে যেসব জায়গায় সাহাবায়ে কিরাম, নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মর্যাদা ও পূর্ণতার যে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে তাদের দুর্বলতা, বিচ্যুতি এবং ভুল-ক্রটির ঘটনা বর্ণনা করতেও দ্বিধা করা হয় নাই। অথচ বর্তমান সময়ের সম্মান প্রদর্শনের দাবীদারদের তুলনায় তাঁরা তাঁদের বেশী মর্যাদা দিতেন এবং সম্মান প্রদর্শনের সীমারেখাও তারা এদের চেয়ে বেশী জানতেন।

পঞ্চম যে কথাটি এ সূরায় খোলাখুলি বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, আল্লাহর দীন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নিখুঁত। এ দীন অনুসারে ঈমান ও আমলের বিচারে প্রত্যেকের যা প্রাপ্য তাই সে পাবে। অতি বড় কোন বোজর্গের সাথে ঘনিষ্ঠতাও তার জন্য আদৌ কল্যাণকর নয় এবং অত্যন্ত খারাপ কোন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কও তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। এ ব্যাপারে বিশেষ করে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের সামনে উদাহরণ হিসেবে তিন শ্রেণীর

স্ত্রীলোককে পেশ করা হয়েছে। একটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে হযরত নূহ (আ) ও হযরত লূতের (আ) স্ত্রীদের। তারা যদি ঈমান আনয়ন করত এবং তাদের মহাসম্মানিত স্বামীর সাথে সহযোগিতা করত তাহলে মুসলিম উম্মার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের যে মর্যাদা তাদের মর্যাদাও তাই হতো। কিন্তু যেহেতু তারা এর বিপরীত আচরণ ও পন্থা অবলম্বন করেছে, তাই নবীদের স্ত্রী হওয়াটাও তাদের কোন কাজে আসেনি এবং তারা জাহান্নামের অধিবাসী হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণ দেয়া হয়েছে ফেরাউনের স্ত্রীর। যদিও তিনি আল্লাহর জঘন্য এক দুশমনের স্ত্রী ছিলেন কিন্তু যেহেতু তিনি ঈমান গ্রহণ করেছিলেন এবং ফেরাউনের কওমের কাজ কর্ম থেকে নিজের কাজ কর্মের পথ সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়েছিলেন তাই ফেরাউনের মত চরম পর্যায়ের কাফেরের স্ত্রী হওয়াও তাঁর কোন ক্ষতির কারণ হয়নি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতের উপযুক্ত বানিয়ে দিয়েছেন। তৃতীয় উদাহরণ দেয়া হয়েছে হযরত মারয়াম আলাইহিস সালামের। তাঁর এই বিরাট মর্যাদা লাভের কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করার ফায়সালা করেছিলেন তা তিনি মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন। তাঁকে কুমারী অবস্থায় আল্লাহর হুকুমে মু'জিযা হিসেবে গর্ভবতী বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এভাবে তাঁর রব তাঁর দ্বারা কি কাজ নিতে চান তাও তাকে বলে দেয়া হয়েছে। হযরত মারয়াম ছাড়া পৃথিবীর আর কোন অভিজাত ও নেক্কার মহিলাকে এরূপ কোন কঠিন পরীক্ষার মধ্যে কখনো ফেলা হয়নি। হযরত মারয়াম এ ব্যাপারে যখন কোন আফসোস ও আর্তনাদ করেননি বরং একজন খাঁটি ঈমানদার নারী হিসেবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য যা বরদাশত করা অপরিহার্য ছিল তা সবই বরদাশত করা স্বীকার করেছেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে سيدة النساء فى الجنة 'বেহেশতের মহিলাদের নেত্রী' (মুসনাদে আহমাদ) হওয়ার মত সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

এসব বিষয় ছাড়াও আমরা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য এ সূরা থেকে জানতে পারি। তা হচ্ছে, কুরআন মজীদে যা কিছু লিপিবদ্ধ আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কেবল সেই জ্ঞানই আসতো না। বরং তাঁকে অহীর মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানও দেয়া হতো যা কুরআনে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এ সূরার ৩নং আয়াত তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের একজনের কাছে গোপনীয় একটি কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি তা অন্য কাউকে বলেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিলেন। অতপর নবী (সা) এই ত্রুটির জন্য তাঁর সেই স্ত্রীকে সতর্ক করে দিলেন। এতে তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁর এই ত্রুটি সম্পর্কে তাঁকে কে অবহিত করেছেন। নবী (সা) জবাব দিলেন। যে সত্তা আলীম ও খাবীর তিনিই আমাকে তা জানিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গোটা কুরআন মজীদের মধ্যে সেই আয়াতটি কোথায় যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীকে গোপনীয় যে কথা বলেছিলে তা সে অন্যের কাছে বা অমুকের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে? কুরআনে যদি এমন কোন আয়াত না থেকে থাকে এবং এটা সুস্পষ্ট যে, তা নেই তাহলে এটাই এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, কুরআন ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অন্য অহী আসতো। কুরআন ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আর কোন অহী আসতো না, হাদীস অস্বীকারকারীদের এ দাবী এর দ্বারা বাতিল হয়ে যায়।

আয়াত ১২ — সূরা আত তাহরীম-মাদানী — রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ①

হে নবী, আল্লাহ যে জিনিস হালাল করেছেন তা তুমি হারাম করছো কেন?[১] (তা কি এ জন্য যে,) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাও?[২] আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।[৩]

১. এটা মূলত প্রশ্ন নয়, বরং অসন্তোষের বহিপ্রকাশ। অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা জিজ্ঞেস করা নয় যে, আপনি এ কাজ কেন করেছেন? বরং তাঁকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়াই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর হালালকৃত জিনিসকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়ার যে কাজ আপনার দ্বারা হয়েছে, তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়। এ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহর হালালকৃত জিনিস হারাম করার অধিকার কারো নেই, এমন কি স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজেরও এই ইখতিয়ার নেই। নবী (সা) ঐ জিনিসটিকে যদিও আকীদাগতভাবে হারাম মনে করেছিলেন না কিংবা শরীয়াতসম্মতভাবে হারাম বলে সাব্যস্ত করেছিলেন না, বরং নিজের জন্য তা ব্যবহার করা হারাম করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মর্যাদা যেহেতু সাধারণ একজন মানুষের মত ছিল না বরং তিনি আল্লাহর রসূলের মর্যাদায় অভিসিক্ত ছিলেন। তাই তাঁর নিজের পক্ষ থেকে নিজের ওপর কোন জিনিস হারাম করে নেয়াতে এই আশংকা ছিল যে, তাঁর উম্মাতও ঐ জিনিসকে হারাম অথবা অন্তত মাকরূহ বলে মনে করতে আরম্ভ করবে অথবা উম্মাতের লোকেরা মনে করতে শুরু করবে যে, আল্লাহর হালালকৃত কোন জিনিস নিজের জন্য হারাম করে নেয়ায় কোন দোষ নেই। এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালা এ কাজের জন্য তাঁকে তিরস্কার করেছেন এবং নিজে হারাম করে নেয়ার এই কাজ থেকে বিরত থাকার হুকুম দিয়েছেন।

২. এ থেকে জানা যায় যে, হারাম করে নেয়ার এই কাজটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ইচ্ছায় করেছিলেন না। বরং তাঁর স্ত্রীগণ চেয়েছিলেন তিনি যেন এরূপ করেন। আর তাই তিনি শুধু তাঁদের খুশী করার জন্য একটি হালাল বস্তুকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হারাম করে নেয়ার এ কাজটি সম্পর্কে তিরস্কার করার সাথে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে তার এই কারণটি কেন

উল্লেখ করলেন? এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর বাণীর উদ্দেশ্য যদি শুধু হালালকে হারাম করে নেয়া থেকে নবীকে (সা) বিরত রাখা হতো তাহলে আয়াতের প্রথমাংশ দ্বারাই এ উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যেতো। যে কারণে তিনি এ কাজ করেছিলেন তা স্পষ্ট করে বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। তা বিশেষভাবে বর্ণনা করায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হালালকে হারাম করে নেয়ার কারণে শুধু নবীকে (সা)–ই তিরস্কার করা উদ্দেশ্য নয়। বরং সাথে সাথে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকেও এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া যে, নবীর স্ত্রী হওয়ার কারণে যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁদের ছিল তা তাঁরা উপলব্ধি কনেননি এবং তাঁকে দিয়ে এমন একটি কাজ করিয়েছেন যার দ্বারা একটি হালাল জিনিস হারাম হয়ে যাওয়ার বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হতে পারতো।

নবী (সা) নিজের জন্য যে জিনিসটি হারাম করে নিয়েছিলেন সেটি কি ছিল কুরআন মজীদে যদিও তা বলা হয়নি কিন্তু মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরগণ এ আয়াত নাযিলের কারণ হিসেবে দু'টি ভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একটি ঘটনা হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা) সম্পর্কিত এবং অপর ঘটনাটি হলো নবী (সা) মধু পান না করার শপথ করেছিলেন।

হযরত মারিয়ার (রা) ঘটনা হলো, হুদায়রিয়ার সন্ধির পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশপাশের বাদশাহদের কাছে যেসব পত্র দিয়েছিলেন তার মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ার রোমান খৃষ্টান ধর্মযাজকের (Patriarch) কাছেও একটি পত্র দিয়েছিলেন। আরবরা তাকে মুকাওকিস বলে অভিহিত করত। হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতা'আ এই মহামূল্যবান পত্রখানা নিয়ে তার কাছে পৌছলে তিনি ইসলাম কবুল করেননি কিন্তু তাঁর সাথে ভাল ব্যবহার করলেন এবং পত্রের উত্তরে লিখলেন ঃ "আমি জানি আরো একজন নবী আসতে এখনো বাকী। তবে আমার ধারণা ছিল তিনি সিরিয়ায় আসবেন। তা সত্ত্বেও আমি আপনার দূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছি এবং কিবতীদের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী দু'টি মেয়েকে পাঠাচ্ছি।" (ইবনে সা'দ) মেয়ে দু'টির মধ্যে একজনের নাম সিরীন এবং অপর জনের নাম মারিয়া। (খৃষ্টানরা হযরত মারয়ামকে মারিয়া MARY বলে থাকে। মিসর থেকে ফেরার পথে হযরত হাতিব তাদের উভয়কে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হলে তিনি সিরীনকে হযরত হাসসান (রা) ইবনে সাবেতের মালিকানায় দিয়ে দেন এবং মারিয়াকে তাঁর হারামের অন্তরভুক্ত করেন। ৮ হিজরীর যুলহাজ্জ মাসে তাঁর গর্ভে নবীর (সা) পুত্র ইবরাহীম জন্মলাভ করেন (আল ইসতিয়াব–আল ইসাবা)। এই মহিলা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী। হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর আল ইসাবা গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে হযরত আয়েশার (রা) এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন। মারিয়ার আগমন আমার কাছে যতটা অপছন্দীয় হয়েছে অন্য কোন মহিলার আগমন ততটা অপছন্দনীয় হয়নি। কারণ, তিনি ছিলেন অতিব সুন্দরী এবং নবী (সা) তাঁকে খুব পছন্দ করেছিলেন। বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীসসমূহে তাঁর সম্পর্কে যে কাহিনী উদ্ধৃত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে, নবী (সা) একদিন হযরত হাফসার ঘরে গেলে তিনি সেখানে ছিলেন না। সেই সময় হযরত মারিয়া সেখানে তাঁর কাছে আসেন এবং তাঁর সাথে নির্জনে কাটান। হযরত হাফসা তা অপছন্দ করলেন এবং তিনি এ বিষয়ে কঠোর ভাষায় নবীর (সা) কাছে অভিযোগ করলেন। তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য নবী (সা) তাঁর কাছে ওয়াদা

করলেন যে, তিনি ভবিষ্যতে মারিয়ার সাথে কোন প্রকার দাম্পত্য সম্পর্ক রাখবেন না। কিছু সংখ্যক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মারিয়াকে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে তিনি শপথও করেছিলেন। এসব হাদীস বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাবেয়ীদের থেকে 'মুরসাল' হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে কিছু সংখ্যক হাদীস হযরত উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইবনে আব্বাস এবং হযরত আবু হুরাইরা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদীসের সনদের আধিক্য দেখে এর কোন না কোন ভিত্তি আছে বলে হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে ধারণা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সিহাহ সিত্তার কোন গ্রন্থেই এ কাহিনী উদ্ধৃত হয়নি। নাসায়ীতে হযরত আনাস থেকে শুধু এতটুকু উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবীর (সা) একটি দাসী ছিল যার সাথে তিনি দাম্পত্য সম্পর্ক রাখতেন। এই ঘটনার পর হযরত হাফসা (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা) তাঁর পিছে লাগলেন। যার কারণে নবী (সা) তাকে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন। এ কারণে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ হে নবী, আল্লাহ যে জিনিস তোমার জন্য হালাল করেছেন তা তুমি হারাম করে নিচ্ছ কেন?

দ্বিতীয় ঘটনাটি বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী এবং অপর কিছু সংখ্যক হাদীস গ্রন্থে স্বয়ং হযরত আয়েশা (রা) থেকে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার সারসংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত প্রতিদিন আসরের পর পবিত্র স্ত্রীগণের সবার কাছে যেতেন। একবার তিনি যয়নাব বিনতে জাহাশের কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসলেন। কারণ, কোথাও থেকে তাঁর কাছে মধু পাঠানো হয়েছিল। আর নবী (সা) মিষ্টি খুব ভালবাসতেন। তাই তিনি তাঁর কাছে মধুর শরবত পান করতেন।

হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন, এ কারণে খুব হিংসা হলো এবং আমি হযরত হাফসা (রা), হযরত সাওদা (রা) ও হযরত সাফিয়ার সাথে মিলিত হয়ে এ মর্মে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, নবী (সা) আমাদের যার কাছেই আসবেন সেই তাঁকে বলবে, আপনার মুখ থেকে মাগাফিরের গন্ধ আসছে। মাগাফির এক প্রকার ফুল যার মধ্যে কিছুটা দুর্গন্ধ থাকে। মৌমাছি উক্ত ফুল থেকে মধু আহরণ করলে তার মধ্যেও ঐ দুর্গন্ধের কিছুটা লেশ বর্তমান থাকে। এ কথা সবাই জানতেন যে, নবী (সা) অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল ছিলেন। তাঁর শরীর থেকে কোন প্রকার দুর্গন্ধ আসুক তিনি তা একেবারেই অপছন্দ করতেন। তাই হযরত যয়নাবের কাছে তাঁর দীর্ঘ অবস্থানকে বন্ধ করার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করা হলো এবং তা ফলবতী হলো। যখন কয়েকজন স্ত্রী তাঁকে বললেন যে, তাঁর মুখ থেকে মাগাফিরের গন্ধ আসে তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আর কখনো তিনি মধু পান করবেন না। একটি হাদীসে তাঁর বক্তব্যের ভাষা উদ্ধৃত হয়েছে এরূপঃ فلن اعود له وقد حلفت "আমি আর কখনো এ জিনিস পান করবো না, আমি শপথ করেছি।" অপর একটি হাদীসে শুধু فلن اعود له কথাটি আছে وقد حلفت কথাটির উল্লেখ নেই। ইবনে আব্বাস থেকে যে হাদীসটি ইবনুল মুনযির। ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী এবং ইবনে মারদুয়া বর্ণনা করেছেন তাতে বক্তব্যের ভাষা হলো ঃ والله لا اشربه আল্লাহর কসম, আমি আর তা পান করবো না।

বড় বড় মনীষী এই দু'টি কাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় কাহিনীটিকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন এবং প্রথম কাহিনীটিকে অনির্ভরযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম নাসায়ী

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ②

আল্লাহ তোমাদের জন্য কসমের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[৪] আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও মহা কৌশলী।[৫]

বলেন ঃ "মধুর ঘটনা সম্পর্কিত ব্যাপারে হযরত আয়েশার (রা) বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধ। এবং হযরত মারিয়াকে (রা) হারাম করে নেয়ার ঘটনা কোন উত্তম সনদে বর্ণিত হয়নি।" কাজী আয়াজ বলেন ঃ "নির্ভুল কথা এই যে, এ আয়াতটি হযরত মারিয়ার (রা) ব্যাপারে নয়, বরং মধু সম্পর্কিত ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।" কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবীও মধু সম্পর্কিত কাহিনীকেই বিশুদ্ধ বলে মনে করেন এবং ইমাম নববী ও হাফেজ বদরুদ্দীন আইনীও এই মতটিই পোষণ করেন। ফাতহুল কাদির নামক ফিকাহ গ্রন্থে ইমাম ইবনে হুমাম বলেন ঃ মধু হারাম করে নেয়ার কাহিনী বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা) নিজে বর্ণনা করেছেন যাঁকে নিয়ে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং এ বর্ণনাটিই অধিক নির্ভরযোগ্য। হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন ঃ সঠিক কথা হলো, নিজের জন্য মধু পান হারাম করে নেয়া সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

৩. অর্থাৎ স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য একটি হালাল জিনিসকে হারাম করে নেয়ার যে কাজ আপনার দ্বারা হয়েছে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল পদমর্যাদার দিক দিয়ে তা যদিও যথোচিত হয়নি, কিন্তু তা গোনাহর কাজও নয় যে, সে জন্য পাকড়াও করা যেতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা শুধু সে ভুল দেখিয়ে দিয়ে সংশোধন করে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন এবং তাঁর এই ত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন।

৪. অর্থাৎ একটি হালাল বস্তুকে নিজের ওপর হারাম করে নেয়ার যে কসম আপনি করেছেন সূরা মায়েদার ৮৯ আয়াতে কাফ্ফারা দিয়ে কসম ভঙ্গ করার ও তার বাধ্যবাধকতা থেকে বেরিয়ে আসার যে পন্থা আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত করে দিয়েছেন তদনুযায়ী কাজ করে আপনি তা ভঙ্গ করুন। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিকহী প্রশ্ন দেখা দেয়। তাহলো যে ক্ষেত্রে কেউ কসম করে হালাল জিনিসকে হারাম করে নিয়েছে সে ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে না কি কসমের বাক্য মুখে বলা হোক বা না হোক কার্যত হারাম করে নেয়াটাই কসম করার সমার্থক হবে ? এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে।

একদল ফিকাহবিদ বলেন ঃ শুধু হারাম করে নেয়া কসম নয়। কেউ যদি কোন জিনিসকে তা স্ত্রী হোক বা অন্য কোন হালাল বস্তু হোক কসম করা ছাড়াই নিজের জন্য হারাম করে নেয় তাহলে তা হবে একটি অনর্থক কাজ। এ জন্য কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। বরং সে যে জিনিস হারাম করে নিয়েছে কাফ্ফারা না দিয়েই তা ব্যবহার করতে পারবে। মাসরূক, শা'বী, রাবী'আ এবং আবু সালামা এমত পোষণ করেছেন। ইবনে জারীর এবং জাহেরীগণ এ মতটিই অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মধ্যে তাহরীম বা হারাম করে নেয়া কেবল তখনই কসম বলে গণ্য হবে যখন কেউ কোন বস্তুকে নিজের জন্য হারাম

করে নেয়ার সময় কসমের ভাষা ব্যবহার করবে। এ ক্ষেত্রে তাঁদের যুক্তি হলো, বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুসারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু হালাল জিনিসকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়ার সাথে কসমও করেছিলেন তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেছেন ঃ আমি কসমের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার যে পন্থা নির্ধারিত করে দিয়েছি আপনি তদনুযায়ী কাজ করুন।

অপর একদলের মতে, কসমের শব্দ ও ভাষা প্রয়োগ করা ছাড়া কোন জিনিসকে হারাম করে নেয়া কসম নয় বটে, তবে স্ত্রীর ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম। অন্যান্য বস্তু যেমন কাপড়চোপড় বা খাদ্য দ্রব্যকে কেউ যদি নিজের জন্য হারাম করে নেয় তাহলে তা একটি অর্থহীন কাজ। কোন কাফ্‌ফারা দেয়া ছাড়াই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তা ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু স্ত্রী বা দাসী সম্পর্কে সে যদি বলে যে, তার সাথে সহবাস করা আমার জন্য হারাম তাহলে তা হারাম হবে না বটে, কিন্তু তার কাছে যাওয়ার পূর্বে কসমের কাফ্‌ফারা অবশ্যই দিতে হবে। এ সিদ্ধান্ত শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের। (মুগনিউল মুহতাজ) মালেকী মাযহাবের অনুসারীগণও অনেকটা অনুরূপ মত অনুসরণ করে থাকেন। (আহকামুল কুরআন লি ইবনিল আরাবী)

তৃতীয় আরেকটি দলের মত হলো, কসমের বাক্য ব্যবহার করা হোক বা না হোক তাহরীমের কাজটাই কসম বলে গণ্য হবে। এটি হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত আয়েশা, হযরত উমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মত। যদিও বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) আরো একটি মত বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ اذا حرم امراته فليس بشئ (কেউ যদি তার স্ত্রীকে হারাম করে নেয় তাহলে তা কিছুই না)। কিন্তু এ কথার ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই যে, তাঁর মতে এটা তালাক বলে গণ্য হবে না বরং কসম বলে গণ্য হবে এবং তাকে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। কারণ, বুখারী, মুসলিম ও ইবনে মাজায় ইবনে আব্বাসের (রা) এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, হারাম বলে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ বিষয়ে ইবনে আব্বাসকে (রা) জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন ঃ সে তোমার জন্য হারাম হয়ে যায়নি তবে তোমার জন্য কাফ্‌ফারা দেয়া অপরিহার্য। ইবনে জারীরের রেওয়ায়াতে ইবনে আব্বাসের (রা) বক্তব্যের ভাষা হলো ঃ আল্লাহ তা'আলা যা হালাল করেছেন তা যদি মানুষ নিজের জন্য হারাম করে থাকে তাহলে নিজের কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করা তার জন্য অপরিহার্য। হাসান বসরী, আতা, তাউস, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, ইবনে জুবায়ের এবং কাতাদা প্রমুখ এমত পোষণ করেছেন। আর হানাফীরা এমতটি গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু বকর জাসসাস বলেন ঃ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ আয়াতটির শব্দাবলী এ কথা বুঝায় না যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারাম করে নেয়ার সাথে সাথে কসমও করেছিলেন। তাই একথা স্বীকার করতেই হবে যে, 'তাহরীম' বা হারাম করে নেয়াটাই কসম। কারণ আল্লাহ তা'আলা পরে এই তাহরীমের ব্যাপারেই কসমের কাফ্‌ফারা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আরো একটু অগ্রসর হয়ে তিনি বলেছেন ঃ আমাদের মনীষীগণ (অর্থাৎ হানাফী মনীষীগণ) তাহরীমকে কেবল সেই ক্ষেত্রে কসম বলে গণ্য করেছেন যে ক্ষেত্রে তালাকের

নিয়ত থাকবে না। কেউ যদি তার স্ত্রীকে হারাম বলে তাহলে সে যেন প্রকারান্তরে বলে যে, আল্লাহর শপথ, আমি তোমার কাছে আসবো না। অতএব সে ঈলা বা কসম করে বসলো। আর সে যদি পানাহারের কোন বস্তু নিজের জন্য হারাম করে নিয়ে থাকে তাহলে প্রকারান্তরে সে যেন বললো, আল্লাহর শপথ, আমি ঐ জিনিস ব্যবহার করবো না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে বলেছেন ঃ আল্লাহ আপনার জন্য যে জিনিস হালাল করে দিয়েছেন তা আপনি হারাম করছেন কেন? তারপরে বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য কসমের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা নিরূপণ করে দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাহরীমকে কসম বলে গণ্য করেছেন এবং 'তাহরীম' শব্দটি অর্থগত ও শরয়ী হুকুমের দিক দিয়ে কসমের সমার্থক হয়ে গিয়েছে।

স্ত্রীকে হারাম করে নেয়া এবং স্ত্রী ছাড়া অন্য সব জিনিস হারাম করে নেয়ার ব্যাপারে ফিকাহবিদদের দৃষ্টিতে শরয়ী হুকুম কি, সর্বসাধারণের উপকারার্থে এখানে সে বিষয়টি বলে দেয়াও যথোপযুক্ত হবে বলে মনে হয়।

হানাফী ফিকাহবিদদের মতে, কেউ যদি তালাকের নিয়ত ছাড়াই স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করে নেয় অথবা এ মর্মে শপথ করে যে, সে আর তার কাছে যাবে না তাহলে তা ঈলা বলে গণ্য হবে এবং সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর সান্নিধ্যে যাওয়ার আগে তাকে কসমের কাফ্‌ফারা দিতে হবে। কিন্তু সে যদি তালাকের নিয়তে এ কথা বলে থাকে, তুমি আমার জন্য হারাম তাহলে কি উদ্দেশ্যে তা বলেছে তা জেনে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সে যদি তিন তালাকের নিয়ত করে থাকে তাহলে তিন তালাক হয়ে যাবে। আর যদি এর চেয়ে কম সংখ্যক তালাকের নিয়ত করে থাকে, তা এক তালাকের নিয়ত হোক বা দুই তালাকের নিয়ত হোক উভয় অবস্থায় এক তালাক মাত্র কার্যকর হবে। আর কেউ যদি বলে আমার জন্য যা হালাল ছিল তা হারাম হয়ে গিয়েছে তাহলে স্ত্রীকে হারাম করার নিয়তে এ কথা না বলা পর্যন্ত স্ত্রীর জন্য তা প্রযোজ্য হবে না। স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন জিনিস হারাম করে নেয়ার ক্ষেত্রে কসমের কাফ্‌ফারা না দেয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঐ জিনিস ব্যবহার করতে পারবে না (বাদায়েউস সানায়ে, হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস)।

শাফেয়ী ফিকাহবিদদের মতে, স্ত্রীকে যদি তালাক কিংবা যিহারের নিয়তে হারাম করা হয়ে থাকে তাহলে যে বিষয়ের নিয়ত করা হবে সেটিই কার্যকর হবে। রিজয়ী তালাকের নিয়ত করলে রিজয়ী তালাক হবে, বায়েন তালাকের নিয়ত করলে বায়েন তালাক হবে এবং যিহারের নিয়ত করলে যিহার হবে। কেউ যদি তালাক ও যিহার উভয়টি নিয়ত করে তাহরীমের শব্দ ব্যবহার করে থাকে তাহলে তাকে দু'টির মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করতে বলা হবে। কারণ, তালাক ও যিহার একই সাথে কার্যকরী হতে পারে না। তালাক দ্বারা বিবাহ বন্ধন নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যিহারের ক্ষেত্রে তা অবশিষ্ট থাকে। কোন নিয়ত ছাড়াই যদি স্ত্রীকে হারাম করে নেয়া হয়ে থাকে তাহলে সে হারাম হবে না। তবে কসমের জন্য অবশ্যই কাফ্‌ফারা দিতে হবে। আর যদি স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন জিনিস হারাম করে থাকে তাহলে তা একটি অনর্থক কাজ হিসেবে গণ্য হবে। সে জন্য তাকে কোন কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। (মুগনিউল মুহতাজ)

মালেকী ফিকাহবিদদের মতে, কেউ যদি স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন জিনিস হারাম করে নেয় তাহলে তা হারামও হয় না এবং তা ব্যবহার করার পূর্বে কোন কাফ্‌ফারা দেয়াও

আবশ্যক নয়। তবে কেউ যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি হারাম অথবা আমার জন্য হারাম অথবা আমি তোমার জন্য হারাম, সে ক্ষেত্রে সে ঐ স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করে থাক বা না থাক সর্বাবস্থায় তিন তালাক বলে গণ্য হবে। তবে সে যদি তিনের কম সংখ্যক তালাকের নিয়ত করে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। আসবাগ বলেছেন, কেউ যদি এভাবে বলে, আমার জন্য যা হালাল ছিল তা হারাম তাহলে স্ত্রীকে উল্লেখ করে বাদ না দেয়া পর্যন্ত এ কথা দ্বারা অবশ্যই স্ত্রীকে হারাম করে নেয়া বুঝাবে। আল মুদাওয়ানা গ্রন্থে এ ব্যাপারে যৌন মিলন হওয়া এবং যৌন মিলন না হওয়া স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। সহবাসকৃত স্ত্রীকে হারাম বলে দেয়ায় নিয়ত যাই থাক না কেন তিন তালাকই হয়ে যাবে। কিন্তু যে স্ত্রীর সাথে সে সহবাস করেনি, তার ক্ষেত্রে কম সংখ্যক তালাকের নিয়ত করা হয়ে থাকলে যে কয়টি তালাকের নিয়ত করা হয়েছে সেই কয়টি তালাকই হবে। আর যদি কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক তালাকের নিয়ত না থাকে তাহলে তিন তালাক হয়ে যাবে। (হাশিয়াতুদ দুসুকী) কাজী ইবনুল আরাবী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এ বিষয়ে ইমাম মালেকের (র) তিনটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এক, স্ত্রীকে তাহরীম করলে তা এক তালাক বায়েন হয়। দুই, এতে তিন তালাক হয়ে যায়। তিন, সহবাসকৃত স্ত্রীর বেলায় তাহরীম সর্বাবস্থায় তিন তালাক বলে গণ্য হবে। তবে যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি তার বেলায় এক তালাকের নিয়ত থাকলে এক তালাক হবে। তিনি আরো বলেন ঃ সঠিক কথা হলো, স্ত্রীকে তাহরীম করলে শুধু এক তালাক হবে। কারণ, কেউ কেউ যদি হারাম বলার পরিবর্তে তালাক শব্দ ব্যবহার করে এবং কোন সংখ্যার উল্লেখ না করে তাহলেও শুধু এক তালাক হবে।

এ বিষয়ে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) থেকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। এক, স্ত্রীকে তাহরীম করা অথবা হালালকে নিজের জন্য কেবল হারাম বলে গণ্য করা যিহার। এ ক্ষেত্রে যিহারের নিয়ত থাক বা না থাক তাতে কিছু এসে যায় না। দুই, এটা স্পষ্ট তালাকের ইংগিত। এ ক্ষেত্রে এক তালাকের নিয়ত থাকলেও তিন তালাক হয়ে যাবে। তিন, এটা কসম বলে গণ্য হবে। তবে সে যদি তালাক অথবা যিহারের মধ্যেকার যে কোন একটির নিয়ত করে তাহলে ভিন্ন কথা। কারণ, সে ক্ষেত্রে যেটির নিয়ত করবে সেটিই কার্যকর হবে। এসব উক্তির মধ্যে প্রথম উক্তিটিই হাম্বলী মাযহাবের রায় বলে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। (আল ইনসাফ)

৫. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের প্রভু এবং সমস্ত কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়ক। কিসে তোমাদের কল্যাণ তা তিনিই সবচেয়ে ভাল করে জানেন আর যে আদেশ-নিষেধ তিনি তোমাদের দিয়েছেন তাও সরাসরি হিকমাত তথা গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও যুক্তি নির্ভর। প্রথম কথাটি বলার অর্থ হচ্ছে, তোমরা নিজেরা স্বাধীন নও। বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা আর তিনি তোমাদের প্রভু। তাই তাঁর নির্ধারিত পন্থা ও পদ্ধতিতে রদবদল করার অধিকার তোমাদের কারো নেই। তোমাদের কর্তব্য হলো, নিজেদের সব ব্যাপার তাঁর ওপর সোপর্দ করে কেবল তাঁরই আনুগত্য করতে থাকো। দ্বিতীয় কথাটি বলে এ সত্যটি মনমগজে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যেসব পন্থা-পদ্ধতি ও আইন-কানুন নির্ধারিত করে দিয়েছেন তা জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও যুক্তি নির্ভর। তিনি যে জিনিস হালাল করেছেন তা জ্ঞান ও হিকমাতের ভিত্তিতে হালাল করেছেন। আর যে জিনিস হারাম করেছেন তাও জ্ঞান ও হিকমাতের ভিত্তিতেই হারাম করেছেন। এটা কোন খামখেয়ালী নয় যে, তিনি

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۝

(এ ব্যাপারটিও লক্ষণীয় যে,) নবী তাঁর এক স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন। পরে সেই স্ত্রী যখন (অন্য কারো কাছে) সেই গোপনীয় বিষয়টি প্রকাশ করে দিল এবং আল্লাহ নবীকে এই (গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করার) ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন তখন নবী (ঐ স্ত্রীকে) কিছুটা সাবধান করলেন এবং কিছুটা মাফ করে দিলেন। নবী যখন তাকে (গোপনীয়তা প্রকাশের) এই কথা জানালেন তখন সে জিজ্ঞেস করলো ঃ কে আপনাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছে? নবী বললেন ঃ আমাকে তিনি অবহিত করেছেন যিনি সবকিছু জানেন এবং সর্বাধিক অবহিত।[৬]

যুক্তিহীনভাবে যে জিনিসকে ইচ্ছা হালাল করেছেন এবং যে জিনিসকে ইচ্ছা হারাম করেছেন। তাই যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে তাদের বুঝা উচিত, عليم (মহাজ্ঞানী) ও حكيم (প্রজ্ঞাময় ও কৌশলী) আমরা নই বরং আল্লাহই "আলীম" ও "হাকীম"। তাঁর দেয়া আদেশ-নিষেধের আনুগত্যের মধ্যেই আমাদের কল্যাণ নিহিত।

৬. বিভিন্ন রেওয়ায়াতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নবী (সা) অমুক বিষয়টি সম্পর্কে গোপনে তাঁর এক স্ত্রীকে বলেছিলেন এবং সেই স্ত্রী আবার তা অন্য স্ত্রীকে বলেছিলেন। আমাদের মতে, প্রথমত বিষয়টি অনুসন্ধান করে বের করা ঠিক নয়। কারণ, গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করে দেয়ার কারণেই তো আল্লাহ তা'আলা এখানে নবীর (সা) এক স্ত্রীকে তিরস্কার করছেন। তাই তা খুঁজে খুঁজে বরে করা ও প্রকাশ করার চিন্তায় লেগে যাওয়া আমাদের জন্য কি করে ঠিক হবে। দ্বিতীয়ত আয়াতটি যে উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে তার প্রেক্ষিতে বিচার করলে গোপনীয় কথাটি কি ছিল তার আদৌ কোন গুরুত্ব থাকে না। আয়াতের উদ্দেশ্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক থাকলে আল্লাহ তা'আলা নিজেই তা বলে দিতেন। মূল যে উদ্দেশ্যের জন্য এ বিষয়টি কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে তা নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের একজনকে তাঁর ভুলের জন্য তিরস্কার করা। তাঁর ভুল হলো, তাঁর মহান ও মর্যাদাবান স্বামী গোপনে তাঁকে যে কথাটি বলেছিলেন তা তিনি গোপন রাখেননি, বরং প্রকাশ করে দিয়েছেন। এটি যদ্রি দুনিয়ার আর দু'দশটি স্বামী স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের মত শুধু একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলার সরাসরি অহীর মাধ্যমে নবীকে (সা) তা জানিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা শুধু জানিয়ে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করেননি, বরং তা নিজের সেই কিতাবে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যা সারা দুনিয়ার মানুষকে চিরদিন পড়তে হবে। কিন্তু এ বিষয়টিকে যে কারণে এরূপ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তাহচ্ছে, তিনি কোন সাধারণ স্বামীর স্ত্রী ছিলেন না। বরং এক মহান ও মর্যাদাবান স্বামীর স্ত্রী ছিলেন যাকে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ④

তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর কাছে তাওবা করো (তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম), কেননা, তোমাদের মন সরল সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে[৭] আর যদি তোমরা নবীর বিরুদ্ধে পরস্পর সংঘবদ্ধ হও[৮] তা হলে জেনে রাখো, আল্লাহ তার অভিভাবক, তাছাড়া জিবরাঈল, নেক্কার ঈমানদারগণ এবং সব ফেরেশতা তার সাথী ও সাহায্যকারী।[৯]

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন। যাঁকে সর্বক্ষণ কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে একটি নিরবছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছিল। যাঁর নেতৃত্বে কুফরী বিধানের স্থলে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক চেষ্টা-সাধনা চলছিল। এরূপ মহান ব্যক্তিত্বের ঘরে এমন অসংখ্য কথা হতে পারতো যা গোপন না থেকে যদি আগেভাগেই প্রকাশ হয়ে পড়তো তাহলে তিনি যে মহত কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছিলেন তার ক্ষতি হতে পারত। তাই সেই ঘরের এক মহিলার থেকে যখন প্রথমবারের মত এই দুর্বলতা প্রকাশ পেল যে, তাঁকে গোপনে যে কথাটি বলা হয়েছিল তা তিনি অন্যের কাছে প্রকাশ করে দিলেন (যদিও তিনি অপর কেউ ছিলেন না, বরং নিজ পরিবারেরই একজন সদস্য ছিলেন)। এ কাজের জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁকে তিরস্কার করা হলো এবং গোপনেও তাঁকে তিরস্কার করা হয়নি, বরং কুরআন মজীদে প্রকাশ্যে তিরস্কার করা হয়েছে। যাতে শুধু নবীর (সা) স্ত্রীগণকেই নয় বরং মুসলিম সমাজের সমস্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের স্ত্রীদেরকেও গোপনীয় বিষয় সংরক্ষণের প্রশিক্ষণ দেয়া যায়। যে গোপনীয় কথাটি প্রকাশ করে দেয়া হয়েছিল তা বিশেষ কোন গুরুত্ব বহন করতো কিনা এবং তা প্রকাশ হওয়ার কারণে কোন ক্ষতির আশংকা ছিল কিনা আয়াতে সে বিষয়টি একেবারেই উপেক্ষা করা হয়েছে। তিরস্কার করা হয়েছে শুধু এ জন্য যে, গোপনীয় কথা অন্যের কাছে বলে দেয়া হয়েছিল। কারণ, কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির পরিবারের লোকজনের মধ্যে যদি এরূপ দুর্বলতা বিদ্যমান থাকে যে, তারা গোপনীয় বিষয় সংরক্ষণের ব্যাপারে অবহেলা করেন তাহলে আজ একটি গুরুত্বহীন গোপনীয় বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়লে কাল অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় বিষয়ও প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। সমাজে যে ব্যক্তি যত অধিক দায়িত্বশীল পদমর্যাদার অধিকারী হবে তত অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক বিষয়াদি তার পরিবারের লোকদের অবগতিতে আসবে। গোপনীয় বিষয়াদি যদি তাদের মাধ্যমে অন্যদের কাছে পৌছে যায় তাহলে এই দুর্বলতা যে কোন সময় যে কোন বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৭. মূল ইবারত হচ্ছে, فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا । صغو আরবী ভাষায় বেঁকে যাওয়া এবং তেড়া হয়ে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব এ আয়াতাংশের অনুবাদ করেছেন ঃ هرائيه كج شده استدل شما এবং শাহ

রফীউদ্দীন সাহেব অনুবাদ করেছেন ঃ "তোমাদের অন্তর বাঁকা হয়ে গিয়েছে।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), সুফিয়ান সাওরী এবং দাহ্হাক এর অর্থ করেছেন زاغت قلوبكما অর্থাৎ সোজা পথ থেকে তোমাদের মন সরে গিয়েছে। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম রাযী (র) বলেন ঃ عدلت ومالت عن الحق وهو حق الرسول صلى الله عليه وسلم হক থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আর হক অর্থ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের হক। আল্লামা আলুসীর ব্যাখ্যা হচ্ছে,

مَالَتْ عَنِ الْوَاجِبِ مِنْ مُوَافَقَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُبِّ مَايُحِبُّهُ وَكِرَاهَةَ مَا يَكْرَهُهُ اِلٰى مُخَالَفَتِهٖ -

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা পছন্দ করেন তা পছন্দ করা এবং যা অপছন্দ করেন তা অপছন্দ করার ব্যাপারে তাঁর সাথে মিল রেখে চলা তোমাদের জন্য অবশ্য করণীয়। কিন্তু এ ব্যাপারে তোমাদের মন তাঁর সাথে সাজুয্য রক্ষা করে চলা থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁর বিরোধিতা করার দিকে বেঁকে গিয়েছে।

৮. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে وَاِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ । تظاهر অর্থ কারো বিরুদ্ধে পরস্পর সহযোগিতা করা অথবা কারো বিরুদ্ধে বেঁকে বসা। শাহ ওয়ালীউল্লাহ এ আয়াতাংশের অনুবাদ করেছেনঃ اكر بايم متفق شويد بر رنجا يرن يبغمبر "যদি নবীকে কষ্ট দেয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ হও। শাহ্ আবদুল কাদের সাহেবের অনুবাদ হলো ঃ "তোমরা দু'জন যদি তাঁর ওপর চড়াও হও।" মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবের অনুবাদ হলো, তোমরা দুইজন যদি নবীর বিরুদ্ধে এভাবেই কাজকর্ম করতে থাক। মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী সাহেব এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ যদি তোমরা দুইজন এভাবে কাজকর্ম করতে এবং ক্ষোভ দেখাতে থাক।"

আয়াতে স্পষ্টভাবে দুইজন মহিলাকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর প্রসংগ থেকে জানা যায় যে, ঐ দু'জন মহিলা ছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সালামের পবিত্র স্ত্রীদের অন্তরভুক্ত। কেননা এই সূরার প্রথম আয়াত থেকে পঞ্চম আয়াত পর্যন্ত একাদিক্রমে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের বিষয়াদিই আলোচিত হয়েছে। কুরআন মজীদের বাচনভঙ্গি থেকে এতটুকু বিষয় প্রকাশ পাচ্ছে। এখন প্রশ্ন ঐ দু'জন স্ত্রী ছিলেন কে কে? আর যে কারণে এ তিরস্কার করা হলো সেই বিষয়টিই বা কি ছিল। এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা আমরা হাদীস শরীফে দেখতে পাই। মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী হাদীস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস কর্তৃক একটি বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যাতে কিছুটা শাব্দিক তারতম্য সহ এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন ঃ

আমি অনেক দিন থেকে মনে করছিলাম হযরত উমরকে (রা) জিজ্ঞেস করবো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে যে দু'জন তাঁর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন এবং যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেছিলেন اِنْ تَتُوبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا তারা কে? কিন্তু তার ভয়াল

ব্যক্তিত্বের কারণে আমার সে সাহস হতো না। শেষ পর্যন্ত হজ্জে গেলে আমিও তাঁর সাথে গেলাম। ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে এক জায়গায় তাঁকে অযু করানোর সময় আমি সুযোগ পেয়ে গেলাম এবং বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন ঃ তাঁরা ছিলেন হযরত আয়েশা (রা) এবং হাফসা (রা)। তারপর তিনি বলতে শুরু করলেন, আমরা কুরাইশীরা আমাদের স্ত্রীদেরকে দমিয়ে রাখতে অভ্যস্ত ছিলাম। আমরা মদীনায় আসলে এখানে এমন অনেক লোক পেলাম যাদের স্ত্রীরা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ছিল। ফলে আমাদের স্ত্রীরাও তাদের থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করলো। একদিন আমি আমার স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হলে বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, সে–ও আমাকে পাল্টা জবাব দিচ্ছে (মূল ভাষা হচ্ছে فاذا هى تراجعنى)। সে আমার কথার প্রত্যুত্তর করলো—এটা আমার অত্যন্ত খারাপ লাগলো। সে বললো ঃ আমি আপনার কথার প্রত্যুত্তর করছি তাতে আপনি রাগান্বিত হচ্ছেন কেন? আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ তো তাঁকে কথায় কথায় জবাব দিয়ে থাকেন(মূল ভাষা হচ্ছে ليراجعنه)। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নবীর (সা) প্রতি সারা দিন অসন্তুষ্ট থাকেন (বুখারীর বর্ণনায় আছে নবী (সা) সারা দিন তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন)। এ কথা শুনে আমি বাড়ী থেকে বের হলাম এবং হাফসার (রা) কাছে গেলাম [হযরত উমরের (রা) কন্যা এবং নবীর (সা) স্ত্রী।] আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি কি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার প্রত্যুত্তর করো? সে বললো ঃ হাঁ। আমি আরো জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মধ্যে কেউ কি সারাদিন নবীর (সা) প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে? [বুখারীর বর্ণনা হচ্ছে, নবী (সা) সারা দিন তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।] সে বললো ঃ হাঁ। আমি বললাম ঃ তোমাদের মধ্য থেকে যে মহিলা এরূপ করে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমাদের মন থেকে কি এ ভয় দূর হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহর রসূলের অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং সে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হবে? কখনো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার প্রত্যুত্তর করবে না। (এখানেও একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে لا تراجعى) এবং তাঁর কাছে কোন জিনিসের দাবীও করবে না। আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা তুমি চেয়ে নিও। তোমার সতীন [অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা)] তোমার চাইতে অধিক সুন্দরী এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অধিক প্রিয়। তাঁর কারণে তুমি আত্মপ্রতারিত হয়ো না। এরপর আমি সেখানে থেকে বের হয়ে উম্মে সালামার (রা) কাছে গেলাম এবং এ ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বললাম। তিনি ছিলেন আমার আত্মীয়া। তিনি আমাকে বললেন ঃ খাত্তাবের বেটা; তুমি তো দেখছি অদ্ভুত লোক! প্রত্যেক ব্যাপারে তুমি হস্তক্ষেপ করছ! এমন কি এখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে চলেছ। তাঁর এই কথায় আমি সাহস হারিয়ে ফেললাম। এরপর হঠাৎ আমার এক আনসার প্রতিবেশী রাত্রি বেলায় আমার বাড়ীতে এসে আমাকে ডাকলেন। আমরা দু'জন পালা করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে হাজির হতাম এবং যার পালার দিন যে কথা হতো তা একে অপরকে বলতাম। এই সময়টা ছিল এমন যখন আমাদের বিরুদ্ধে গাসসানীদের আক্রমণের বিপদাশংকা দেখা দিয়েছিল। তার আহবানে আমি বের হলে সে বলল ঃ একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ গাস্‌সানীরা কি আক্রমণ করে বসেছে? সে বলল ঃ না তার চেয়েও বড় ঘটনা ঘটেছে। রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। আমি বললাম ঃ হাফসা ব্যর্থ ও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বুখারীর ভাষা হচ্ছেঃ رغم انف حفصة وعائشة এমনটা ঘটবে বলে আমি প্রথমেই আশংকা করেছিলাম।

কাহিনীর পরবর্তী অংশ আমরা উল্লেখ করলাম না। এ অংশে হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ তিনি পরদিন সকালে নবীর (সা) খেদমতে হাজির হয়ে কিভাবে তাঁর ক্রোধ নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছেন। আমরা মুনসাদে আহমাদ ও বুখারীর বর্ণিত হাদীসসমূহ একত্রিত করে এ কাহিনী বিন্যস্ত করেছি। এতে হযরত উমর (রা) যে مراجعت শব্দ ব্যবহার করেছেন এখানে তার আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে না। বরং পূর্বাপর বিষয় থেকে আপনাআপনি প্রকাশ পায় যে, এ শব্দটি প্রতি উত্তর বা কথার পৃষ্ঠে কথা বলা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং হযরত উমরের (রা) তাঁর কন্যাকে لا تراجعى رسول الله। বলাটা স্পষ্টত এ অর্থে বলা হয়েছে যে, নবীর (সা) সাথে বাদানুবাদ করো না। কেউ কেউ এই অনুবাদকে ভুল বলে থাকেন। তাদের আপত্তি হচ্ছে, مراجعت শব্দের অর্থ পাল্টা জবাব দেয়া অথবা কথার পৃষ্ঠে কথা বলা ঠিক, কিন্তু বাদানুবাদ করা ঠিক নয়। কিন্তু আপত্তিকারী এ ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়টি উপলব্ধি করেন না যে, কম মর্যাদার লোক যদি তার চেয়ে বড় মর্যাদার ব্যক্তিকে পাল্টা জবাব দেয় কিংবা কথার পৃষ্ঠে কথা বলে তাহলে তাকেই বাদানুবাদ করা বলে। উদাহরণ স্বরূপ, বাপ যদি ছেলেকে কোন কারণে তিরস্কার বা শাসন করে অথবা তাঁর কোন কাজে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে আর ছেলে যদি তাতে আদবের সাথে চুপ থাকা বা ওজর পেশ করার পরিবর্তে পাল্টা জবাব দিতে থাকে, তাহলে একে বাদানুবাদ ছাড়া আর কিছু বলা যেতে পারে না। কিন্তু ব্যাপারটা যখন বাপ এবং ছেলের মধ্যেকার না হয়ে বরং আল্লাহর রসূল এবং তাঁর উম্মাতের কোন লোকের মধ্যেকার ব্যাপার হয় তাহলে একজন নির্বোধই কেবল এ কথা বলতে পারে যে, এটা বাদানুবাদ নয়।

আমাদের এই অনুবাদকে কিছু লোক বেআদবী বা অশিষ্টতা বলে আখ্যায়িত করে। অথচ তা বেআদবী কেবল তখনই হতো যদি আমরা হযরত হাফসা (রা) সম্পর্কে নিজের পক্ষ থেকে এ ধরনের ভাষা প্রয়োগ করার দুঃসাহস দেখাতাম। আমরা তো হযরত উমরের (রা) কথার সঠিক অর্থ তুলে ধরেছি। আর তিনি তাঁর মেয়েকে তার ত্রুটির জন্য তিরস্কার করতে গিয়ে এ কথাটি বলেছেন। একে বেআদবী বলার অর্থ হচ্ছে, হয় পিতাও তার নিজের মেয়েকে শাসন বা তিরস্কারের সময় আদবের সাথে কথা বলবে অথবা তার তিরস্কার মিশ্রিত ভাষার অনুবাদকারীর নিজের পক্ষ থেকে তাকে মার্জিত ও শিষ্ট ভাষা বানিয়ে দেবে।

এ ক্ষেত্রে সত্যিকার ভেবে দেখার বিষয় হচ্ছে, ব্যাপারটা যদি এ রকম হালকা ও মামুলী ধরনের হতো যে, নবী (সা) তাঁর স্ত্রীদের কিছু বললে তাঁরা পাল্টা তার জবাব দিতেন, তাহলে তাকে এতো গুরুত্ব কেন দেয়া হলো যে, কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা নিজে সরাসরি নবীর (সা) ঐ স্ত্রীদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিলেন? আর হযরত উমরই (রা) বা এ বিষয়টিকে এত মারাত্মক মনে করলেন কেন যে, প্রথমে নিজের মেয়েকে তিরস্কার করলেন এবং তার পর এক এক করে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ
قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ⑤

নবী যদি তোমাদের মত সব স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন তাহলে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরিবর্তে তাকে এমন সব স্ত্রী দান করবেন যারা তোমাদের চেয়ে উত্তম হবে।[১০] সত্যিকার মুসলমান, ঈমানদার,[১১] অনুগত,[১২] তাওবাকারিনী,[১৩] ইবাদাত গোজার[১৪] এবং রোযাদার।[১৫] তারা পূর্বে বিবাহিত বা কুমারী যাই হোক না কেন।

প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে তাঁদেরকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয় দেখিয়ে সাবধান করলেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তাঁর মতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এমন চড়া মেজাজের ছিলেন যে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারেও স্ত্রীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন? তাছাড়া (মা'য়াযাল্লাহ) তাঁর দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেজাজ এতই কঠোর ছিল যে, এ ধরনের কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি একবার সব স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর নিজের কুঠরিতে নির্জন জীবন গ্রহণ করেছিলেন, কেউ যদি এসব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সে অবশ্যই দু'টি পথের যে কোন একটি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। হয় তার কাছে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের সম্মান ও মর্যাদার বিষয় এত বড় হয়ে দেখা দেবে যে, সে এ জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দোষ-ক্রটিরও পরোয়া করবে না। অথবা সোজাসুজি এ কথা মেনে নিতে হবে যে, সেই সময় নবীর (সা) ঐ সব পবিত্র স্ত্রীদের আচরণ প্রকৃতই এমন আপত্তিকর হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে রসূলের ভূমিকা ন্যায়সংগত ছিল এবং তাঁর চেয়ে অধিক ন্যায়সংগত ছিল আল্লাহ তা'আলার ভূমিকা যে কারণে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের এই আচরণ সম্পর্কে কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন।

৯. অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে জোট পাকিয়ে তোমরা কেবল নিজের ক্ষতিই ডেকে আনবে। কারণ আল্লাহ যাঁর প্রভু এবং জিবরাঈল, সমস্ত ফেরেশতা ও সৎকর্মশীল ঈমানদারগণ যার সংগী ও সহযোগী তাঁর বিরুদ্ধে জোট পাকিয়ে কেউ-ই সফলতা লাভ করতে পারে না।

১০. এ থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা) এবং হাফসাই (রা) শুধু ভুল করেছিলেন না বরং নবীর (সা) অন্য স্ত্রীগণও কিছু না কিছু ভুল করেছিলেন। এ কারণেই আয়াতে তাঁদের দু'জনকে ছাড়াও নবীর (সা) অন্যসব স্ত্রীদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। এসব ভুল আচরণের ধরন সম্পর্কে কুরআন মজীদে কোন প্রকার আলোকপাত করা হয়নি। তবে এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে কিছু বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। এখানে আমরা তা উদ্ধৃত করলাম ঃ

বুখারীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের পারস্পরিক ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নবীকে (সা) অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। হাদীসের মূল ভাষা হচ্ছেঃ اِجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ । তাই আমি তাঁদের বললাম ঃ নবী (সা) যদি তোমাদের তালাক দিয়ে দেন তাহলে আল্লাহ তা'আলার তাঁকে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করা অসম্ভব নয়। হযরত আনাসের (রা) বরাত দিয়ে ইবনে আবী হাতেম হযরত উমরের (রা) বর্ণনা নিম্নোক্ত ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন ঃ আমার কাছে এ মর্মে খবর পৌছল যে, নবী (সা) ও উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। এ কথা শুনে আমি তাঁদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে বললাম ঃ তোমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অতিষ্ঠ করা থেকে বিরত থাক। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা নবীকে (সা) তোমাদের পরিবর্তে উত্তম স্ত্রী দান করবেন। এমনকি আমি যখন উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে শেষ জনের কাছে গেলাম [বুখারীর একটি হাদীসের বর্ণনা অনুসারে তিনি ছিলেন হযরত উম্মে সালামা (রা)] তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ হে উমর! রসূলুল্লাহ কি স্ত্রীদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্য যথেষ্ট নন যে, তুমি তাঁদেরকে উপদেশ দিতে চলেছ? এতে আমি চুপ হয়ে গেলাম। অতপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন।

মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) যখন সাময়িকভাবে তাঁর স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা বন্ধ করলেন তখন আমি মসজিদে নববীতে পৌছে দেখলাম লোকজন চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে বসে নুড়িপাথর তুলছে এবং নিক্ষেপ করছে এবং পরস্পর বলাবলি করছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। এরপর হযরত উমর (রা) হযরত আয়েশা (রা) ও হাফসার কাছে তাঁর যাওয়ার এবং তাঁদের উপদেশ দেয়ার কথা উল্লেখ করলেন। তারপর বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম, স্ত্রীদের ব্যাপারে আপনি চিন্তিত হচ্ছেন কেন? আপনি যদি তাঁদের তালাক দেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে আছেন, সমস্ত ফেরেশতা, জিবরাঈল ও মিকাঈল আপনার সাথে আছেন, আর আমি, আবু বকর এবং সমস্ত ঈমানদার আপনার সাথে আছেন। আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। কারণ, খুব কমই এ রকম হয়েছে যে, আমি কোন কথা বলেছি এবং আল্লাহ তা'আলা তা সত্যায়ন ও সমর্থন করবেন বলে আশা করি নাই। বস্তুত এরপর সূরা তাহরীমের এ আয়াতগুলো নাযিল হয়। এরপর আমি নবীকে (সা) জিজ্ঞেস করলাম। আপনি স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেন, না। এ কথা শুনে মসজিদে নববীর দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলাম যে, নবী (সা) তাঁর স্ত্রীদের তালাক দেন নাই।

বুখারীতে হযরত আনাস (রা) থেকে এবং মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত আবু হুরাইরা থেকে এ বিষয়ে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) এক মাস পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীদের থেকে আলাদা থাকার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং নিজের কুঠরিতে অবস্থান করতে শুরু করেছিলেন। ২৯ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে বললেন ঃ আপনার কসম পূরণ হয়েছে, মাস পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

হাফেজ বদরুদ্দীন আইনী উমদাতুল কারী গ্রন্থে হযরত আয়েশার (রা) বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে দু'টি দলের সৃষ্টি হয়েছিল। একটিতে ছিলেন হযরত আয়েশা (রা), হযরত হাফসা (রা), হযরত সাওদা (রা) ও হযরত সাফিয়া (রা)। আর অপরটিতে ছিলেন হযরত যয়নাব, হযরত উম্মে সালামা এবং অবশিষ্ট উম্মুল মু'মিনীনগণ।

ঐ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পারিবারিক জীবনে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এসব বর্ণনা থেকে তা কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করে নবীর (সা) স্ত্রীদের কর্মপদ্ধতি ও আচরণ সংশোধন করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। নবীর (সা) স্ত্রীগণ যদিও সমাজের মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম মহিলা ছিলেন, তথাপি তাঁরা ছিলেন মানুষ। তাই তাঁরা মানসিক চাহিদা ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। নিরবচ্ছিন্নভাবে কষ্টকর জীবন যাপন কোন কোন সময় তাঁদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। তাই তাঁরা অধৈর্য হয়ে নবীর (সা) কাছে খোরপোষের দাবী করতে শুরু করতেন। এ অবস্থায় সূরা আহযাবের ২৮—২৯ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উপদেশ দিয়েছেন যে, পার্থিব স্বাচ্ছন্দই যদি তোমাদের কাম্য হয়ে থাকে তাহলে আমার রসূল তোমাদেরকে উত্তম পন্থায় বিদায় দিয়ে দেবেন। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আখেরাতের জীবন কামনা করো তাহলে রসূলের সাহচর্যে থাকার কারণে যেসব দুঃখ কষ্ট আসবে তা বরদাশত করো (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আহযাব, টীকা-৪১ এবং সূরা আহযাবের ভূমিকা)। তাছাড়া কোন কোন সময় নারী প্রকৃতির কারণে তাদের থেকে স্বভাবতই এমনসব বিষয় প্রকাশ পেত যা সাধারণ মানবীয় বৈশিষ্টের পরিপন্থী ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে যে ঘরের স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা দান করেছিলেন তার মর্যাদা ও গৌরব এবং মহান দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এসব কারণে যখন এ আশংকা দেখা দিল যে তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পারিবারিক জীবনকে বিষিয়ে তুলতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলা নবীর(সা) দ্বারা যে মহত কাজ আঞ্জাম দিচ্ছিলেন তার ওপর এর প্রভাব পড়তে পারে, তাই কুরআন মজীদের এ আয়াত নাযিল করে তাঁদের সংশোধন করলেন। যাতে তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের মধ্যে সেই মর্যাদা ও দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি হয় যা তাঁরা আল্লাহর সর্বশেষ রসূলের জীবন সঙ্গিনী হওয়ার কারণে লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। আর তাঁরা যেন নিজেদেরকে সাধারণ নারীদের মত এবং নিজেদের পরিবারকে সাধারণ পরিবারসমূহের মত মনে করে না বসেন। এ আয়াতের প্রথম অংশটিই এমন যা শুনে হয়তো নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের হৃদয়-মন কেঁপে উঠে থাকবে। তাঁদের জন্য এ কথাটির চেয়ে বড় হুঁশিয়ারী আর কি হবে যে, নবী যদি তোমাদের তালাক দেন তাহলে আল্লাহর তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে উত্তম স্ত্রী দান করাটা অসম্ভব নয়। প্রথমত নবীর (সা) কাছে থেকে তালাক পাওয়ার চিন্তা বা কল্পনাই তাঁদের কাছে অসহনীয় ব্যাপার। তাছাড়া আরো বলা হয়েছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার মর্যাদা তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং অন্য যেসব নারীকে আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্ত্রী হিসেবে আনবেন তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম হবেন। এরপরে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিরস্কারযোগ্য হতে পারে এমন কোন কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের দ্বারা সংঘটিত হওয়া সম্ভবই ছিল না।

এ কারণে আমরা কুরআন মজীদে শুধু দু'টি যায়গায় এমন দেখতে পাই যেখানে মহা সম্মানিত এই নারীদেরকে হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে। উক্ত জায়গা দু'টির একটি সূরা আহযাবে এবং অপরটি সূরা তাহরীমে।

১১. মুসলিম এবং মু'মিন শব্দ এক সাথে ব্যবহৃত হলে মুসলিম শব্দের অর্থ হয় কার্যত আল্লাহর হুকুম আহকাম অনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তি এবং মু'মিন অর্থ হয় এমন ব্যক্তি যে সরল মনে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছে। অতএব, সর্বোত্তম মুসলমান স্ত্রীর প্রাথমিক বৈশিষ্ট হচ্ছে, সে সরল মনে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর দীনের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং নিজের চরিত্র, অভ্যাস, স্বভাব ও আচরণে আল্লাহর দীনের অনুসারী হয়।

১২. এর দু'টি অর্থ এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এক, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত। দুই, স্বামীর অনুগত।

১৩. تائب (তাওবাকারী) শব্দটি যখন মানুষের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন তা শুধু একবার মাত্র তওবাকারীকে বুঝায় না। বরং তা এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যে নিজের অপরাধ ও ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে সদাসর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, যার বিবেক জীবন্ত ও সচেতন, যার মধ্যে সবসময় নিজের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির অনুভূতি জাগ্রত থাকে এবং সে জন্য সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত থাকে। এ প্রকৃতির মানুষের মধ্যে কোন সময় গর্ব, অহংকার, অহমিকা বা আত্মতুষ্টির অনুভূতি সৃষ্টি হয় না। স্বভাবগতভাবে সে হয় নম্র মেজাজ এবং সহিষ্ণু ও উদার।

১৪. ইবাদাতকারী ব্যক্তি কোন অবস্থায় কখনো সেই ব্যক্তির মত আল্লাহ সম্পর্কে গাফিল হতে পারে না যে আল্লাহর ইবাদাত করে না। কোন নারীকে উত্তম স্ত্রী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এ জিনিসটারও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ইবাদাত গোজার হওয়ার কারণে সে হুদূদুল্লাহ বা আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ মেনে চলে, হকদারদের হক আদায় করে, তার ঈমান সবসময় জীবন্ত ও সতেজ থাকে, সে আল্লাহর হুকুম আহকাম পালন করা থেকে বিরত হবে না—এটাই তার কাছে আশা করা যায়।

১৫. মূল ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে سائحات । কয়েকজন সাহাবী থেকে বহু সংখ্যক তাবেয়ী এর অর্থ বর্ণনা করেছেন صائمات (রোযাদার)। যে সম্পর্কের কারণে سياحت শব্দ রোযা অর্থে ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে, প্রাচীনকালে পুরোহিত এবং দরবেশরাই বেশী বেশী ভ্রমণ করতো। ভ্রমণের সময় তাদের কাছে কোন পাথেয় থাকত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যতক্ষণ কোথাও থেকে কোন খাদ্য না পাওয়া যেতো ততক্ষণ তাদেরকে অভুক্ত থাকতে হতো। এদিক দিয়ে বিচার করলে রোযাও এক ধরনের দরবেশী। কারণ ইফতারের সময় না হওয়া পর্যন্ত রোযাদারও অভুক্ত থাকে। ইবনে জারীর সূরা তাওবার ১২ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আয়েশার (রা) একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, سياحة هذه الامة الصيام রোযা এই উম্মাতের سياحت (অর্থাৎ দরবেশী) এ ক্ষেত্রে সৎকর্মশীল স্ত্রীদের প্রশংসায় তাদের রোযাদারীর কথা উল্লেখ করার অর্থ শুধু এ নয় যে, তারা রমজানের ফরয রোযা রাখে বরং এর অর্থ হচ্ছে, তারা ফরয রোযা ছাড়াও নফল রোযাও রেখে থাকে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

হে লোকজন যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার ও সন্তান–সন্ততিকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো মানুষ এবং পাথর হবে যার জ্বালানী।[১৬] সেখানে রুঢ় স্বভাব ও কঠোর হৃদয় ফেরেশতারা নিয়োজিত থাকবে যারা কখনো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তাই পালন করে[১৭] (তখন বলা হবে,) হে কাফেরগণ! আজ ওযর প্রকাশ করো না। তোমরা যেমন আমল করছিলে তেমনটি প্রতিদানই দেয়া হচ্ছে।[১৮]

"নবী (সা) যদি তোমাদের তালাক দেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরিবর্তে তাঁকে এমনসব স্ত্রী দান করবেন যাদের মধ্যে অমুক অমুক গুণাবলী থাকবে।" নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণকে উদ্দেশ করে আল্লাহ তা'আলার এ কথা বলার অর্থ এ নয় যে, তাদের মধ্যে এসব গুণাবলী ছিল না। বরং এর অর্থ হলো, তোমাদের ত্রুটিপূর্ণ আচরণের কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে কষ্ট হচ্ছে তোমরা তা পরিত্যাগ করো এবং তার পরিবর্তে তোমাদের মধ্যে এসব গুণাবলী পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টির জন্য একান্তভাবে মনোনিবেশ করো।

১৬. এ আয়াত থেকে প্রকাশ পায় যে, আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর মধ্যেই কোন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রকৃতির বিধান যে পরিবারটির নেতৃত্বের বোঝা তার কাঁধে স্থাপন করেছে তার সদস্যরা যাতে আল্লাহর প্রিয় মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে সাধ্যমত সে শিক্ষা দীক্ষা দেয়াও তার কাজ। তারা যদি জাহান্নামের পথে চলতে থাকে তাহলে যতটা সম্ভব তাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। তার সন্তান–সন্ততি পৃথিবীতে সুখী হোক তার শুধু এই চিন্তা হওয়া উচিত নয়। বরং এর চেয়েও তার বড় চিন্তা হওয়া উচিত এই যে, তারা যেন আখেরাতে জাহান্নামের ইন্ধন না হয়। বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তাকে তার অধীনস্ত লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। শাসকও রাখাল। তাকে তার অধীনস্ত লোকদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। নারী তার স্বামীর

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۭ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑧

২ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর কাছে তাওবা করো, প্রকৃত তাওবা।[১৯] অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তোমাদের দোষত্রুটিসমূহ দূর করে দিবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে।[২০] সেটি হবে এমন দিন যেদিন আল্লাহ তাঁর নবী এবং নবীর সঙ্গী ঈমানদারদের লাঞ্ছিত করবেন না।[২১] তাদের 'নূর' তাদের সামনে ও ডান দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকবে এবং তারা বলতে থাকবে, হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের 'নূর' পূর্ণাঙ্গ করে দাও ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তুমি সব কিছু করতে সক্ষম।[২২]

বাড়ী এবং তার সন্তান–সন্ততির তত্ত্বাবধায়িকা তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

পাথর হবে জাহান্নামের জ্বালানী। এর অর্থ পাথরের কয়লা। [ইবনে মাসউদ (রা), ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ (রা), ইমাম বাকের (র) ও সুদ্দীর মতে, এর অর্থ গন্ধকের পাথর।]

১৭. অর্থাৎ কোন অপরাধীকে যে কোন শাস্তি দেয়ার নির্দেশই তাদের দেয়া হবে তা তারা হুবহু কার্যকরী করবে এবং কোন প্রকার দয়া মায়া দেখাবে না।

১৮. এ দু'টি আয়াতের বাচনভঙ্গির মধ্যে মুসলমানদের জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী বিদ্যমান। প্রথম আয়াতে মুসলমানদেরকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে এই ভয়ানক আযাব থেকে রক্ষা করো। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, জাহান্নামে শাস্তি দিতে গিয়ে কাফেরদেরকে এ কথাটি বলা হবে। এভাবে স্বতঃই যে বিষয়টি প্রতিভাত হয় তা হচ্ছে, পৃথিবীতে মুসলমানদেরকে জীবনযাপনে এমন পদ্ধতি গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে যার কারণে আখেরাতে তাদের পরিণাম কাফেরদের সাথে যুক্ত হবে।

১৯. মূল আয়াতে تَوْبَةً نَّصُوْحًا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় نصح শব্দের অর্থ নিষ্কলুষতা ও কল্যাণকামিতা। খাঁটি মধু যা মোম ও অন্যান্য আবর্জনা থেকে মুক্ত

করা হয়েছে তাকে আরবীতে عسل ناصح বলা হয়। ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে দেয়া এবং ফাঁটা ফাঁটা কাপড় ঠিক করে দেয়া বুঝাতে আরবী نصاحة الثوب শব্দ ব্যবহার করা হয়। অতএব, তাওবা শব্দের সাথে نصوح বিশেষণ যুক্ত করলে হয় তার আভিধানিক অর্থ হবে এমন তাওবা যার মধ্যে প্রদর্শনী বা মুনাফিকীর লেশমাত্র নেই। অথবা তার অর্থ হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের কল্যাণ কামনা করবে এবং গোনাহ থেকে তাওবা করে নিজেকে মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করবে। অথবা তার অর্থ হবে গোনাহর কারণে তার দীনদারীর মধ্যে যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে তাওবা দ্বারা তা সংশোধন করবে। অথবা সে তাওবা করে নিজের জীবনকে এমন সুন্দর করে গড়ে তুলবে যে, অন্যের জন্য সে উপদেশ গ্রহণের কারণ হবে এবং তাকে দেখে অন্যরাও তার মত নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে। 'তাওবায়ে নাসূহ'-এর আভিধানিক অর্থ থেকে এ অর্থসমূহই প্রতিভাত হয়। এরপর অবশিষ্ট থাকে তাওবায়ে নাসূহ এর শরয়ী অর্থ। আমরা এর শারয়ী অর্থের ব্যাখ্যা পাই যির ইবনে হুবাইশের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে। যির ইবনে হুবাইশ বলেন ঃ আমি উবাই ইবনে কা'বের (রা) কাছে 'তাওবায়ে নাসূহ'-এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একই প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে, কখনো তোমার দ্বারা কোন অপরাধ সংঘটিত হলে তুমি নিজের গোনাহর জন্য লজ্জিত হবে। তারপর লজ্জিত হয়ে সে জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং ভবিষ্যতে আর কখনো ঐ কাজ করো না। হযরত উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইবনে মাসউদ এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এ অর্থই উদ্ধৃত হয়েছে। অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে হযরত উমর (রা) 'তাওবায়ে নাসূহা'র সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে ঃ তাওবার পরে পুনরায় গোনাহ করা তো দূরের কথা তা করার আকাংখা পর্যন্ত করবে না (ইবনে জারীর)। হযরত আলী (রা) একবার এক বেদুঈনকে মুখ থেকে ঝটপট করে তাওবা ও ইসতিগফারের শব্দ উচ্চারণ করতে দেখে বললেন, এতো মিথ্যাবাদীদের তাওবা। সে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে সত্যিকার তাওবা কি? তিনি বললেন ঃ সত্যিকার তাওবার সাথে ছয়টি জিনিস থাকতে হবে। (১) যা কিছু ঘটেছে তার জন্য লজ্জিত হও। (২) নিজের যে কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে গাফলতি করছ তা সম্পাদন কর। (৩) যার হক নষ্ট করেছ তা ফিরিয়ে দাও।(৪) যাকে কষ্ট দিয়েছ তার কাছে মাফ চাও। (৫) প্রতিজ্ঞা করো ভবিষ্যতে এ গোনাহ আর করবে না এবং (৬) নফসকে এতদিন পর্যন্ত যেভাবে গোনাহর কাজে অভ্যস্ত করেছ ঠিক তেমনি আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত কর। এতদিন পর্যন্ত নফসকে যেভাবে আল্লাহর অবাধ্যতার মজায় নিয়োজিত রেখেছিলে এখন তাকে তেমনি আল্লাহর আনুগত্যের তিক্ততা আস্বাদন করাও (কাশ্শাফ)।

তাওবা সম্পর্কিত বিষয়ে আরো কয়েকটি জিনিস ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। প্রথমত, প্রকৃতপক্ষে তাওবা হচ্ছে কোন গোনাহর কারণে এ জন্য লজ্জিত হওয়া যে, তা আল্লাহর নাফরমানী। কোন গোনাহর কাজ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা বদনামের কারণ অথবা আর্থিক ক্ষতির কারণ হওয়ায় তা থেকে বিরত থাকার সংকল্প করা তাওবার সংজ্ঞায় পড়ে না। দ্বিতীয়ত, যখনই কেউ বুঝতে পারবে যে, তার দ্বারা আল্লাহর নাফরমানী হয়েছে, তার উচিত তৎক্ষণাৎ তাওবা করা এবং যেভাবেই হোক অবিলম্বে তার ক্ষতিপূরণ করা কর্তব্য, তা এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। তৃতীয়ত, তাওবা করে বারবার তা

ভঙ্গ করা, তাওবাকে খেলার বস্তু বানিয়ে নেয়া এবং যে গোনাহ থেকে তাওবা করা হয়েছে বার বার তা করতে থাকা তাওবা মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ। কেননা, তাওবার প্রাণ সত্তা হচ্ছে কৃত গোনাহ সম্পর্কে লজ্জিত হওয়া কিন্তু বার বার তাওবা ভঙ্গ করা প্রমাণ করে যে, তার মধ্যে লজ্জার অনুভূতি নেই। চতুর্থত, যে ব্যক্তি সরল মনে তাওবা করে পুনরায় ঐ গোনাহ না করার সংকল্প করেছে মানবিক দুর্বলতার কারণে যদি পুনরায় তার দ্বারা সেই গোনাহর পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে এ ক্ষেত্রে পূর্বের গোনাহ পুনরুজ্জীবিত হবে না তবে পরবর্তী গোনাহর জন্য তার পুনরায় তাওবা করা উচিত এবং ভবিষ্যতে সে আর তাওবা ভঙ্গ করবে না, এ ব্যাপারে কঠোর সংকল্প করা উচিত। পঞ্চমত, যখনই গোনাহর কথা মনে পড়বে তখনই নতুন করে তাওবা করা আবশ্যক নয়। কিন্তু তার প্রবৃত্তি যদি পূর্বের পাপময় জীবনের স্মৃতিচারণ করে আনন্দ পায় তাহলে গোনাহর স্মৃতিচারণ তাকে আনন্দ দেয়ার পরিবর্তে লজ্জাবোধ সৃষ্টির কারণ না হওয়া পর্যন্ত তার বার বার তাওবা করা উচিত। কারণ, যে ব্যক্তি সত্যিই আল্লাহর ভয়ে গোনাহ থেকে তাওবা করেছে সে অতীতে আল্লাহর নাফরমানী করেছে এই চিন্তা করে কখনো আনন্দ অনুভব করতে পারে না। তা থেকে মজা পাওয়া ও আনন্দ অনুভব করা প্রমাণ করে যে, তার মনে আল্লাহর ভয় শিকড় গাড়তে পারেনি।

২০. এ আয়াতের কথাটি ভেবে দেখার মত। এখানে এ কথা বলা হয়নি যে, তাওবা করলে তোমাদের অবশ্যই মাফ করে দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। বরং তাদের এই প্রত্যাশা দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা সরল মনে তাওবা করো তাহলে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তোমাদের সাথে এই আচরণ করবেন। এর অর্থ হলো, গোনাহগার বান্দার তাওবা কবুল করা এবং তাকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে জান্নাত দান করা আল্লাহর জন্য ওয়াজিব নয়। বরং তিনি যদি মাফ করে দেন এবং পুরস্কারও দেন তাহলে তা হবে সরাসরি তার দয়া ও মেহেরবানী। বান্দার তাঁর ক্ষমালাভের আশা অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু তাওবা করলে ক্ষমা পাওয়া যাবে এই ভরসায় গোনাহ করা উচিত নয়।

২১. অর্থাৎ তার উত্তম কার্যাবলীর পুরস্কার নষ্ট করবেন না। কাফের ও মুনাফিকদের এ কথা বলার সুযোগ মোটেই দেবেন না যে, আল্লাহর বন্দেগী করে এসব লোক কি প্রতিদান লাভ করেছে? লাঞ্ছনা ও অপমান পড়বে বিদ্রোহী ও নাফরমানদের ভাগে, বিশ্বাসী ও অনুগতদের ভাগে তা পড়বে না।

২২. এ আয়াতটি সূরা হাদীদের ১২ ও ১৩নং আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়লে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, ঈমানদারগণ যখন হাশরের ময়দান থেকে জান্নাতের দিকে যেতে থাকবেন তখনই তাদের আগে আগে 'নূর' অগ্রসর হওয়ার এই ঘটনা ঘটবে। সেখানে চারদিকে থাকবে নিকষ কালো অন্ধকার। যাদের জন্য দোযখের ফায়সালা হবে তারাই কেবল সেখানে অন্ধকারে ঠোকর খেতে থাকবে। আলো কেবল ঈমানদারদের সাথেই থাকবে। সেই আলোর সাহায্যে তারা পথ অতিক্রম করতে থাকবে। এই নাজুক পরিস্থিতিতে অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ানো লোকদের আর্তনাদ ও বিলাপ শুনে শুনে ঈমানদারদের ওপর হয়তো ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে থাকবে এবং নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা স্মরণ করে তারাও আশংকা করতে থাকবে যে, তাদের 'নূর' আবার ছিনিয়ে নেয়া না হয়

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۞ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۞

হে নবী, কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের প্রতি কঠোরতা দেখাও।[২৩] তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তা অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা।

আল্লাহ কাফেরদের ব্যাপারে নূহ এবং লূতের স্ত্রীদেরকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। তারা আমার দুই নেক্‌কার বান্দার স্ত্রী ছিল। কিন্তু তারা তাদের স্বামীর সাথে খেয়ানত[২৪] করেছিল। তারা আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের কোন কাজেই আসতে পারেনি। দু'জনকেই বলে দেয়া হয়েছে ঃ যাও, আগুনে প্রবেশকারীদের সাথে তুমিও প্রবেশ কর।

এবং দুর্ভাগাদের মত তাদেরকেও অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরতে না হয়। তাই তারা দোয়া করতে থাকবে, হে আমাদের রব, আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং জান্নাতে না পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের 'নূর'কে অবশিষ্ট রাখ। ইবনে জারীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا এর অর্থ হচ্ছে, যতক্ষণ তারা সহী সালামতে পুলসেরাত অতিক্রম করে না যায় ততক্ষণ যেন তাদের নূর অবশিষ্ট থাকে এবং নিভে না যায়। হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ এবং দাহহাকের তাফসীরও প্রায় অনুরূপ। ইবনে কাসীর তাদের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, ঈমানদারগণ যখন দেখবেন মুনাফিকরা 'নূর' থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছে তখন তারা নিজেদের 'নূরে'র পূর্ণতার জন্য দোয়া করতে থাকবে (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হাদীদ, টীকা—১৭)।

২৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আত তাওবা, টীকা—৮২।

২৪. এখানে খেয়ানতের অর্থ এ নয় যে, তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। এখানে খেয়ানতের অর্থ হচ্ছে তারা হযরত নূহ (আ) ও লূতের (আ) সাথে ঈমানের পথে চলেনি, বরং তাদের বিরুদ্ধে দীন ইসলামের শত্রুদের সহযোগিতা করে এসেছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ কোন নবীর স্ত্রী কখনো ব্যভিচারী ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এ দু'জন মহিলার খেয়ানত ছিল দীনের ব্যাপারে। তারা হযরত নূহ (আ) ও হযরত লূতের (আ) দীন গ্রহণ করেনি। হযরত নূহের (আ) স্ত্রী তার কওমের জালেমদের কাছে ঈমান গ্রহণকারী সম্পর্কে খবর পৌঁছাত এবং হযরত লূতের (আ) স্ত্রী তার স্বামীর কাছে আগত লোকদের খবর তার কওমের দুশ্চরিত্র লোকদের কাছে পৌঁছে দিত। (ইবনে জারীর)

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿١٢﴾

আর ঈমানদারদের ব্যাপারে ফেরাউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করছেন। যখন সে দোয়া করলো, হে আমার রব, আমার জন্য তোমার কাছে জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দাও। আমাকে ফেরাউন ও তার কাজকর্ম থেকে রক্ষা করো[২৫] এবং জালেম কওমের হাত থেকে বাঁচাও। ইমরানের কন্যা[২৬] মারয়ামের উদাহরণও পেশ করছেন, যে তার লজ্জাস্থানকে হিফাজত করেছিল।[২৭] অতপর আমি আমার পক্ষ থেকে তার মধ্যে রূহ ফুঁৎকার করছিলাম।[২৮] সে তার বাণীসমূহ এবং কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন করেছে। সে ছিল আনুগত্যকারীদের অন্তরভুক্ত।[২৯]

২৫. অর্থাৎ ফেরাউন যেসব খারাপ কাজ কর্ম করে আমাকে তার মন্দ পরিণামের অংশীদার করে না।

২৬. হয়তো হযরত মারয়ামের বাপের নাম ইমরান ছিল, অথবা তাঁকে ইমরানের কন্যা বলার কারণ হচ্ছে, তিনি ইমরানের বংশধর ছিলেন।

২৭. এটা ইহুদীদের অপবাদের জবাব। ইহুদীদের অপবাদ ছিল, তাঁর গর্ভে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম (নাউযুবিল্লাহ) কোন গোনাহর ফল ছিল। সূরা নিসার ১৫৬ আয়াতে এই জালেমদের এই অপবাদকে "بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ" মারাত্মক অপবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন—নিসা, টীকা—১৯০)।

২৮. অর্থাৎ কোন পুরুষের সংস্পর্শ ছাড়াই তার গর্ভাশয়ে নিজের পক্ষ থেকে একটি প্রাণ সৃষ্টি করা হয়েছিল। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন—নিসা, টীকা ২১২ ও ২১৩; সূরা আল—আম্বিয়া, টীকা—৮৯)।

২৯. যে উদ্দেশ্যে এই তিন শ্রেণীর নারীর উদাহরণ পেশ করা হয়েছে এই সূরার ভূমিকায় তার ব্যাখ্যা করেছি। তাই এখানে তা পুনরালোচনার প্রয়োজন নেই।